প্রথম ভাগ

হরিনাথ গ্রন্থাবলী

কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার প্রণীত।

শ্রীজলধর সেন—প্রকাশক।

কলিকাতা

১১৫।২ নং গ্রে ষ্ট্রীট নূতন কলিকাতা যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

বসুমতীর সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী উদারহৃদয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাণগত যত্ন ও সাহায্যে স্বর্গীয় কাঙ্গাল হরিনাথের বিস্তৃত গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া নীরবে হরিনাথ যে সাহিত্য-সাধনা করিয়া গিয়াছিলেন, আমরা এতদিনে তাঁহার সাধনার ফল একত্র সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে ছাপাইবার সুযোগ পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

ান দয়ারসাগর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় লিত বাঙ্গলা গদ্যে পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন, সেই সময়ে হরিনাথ নদীয়া ার একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে বসিয়া বিজয়বসন্ত রচনা করেন। হরিনাথ ইংরাজী াতেন না, ইংরাজী গ্রন্থের কোন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পুস্তক লেখা ার ঘটিয়া উঠে নাই; তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে সেই সময়ে বিজয়বসন্ত শিত করিয়া পাঠক সমাজের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন। বলিতে কি, র এই পুস্তক এই শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে মৌলিকতা, মধুরতা ও প্রকৃত ...নাদর লাভ করিয়াছিল; তাঁহার ন্যায় বঙ্গভাষার একজন ...বান রচনাবলী প্রকৃতই বহুলরূপে প্রচারিত হইবার যোগ্য। ...ক হরিনাথ দীনভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, কিন্তু ...কষাঘাতে তাঁহার হৃদয়ের বল, তাঁহার আধ্যাত্মিক তেজ ... নাই। শেষ জীবনেও তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবায় ...হার ব্রহ্মাণ্ডবেদ এক অমূল্য রত্ন আমরা বর্ত্তমান সংগ্রহে ...ত পারিলাম না। কাঙ্গাল হরিনাথের বাউল সংগীতে ...ইয়া গিয়াছিল, এই সংগ্রহে সেই বহু সহস্র গীত হইতে ...কাশিত হইয়াছে। স্বদেশহিতৈষী সাহিত্য-সেবীর অদৃষ্টে ... পৃথিবীতে দুর্ল্লভ, কাঙ্গাল হরিনাথের সম্বন্ধে ভগবান ...ন নাই, ইহাতে দুঃখ করিয়া লাভ নাই। এক্ষণে তিনি ...স্থান করিয়াছেন। সাধ্বী বিধবা ও পুত্র কন্যাগণের জন্য ...ন কিছুই ...যান নাই, সুধু আছে তাঁহার নাম, আর আছে তাঁহার ...বান গ্রন্থরাশি। আজ আমরা সেই গ্রন্থরাশির মধ্যে হইতে কয়েকখানি ...াশিত করিয়া সন্দেহ ও সঙ্কোচ উদ্বেলিত হৃদয়ে সুধী পাঠকবৃন্দের সন্নিকট- ... হইলাম; তাঁহাদের উৎসাহ পাইলে ভবিষ্যতে এই গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড ...কাশের বাসনা রহিল।

শ্রীজলধর সেন।

হরিনাথ মজুমদার

যখন বঙ্গের গ্রামে দীন প্রজাগণ
উৎপীড়ন অত্যাচার নীরবে সহিত ;
না জানিত রাজদ্বারে করিতে রোদন,
নিজের অভাব নিজে বুঝিতে নারিত
সে সময়ে হরিনাথ বীরের মতন,
অনন্ত-সহায়, ঘোর যুদ্ধে দাঁড়াইলা ;
লেখনী সম্বল মাত্র, নির্ভীক হৃদয়ে,
জীবনের দীর্ঘকাল একাকী যুঝিলা ।
বারেক কর্ত্তব্য-বোধ, নরপ্রীতি আর,
মানব হৃদয়ে মূল করিলে বিস্তার,
একক দরিদ্র কেহ কি করিতে পারে,
হরিনাথ 'গ্রামবার্ত্তা' নিদর্শন তার।
শিক্ষক, রক্ষক, যোগী, ত্রিকালে ত্রিবেশ,
যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, প্রৌঢ়ে, দীপ্ত উপদেশ।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীহরিনাথ মজুমদার

সূচীপত্র।

সত্যপথ।

আত্মশিক্ষা।

দেহতত্ত্ব।

মনস্তত্ত্ব।

অনিত্যতা।

পুরুষপ্রকৃতি-তত্ত্ব।

সাধন তত্ত্ব।

উদ্দীপন।

আমন্ত্রণ।

প্রার্থনা।

বিবিধ।

হরিনাথের জীবনী।

(সংক্ষিপ্ত কথা)

সংসারে অতি হীন অবস্থায় জন্ম-গ্রহণ করিয়াও যাঁহারা মানব-সাধারণের নিকট অতি উচ্চ সম্মানের আসন লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিলে দুইটি গুণ সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—ইহার একটী প্রতিভা, অন্যটী প্রেম। যদি আর কিছু না থাকে, তথাপি শুধু বিধিদত্ত এই দুইটী অমূল্য রত্ন লাভ করিয়া মানব আপনার জীবনের দিনগুলি সার্থকতার সহিত অতিবাহিত করিয়া ধন্য হইতে পারেন; ইহারই বলে তিনি বিধাতার চিরমঙ্গল ইচ্ছাকে সংসার-আকাশের স্থির-জ্যোতিঃ ধ্রুবনক্ষত্র জ্ঞান করিয়া কর্ত্তব্যের অনুরোধে দুঃখ দৈন্যের সহিত চিরজীবন অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করেন; সহস্র প্রকার বিপদের মেঘ, প্রলয়ের ঝটিকা তুলিয়া চারিদিক হইতে তাঁহার মস্তকের উপর ঘনাইয়া আসে বটে, কিন্তু প্রেম নামক যে দুর্ল্লভ রত্নটী তাঁহার নিভৃত হৃদয়ের অন্তস্তলে সংগুপ্ত থাকে, তাহারই উজ্জ্বল আভায় বিপদের সেই গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ সম্পদের সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে, এবং অবশেষে যখন তিনি বিজয়ী প্রেমিকের মত অনেকের হৃদয় হরণ করিয়া, মৃত্যুর অমররশ্মিরেখাঙ্কিত পরপারে চিরকালের জন্য মাথুর যাত্রা করেন, তখন তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু এবং ভক্তগণ তাঁহার বিরহে অশ্রুত্যাগ করিতে থাকে।

এই কারণেই বর্ত্তমান গ্রন্থাবলীর প্রণেতা, বিগত শতাব্দীর অন্যতম সুলেখক হরিনাথ মজুমদারের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের একটী অংশে শোক কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল; যাহারা তাঁহাকে জানিত, ভালবাসিত, এবং শ্রদ্ধাভক্তি করিত, তাহাদিগের ত কথাই নাই, কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি যাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন, যাহাদিগের

এবং হরিনাথের বাল্যজীবনেও এই প্রকার অখ্যাতির প্রসঙ্গ শুনিতে পাওয়া যায়। কোন দিন পাঠশালে লিখিতে যাইবার অনিচ্ছা হইলে কেহই তাঁহাকে কোন রূপে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারিত না; এমন কি কথিত আছে, একদিন তিনি গুরুমহাশয়ের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একটি কূপের মধ্যে নামিয়া সমস্ত দিন লুকাইয়া ছিলেন। তাঁহার আয়াস-সুখ-নিরত, চঞ্চল শিশুপ্রকৃতি মুক্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্যসুধা আস্বাদনে যেরূপ অনুরক্ত ছিল, মহিমাময়ী বাণীর কঠোর-হৃদয় অনুচর, বেত্রমাত্র-সম্বল গুরুমহাশয়ের জ্ঞান-সমুদ্রের গভীর গর্জ্জনের প্রতি তাঁহার সেরূপ শ্রদ্ধা ছিল না।

এই পিতৃমাতৃহীন অসহায় বালকের গ্রাসাচ্ছাদন কিরূপে নির্ব্বাহ হইবে, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তাঁহার হিতৈষী আত্মীয়গণ তাঁহাকে এক নীলকুঠীতে শিক্ষা-নবীশের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। সে কালে কুঠীর কার্য্যে যথেষ্ট মান সম্ভ্রম এবং পয়সা ছিল; তিনি যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই কুঠীর একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন; কিন্তু "কুঠেল-সাহেবের" গোলামীতে জীবন উৎসর্গ করিবার জন্য তাঁহার জন্ম হয় নাই; কুঠীর কর্ম্মচারিবর্গ সাধারণতঃ যেরূপ অসচ্চরিত্র, উৎকোচগ্রাহী, দরিদ্র-প্রজার উৎপীড়ক হয়, তাহাতে অগণ্য অর্থলাভের সম্ভাবনা থাকিলেও তিনি কুঠীর মধ্যে কাজ করিলেন না; অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার শিক্ষানবীশি পরিত্যাগ করিলেন।

নীলকুঠীতে প্রজা ও শ্রমজীবিবর্গের দুর্দ্দশা এবং উৎপীড়ন দেখিয়া তাহাদের ক্লেশ বিমোচনের সংকল্প এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়ে ধীরে ধীরে বদ্ধমূল হইয়া উঠে। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য তিনি অবসরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু এই দুরূহ কার্য্যে বিঘ্নও যথেষ্ট ছিল। ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষা হয় নাই; তিনি বুঝিলেন এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে একদিকে যেমন নির্ভীক তেজস্বী হৃদয়ের প্রয়োজন, অন্যদিকে শাণিত লেখনীর সুতীক্ষ্ণ সন্ধানেরও সেইরূপ আবশ্যক; সুতরাং তিনি ঘরে বসিয়া তৎকালপ্রকাশিত বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি পুস্তক এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করিয়া বঙ্গভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; এমন কি তিনি এরূপ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কোন ধনবান্ ব্যক্তিকে এক রাত্রে একখানি পুস্তক নকল করিয়া দিয়া পারিশ্রমিকস্বরূপ একখানি বস্ত্র লইতে বাধ্য হন।

ইহার পর হইতেই কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহার স্বগ্রামের প্রজাগণের দুঃখ ও অভাবকাহিনী সাধারণের গোচর করিবার জন্য তিনি "সংবাদ প্রভাকরে" প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। সে এ যুগের কথা নহে; পল্লীবাসিগণের অভাব এ কাল অপেক্ষা সে কালে অনেক অধিক ছিল এবং তাহা প্রকাশ করিবার কোনই উপায় ছিল না। সে কালে জমিদারেরা আপনাদিগকেই প্রজাবর্গের দণ্ডমুণ্ডের একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতেন; সুতরাং কারণে অকারণে তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি নির্য্যাতন সহ্য করিতে করিতে হইত। এই সকল অভাব ও অভিযোগের বিবরণ ঈশ্বরচন্দ্রের হস্তগত হইলে, তিনি তাহা সযত্নে "প্রভাকরে" প্রকাশ করিতেন, কোন ভ্রম থাকিলে সংশোধন করিয়া দিতেন এবং প্রবন্ধ রচনা সম্বন্ধে তাঁহাকে উপদেশ দান করিতেন। এই প্রকারে হরিনাথ সংবাদপত্রসম্পাদনে অভ্যস্ত হইয়া উঠেন।

বঙ্গসাহিত্যের কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সেবকের ন্যায় হরিনাথেরও রচনা-শিক্ষা গুপ্ত-কবির নিকট আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু অনেক বিষয়ে গুপ্ত-কবির সহিত তাঁহার মতভেদ ছিল। তন্মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা অন্যতম। বঙ্গরমণীর বিদ্যাশিক্ষা বঙ্গীয় পুরুষের সর্ব্ববিধ উন্নতির যে সহযোগিনী, এ কথা তিনি স্বীকার করিতেন, এবং যাহাতে তাঁহাদের ক্ষুদ্র গ্রামটিতেও স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার আলয়ে একটি বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক কয়েকটি বালিকার শিক্ষা দান কার্য্য আরম্ভ করেন; কিন্তু বালকদিগের শিক্ষার প্রতি তাঁহার সমধিক অনুরাগ লক্ষিত হইত। তিনি বাল্যকালে আশানুরূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই, তাই স্বগ্রামস্থ বালকবর্গের শিক্ষার অভাব তিনি হৃদয়ের সহিত অনুভব করিতেন এবং এই অভাব কিয়ৎপরিমাণে নিরাকরণের জন্য ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী তিনি একটি বাঙ্গলা পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক গ্রামস্থ বালকদিগের শিক্ষা দান আরম্ভ করেন। তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রমে অনেক ছাত্র এই পাঠশালা হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার কীর্ত্তি-চিহ্নস্বরূপ সেই পাঠশালাটি এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

দরিদ্র প্রজা ও শ্রমজীবীবর্গ, জমিদার এবং মহাজনদিগের হস্তে, বিশেষতঃ কুঠিয়ালদিগের অত্যাচারে যেরূপ উৎপীড়িত হইতেছিল, সেই পীড়ন নিবারণ করাই অবশেষে তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত হইয়া উঠিল। এই অভিপ্রায়ে তিনি ১২৭০ সালের ১লা বৈশাখ হইতে "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" নামে একখানি সংবাদ-পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে সংবাদ-পত্র প্রকাশ করা

বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সহজ এবং অল্পব্যয়সাধ্য ছিল না। বিপন্ন দরিদ্র হরিনাথ ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া এই দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। এই পত্রিকা-খানি প্রথমে কলিকাতায় "গিরিশ বিদ্যারত্ন" যন্ত্র হইতে মুদ্রিত ও কুমারখালী হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়; তখন ইহা মাসিক ছিল, "গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা" পরে পাক্ষিক এবং অবশেষে সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হইয়াছিল। কুমার-খালীতে যন্ত্রালয় স্থাপিত হইলে, অবশেষে ইহা কুমারখালীতেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। গ্রামবার্ত্তা দ্বারা এ দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। ইহা যে শুদ্ধ জমিদার মহাজন এবং নীলকুঠির অত্যাচার নিবারণের মুষ্টিযোগস্বরূপ হইয়াছিল তাহা নহে, প্রজার প্রতি গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ইহাতে যে সকল সসার প্রবন্ধ থাকিত, তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টেরও যথেষ্ট অনুরাগ লক্ষিত হইত। নদী প্রভৃতি পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার পূর্ব্বক জলকষ্ট নিবারণ, পুলিশ বিভাগের সুব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে তিনি লেখনী পরিচালন করিলেন। ডাকঘরে মনিঅর্ডার প্রচলনের প্রস্তাব এ দেশে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে উত্থাপিত করিয়াছিলেন। তৎকালে সোমপ্রকাশ এবং গ্রাম-বার্ত্তাই উচ্চ শ্রেণীর সাময়িক পত্র ছিল।

এই সমস্ত গুরুতর পরিশ্রমে এবং বিবিধ প্রকার চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া জন্মে। একে ত গ্রামবার্ত্তার ব্যয়ভারে তিনি বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়েন, তাহার উপর তাঁহার প্রিয়তম পাঠশালার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হওয়াতে তাহা ঋণজালে জড়িত হইয়া উঠিয়া যাইবার উপক্রম হয়। তিনি প্রথমে এই পাঠ-শালার সম্পাদক ছিলেন। কিছুকাল পরে ইহার অবস্থা বেশ উন্নত হইলে, তিনি ইহার সম্পাদন কার্য্য অন্যের হস্তে অর্পণ করেন। এখন বিপদ দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় বলিলেন "আমি কেবল নাম মাত্র সম্পাদক আছি, ইহার শুভাশুভ ভার চিরকাল তোমার উপর ন্যস্ত আছে, অতএব তুমি ইহার উপায় উদ্ভাবন কর।" বিপদ দেখিয়া হরিনাথ অন্য লোকের ন্যায় কখন পশ্চাৎপদ হইতেন না; তিনি শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা সত্বেও বিদ্যালয়ের ভার লইয়া তিনজন শিক্ষকের কার্য্য একাকী নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিয়মিতরূপে পরিশ্রম করিতে হইত, কিন্তু তিনি পরোপকার এবং স্বদেশের সেবা-রূপ যে মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারই অনুরোধে নিজের সর্ব্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করিয়া পরিপূর্ণ উৎসাহের সহিত অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইলেন। অবিলম্বেই তাঁহার পাঠশালা ঋণমুক্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থা লাভ করিল;

কিন্তু এই সংগ্রামে তাঁহাকে অস্ত্রাহত বিজয়ী বীরের ন্যায় শয্যাশায়ী হইতে হইল।

যাহাহউক ভগবানের কৃপায় তিনি অল্পদিনের মধ্যে রোগমুক্ত হইয়া অধিকতর যত্নের সহিত গ্রামবার্ত্তা পরিচালনে রত হইলেন। অধিক মূল্য দিয়া দরিদ্র পল্লীবাসী সংবাদপত্র গ্রহণে অসমর্থ ভাবিয়া, তিনি গ্রামবার্ত্তার প্রতি সংখ্যার মূল্য এক পয়সা নির্দ্ধারণ করিলেন। এত সুলভ মূল্যোব সংবাদপত্র বাহির করা তখন স্বপ্নের অগোচর ছিল; ইহার অনেক গুণ অধিক মূল্য দিয়াও সংবাদপত্র গ্রহণ করা সহজ ছিল না। ইহার পরেও অনেক সংবাদপত্র বাহির হইয়াছে, দেশে লেখক এবং যন্ত্রালয়ের সংখ্যা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে; কিন্তু সাধারণের জন্য এরূপ সুলভ মূল্যের সংবাদপত্র অধিক প্রকাশিত হইল না। কেবল স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন যুরোপ হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সুলভ মূল্যে "সুলভ সমাচার" প্রচার করিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেন।

গ্রামবার্ত্তার মূল্য সুলভ করাতে প্রতিদিন তিনি অধিক করিয়া ঋণজালে জড়িত হইতে লাগিলেন। এক পয়সা মূল্য হওয়ার পরও যদি গ্রামবার্ত্তার সহস্র সহস্র গ্রাহক সংগৃহীত হইত, গ্রাহকেরা যদি তাঁহাকে সমুচিত উৎসাহ দান করিতেন, তাহাহইলে গ্রামবার্ত্তার ন্যায় পত্রিকাকে কখন প্রাণধারণের জন্য চিন্তিত হইতে হইত না, গ্রামবার্ত্তার সম্পাদককেও ঋণদায়ে বিব্রত হইতে হইত না; কিন্তু কাঙ্গাল হরিনাথ গ্রাহকবর্গের নিকট যথোচিত উৎসাহ এবং সাহায্য লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি যাঁহাদিগের জন্য খাটিয়া মরিতেন, যাহাদের বিপদ দূর করিতে গিয়া নিজে বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন, তাহারা পর্য্যন্ত তাঁহার সাধুসঙ্কল্পে উপেক্ষা প্রকাশ করিত। ইহা অপেক্ষা আমাদের দেশের লোকের আর কি অধিক কলঙ্ক হইতে পারে? যাঁহারা আমাদের জন্য প্রাণপাত করেন, জীবিত অবস্থায় তাঁহাদের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহি না; অবশেষে তাঁহারা ইহজীবন ত্যাগ করিয়া নিন্দা বা প্রশংসার অনেক ঊর্দ্ধে, দেশ কালের অতীত হইয়া গেলে, আমরা তাঁহাদের শোকে সভা করি, এবং বক্তৃতা পূর্ব্বক বিলাপ করিতে বসি! সাধারণের হিতকর কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিয়া, দেশের সেবা করিতে গিয়া হরিনাথকে সময়ে সময়ে যে সকল বিপদে পড়িতে হইত, পরমেশ্বরের নাম করিয়া তিনি তাহা সহ্য করিতেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার হৃদয় মানব-হৃদয় ছিল; সেই সকল বিপদে যদি কেহ একবার

সমবেদনায় "আহা" বলিত, তাহা হইলেও তিনি অনেক সান্ত্বনা লাভ করিতেন! যাহাহউক কোন বিপদেই হরিনাথকে কাতর এবং অধীর করিতে পারে নাই। এই সময় তিনি কিরূপ নির্ভীকভাবে তেজস্বিতার সহিত গ্রামবার্ত্তা সম্পাদন করিতেছিলেন এবং ঘনীভূত বিপদের প্রতি কিরূপ উদাসীন ছিলেন, তৎসম্বন্ধে দুইটি গল্প পাঠকবর্গের গোচব কবিতেছি।

একবার পাবনার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট * * * সাহেব মফঃস্বল পরিদর্শনে বাহির হইয়া কোন অনাথা রমণীর একটি পয়স্বিনী গাভীর লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই; ছলে, বলে, কৌশলে, সেই গাভীটীকে হস্তগত করেন। দুঃখিনী রমণী প্রবলপ্রতাপান্বিত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে কি করিবে? নিরুপায় দেখিয়া অগত্যা তাহাকে মৌন থাকিতে হইল। কিন্তু এই ঘটনা হরিনাথের অগোচর রহিল না; তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া "গরু চোর ম্যাজিষ্ট্রেটকে" শিক্ষা দিবার জন্য একটি প্রবন্ধ গ্রামবার্ত্তায় প্রকাশ পূর্ব্বক ম্যাজিষ্ট্রেটের গর্হিতাচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেন। বর্ত্তমান কালের ন্যায় তখন গ্রামে গ্রামে এরূপ শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, তখন কদাচিৎ মানসিক তেজের (independence of spirit) পরিচয় পাওয়া যাইত; সামান্য একটি পেয়াদার লাল পাগ্‌ড়ি দেখিলে গ্রামের অনেক 'নামজাদা' লোকও অন্তঃপুরে আশ্রয় লইতেন। সে কালে দেশের ক্ষমতাশালী শিক্ষিত জমিদারেরা যাঁহার বিরুদ্ধে একটি সামান্য কথা বলিতেও সঙ্কুচিত হইতেন, একজন নিঃসম্বল দরিদ্র গ্রামবাসী প্রকাশ্যভাবে,নির্ভীকচিত্তে তাঁহার কুকার্য্যের কথা ঘোষণা করিতে লাগিলেন দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার এই কার্য্যে বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না। তাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত মনুষ্যত্ব নামক যে মহাপ্রাণীর অধিষ্ঠান ছিল, সে জেলার কর্ত্তার এই কুকার্য্য দেখিয়া অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। হরিনাথ, বিশ্বাস এবং কর্ত্তব্যের মস্তকে পদাঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না। অবিলম্বেই ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ণে হরিনাথের কথা প্রবেশ করিল। তিনি বিবিধ উপায়ে হরিনাথকে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে নিজে এক দিন অশ্বারোহণে পাবনা হইতে কুমারখালী আসিয়া হরিনাথের অনুসন্ধান করেন; কিন্তু কুমারখালিবাসী অধিকাংশ ধনী হরিনাথের আত্মীয় জানিয়া বিশেষ কিছু করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যান। তিনি হরিনাথের সাহস ও তেজস্বিতার অনেক কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "হরিনাথ বাঙ্গালীর মধ্যে একজন যথার্থ লোক।"

আর একবার জনৈক প্রতাপশালী জমিদার প্রজাবর্গের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলে, তিনি নির্ভীকচিত্তে জমিদারের অত্যাচার কাহিনী "গ্রামবার্ত্তা"য় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার জন্য উক্ত জমিদারের কর্ম্মচারিবর্গ অর্থ দ্বারা তাঁহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু প্রেম ভিন্ন অর্থ দ্বারা কেহ কোন দিন হরিনাথের হৃদয় ক্রয় করিতে পারে নাই। তিনি অত্যন্ত ঘৃণা সহকারে জমিদারের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন জমিদারের লোকেরা অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য লাঠিয়াল নিযুক্ত করিল; কিন্তু লাঠিয়ালেরা তাঁহার কেশস্পর্শ করিতেও সাহসী হইল না। অবশেষে একজন পঞ্জাবী গুণ্ডা জমিদারের পক্ষ হইতে নিযুক্ত হইয়া একদিন সশস্ত্রভাবে তাঁহার বাড়ী পর্য্যন্ত চড়াও করিল। তখন তিনি গৃহে সহযোগিবর্গের সহিত গ্রামবার্ত্তার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন; বিফলমনোরথ হইয়া গুণ্ডাকে সে স্থল পরিত্যাগ করিতে হইল। এই সময়ে তিনি বিশেষ সাবধানে থাকিতেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার অদম্য তেজ ক্ষণকালের জন্যও ম্লানভাব ধারণ করে নাই, বরং তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে এই সকল ষড়যন্ত্র চলিতেছে দেখিয়া, অকম্পিতহস্তে লিখিলেন:—

"মাতৃ ও পিতৃভক্ত কোন ব্যক্তিকে কেহ যদি বলে, তুমি তোমার পিতা মাতার সেবা পরিত্যাগ কর, যদি না কর তবে দণ্ডিত হইবে। এই দণ্ড ভয়ে কি কেহ পিতামাতার সেবা পরিত্যাগ করিতে পারেন? সত্য পালনই জগৎ-পিতার সেবা করিবার উপায়; এই সত্য পালন করিয়া জগৎপিতার সেবা করিলে যদি কেহ দণ্ড করেন, তাহা হইলে কি আমরা তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করিব? অতএব, যাঁহারা নূতন আইনের কথা শুনিয়া গ্রাম ও পল্লীবাসিদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি, ভ্রাতৃভাবে বিনয় করিয়া বলিতেছি, অত্যাচার পরিত্যাগ করুন। তাঁহার নিরীহ ও দুর্ব্বল সন্তানগুলি অত্যাচারিত না হয়, ঈশ্বর এই নিমিত্ত ভারতরাজ্য বৃটিশসিংহের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। অত্যাচার করিয়া একদিন, না হয় দুদিন পার পাইবে, তিন দিনের দিন অবশ্যই তাহা রাজার কর্ণগোচর হইবে। আমরা এত দিন সহ্য করিয়াছি, আর সহ্য করিতে পারি না; সকল কথা প্রকাশ করিয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে ত্রুটি করিব না। ইহাতে মারিতে হয় মার, কাটিতে হয় কাট, যাহা করিতে হয় কর, প্রস্তুত আছি। ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মালোচনা আর বাহিরে আসিয়া মনুষ্যশরীরে নিরপরাধে পাদুকা প্রহার, এ কথা আর গোপন করিতে পারি না।

বৃটীশরাজ্যের প্রতি এই অত্যাচার দেখিয়া যে প্রকাশ না করে, আমাদিগের মতে সেই রাজদ্রোহী।"

হরিনাথ স্বদেশ-সেবার জন্য জীবন দান করিতে প্রস্তুত হইলেও জমিদার লজ্জিত হইলেন না; তাঁহাকে নির্য্যাতন করিবার জন্য "পঞ্জাবী গুণ্ডা" পর্য্যন্ত নিযুক্ত হইল। অবশেষে কাঙ্গাল হরিনাথেরই জয় হইল। কুমারখালীতে ছাপাখানা সংস্থাপন করিয়া এক পয়সা মূল্যে হরিনাথ গ্রামবার্ত্তা বিক্রয় করিতে লাগিলেন। কাঙ্গাল হইয়াও প্রজাসমাজে হরিনাথই রাজা হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ঋণভারে গ্রামবার্ত্তা অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, এবং ২২ বৎসর পল্লীবার্ত্তা বহন করিয়া গ্রামবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল।

স্ত্রীশিক্ষা ও বাঙ্গলা শিক্ষার জন্য সে কালে অল্পলোকেই অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। হরিনাথ বালিকা পাঠশালা ও বাঙ্গলা পাঠশালা সংস্থাপন করিয়া স্বয়ং অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উভয় পাঠশালাই জীবিত রহিয়াছে এবং অনেক অজ্ঞানান্ধ নরনারীর চক্ষুরুন্মীলনের সহায়তা করিতেছে।

বিজয়বসন্তের কথা বাঙ্গালীর নিকট নূতন করিয়া লিখিবার আবশ্যক নাই। কারণ বঙ্গসাহিত্যসুহৃদ মাত্রেই অবগত আছেন যে, "বিজয়বসন্ত" বঙ্গসাহিত্যের প্রথম যৌবনপুষ্ট দেহে কি লাবণ্যশ্রী বিকাশ করিয়াছিল! এতদ্ভিন্ন হরিনাথ যে সকল গদ্য ও পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যজগতে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে; কিন্তু এ দেশে সাহিত্য সেবকের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়া থাকে, হরিনাথের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল;— সরস্বতীর কৃপার ত্রুটী ছিল না, লক্ষ্মীর কৃপা ঘটিয়া উঠে নাই। কাঙ্গাল হরিনাথ স্বদেশসেবায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া ৬৩ বৎসর বয়সে কার্য্যাক্ষম জরা জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া সাধনোচিত দিব্যলোকে প্রস্থান করিলেন।

হরিনাথ স্বভাব-কবি ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। সে কালে কুমারখালীতে বড় কীর্ত্তনের ধূম ছিল; অনেকে সুন্দর সুন্দর পদ প্রস্তুত করিতেন; কিন্তু হরিনাথের পদগুলি মহাজন-বিরচিত পদাবলী অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। আমরা শুনিয়াছি, এক দিন একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা একটী গান রচনা করিয়া কিছুতেই শেষ চরণ মিলাইতে পারিতেছেন না, অনেক চিন্তা করিতেছেন; কিন্তু শেষ চরণটি মনের মত হইতেছে না। বালক হরিনাথ সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন; স্বীয় প্রতিভাবলে বালক এমন সুন্দর ভাবপূর্ণ শব্দ যোজনা করিয়া শেষ চরণটি মিলাইয়া দিলেন যে, সকলে অবাক্ হইয়া গেল।

তাঁহার ব্রহ্মসংগীত গুলি শুনিয়া অনেকে মুগ্ধ হইয়াছেন; তাঁহার সংকীর্ত্তনে অনেকের চক্ষে প্রেমাশ্রু প্রবাহিত হইয়াছে। গ্রামের যুবকগণ যাহাতে নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে পারেন, সেই জন্য হরিনাথ অনেকগুলি পৌরাণিক নাটক ও পাঁচালী রচনা করেন এবং নিজেই শিক্ষা দিয়া যুবকগণের দ্বারা মধ্যে মধ্যে সেই সকল নাটকের অভিনয় করাইতেন। ইহাতে একদিকে যেমন যুবকগণের হৃদয়ে নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগের স্পৃহা জাগ্রত হইত, তেমনি গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা পৌরাণিক পবিত্র কীর্ত্তিকলাপের অভিনয় দর্শন করিয়া নয়ন মন চরিতার্থ করিতেন। ধর্ম্মপ্রাণ হরিনাথ এই উপায়ে বহুদিন পূর্ব্বে দেশের মধ্যে ধর্ম্মভাব ও সুনীতি বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার বাউলের গানে এক সময়ে বঙ্গের অনেক স্থান মাতিয়া উঠিয়াছিল, বিশেষতঃ উত্তর পূর্ব্ব বঙ্গের আবাল বৃদ্ধের নিকটে তিনি বাউল সঙ্গীতের দ্বারাই অসামান্য লোক বলিয়া পরিচিত। এখনও রাখাল বালক সন্ধ্যাকালে ক্লান্ত দেহে গোচারণ ক্ষেত্র হইতে ফিরিতে ফিরিতে উচ্চ কণ্ঠে চতুর্দ্দিক ও স্তব্ধ সান্ধ্য-আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিতে থাকে;——

"দিনত গেল সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা, ডাক্‌ছি হে তোমারে।"

এবং বর্ষার রাত্রে কুলপ্লাবী পদ্মার বিশালবক্ষে উন্মত্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ-চঞ্চল ক্ষুদ্র ডিঙ্গাখানিতে বসিয়া মাছ মারিতে মারিতে জেলে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে এক একবার গাহিয়া উঠে;—

কে যাবি মাছ ধরিতে,
আয় রে ভাই আমার সাথে।"

চরাচর হইতে তাহার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি উঠিয়া যেন ক্ষণকালের জন্য তাহার অন্তরের মানুষটিকে জাগাইয়া তুলে। অনেকের সংগীতে বিশ্বের অনেক সুখদুঃখ ধ্বনিত হইয়াছে—কিন্তু হরিনাথের বাউলসংগীতে হৃদয়ের মধ্যে যেমন সংসারের অনিত্যতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাসভাব জাগাইয়া তুলে, এমন আর কিছুতেই নহে। রূপের গর্ব্ব, ঐশ্বর্য্যের অভিমান, বাসনার আসক্তি হইতে ক্ষুদ্র নরহৃদয়কে রক্ষা করিবার পক্ষে হরিনাথের সংগীত এক অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রস্বরূপ। ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, রংপুর প্রভৃতি জেলার অনেক লোকই হরিনাথের জ্ঞানভক্তিময় সাধনতত্ত্ব-রসমধুর, দেবভাবোদ্দীপক সঙ্গীত শ্রবণে হরিনাথকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। ঢাকায় যখন হরিনাথ পূজ্যপাদ পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ

গোস্বামীর আশ্রমে অতিথি হন, তখন ঢাকা সহর হরিনাথের বাউল-সংগীতস্রোতে প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল।

এই সকল সংগীতের ভাষায় তাঁহার নির্ভরশীল ভক্তহৃদয়ের শান্ত মধুরভাব ধ্বনিত হইয়া উঠিত। তিনি বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন হন; সুতরাং পিতৃমাতৃ-স্নেহের যে একটি আজন্ম-সঞ্চিত-ক্ষুধা—তাঁহার ক্ষুব্ধহৃদয়ের অন্তস্তলে প্রতিদিন পোষিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা অবশেষে বিশ্বজননীর অনাদি অনন্ত প্রেমের প্রগাঢ়তার সহিত বিলীন হইয়াছিল; তাঁহার হৃদয়ের সেই ক্ষুধা, সেই পিপাসা এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের সেই আকণ্ঠ শান্তি তাঁহার সঙ্গীতের প্রতি ছত্রকে অনুরঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে, সে গুলি তাঁহার প্রেমিক হৃদয়েরই আকুল প্রতি-ধ্বনি। কত দুঃখ কষ্ট শোক প্রপীড়িত নর নারী তাঁহার সংগীত শ্রবণে ক্ষণ-কালের জন্য সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইত। তিনি যদি এই সহস্রাধিক গান লিখিয়াই স্বীয় জীবন শেষ করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার পবিত্র নাম অসংখ্য নর নারী চিরদিন সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিত। হরিনাথের রচিত গানের সংখ্যা করা যায় না। আমরা অনেক গুলি গান একত্র সংগ্রহ করিয়াছি এবং তাহারই মধ্য হইতে কয়েকটী অতুল্য সংগীত একত্রিত করিয়া এই গ্রন্থাবলীতে প্রকাশ করিলাম। তাঁহার সংগীতের প্রত্যেকটির মধ্যেই জ্ঞানপ্রেমময় কত নিগূঢ় ভাব, কত প্রাণ-স্পর্শী মধুরতা রহিয়াছে! তাঁহার দেবজীবন কেবল কবিতাময় ছিল। একদিকে তিনি যেমন নিরাশ্রয় প্রপীড়িত দীনদরিদ্রের রক্ষার জন্য প্রাণপণে অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রাম ঘোষণা করিতেন, অপর দিকে তাঁহার সুকণ্ঠ-নিঃসৃত স্বরচিত পবিত্র গীতস্রোতে দুঃখ দৈন্য সমস্ত ভাসিয়া যাইত। সহস্র সহস্র শ্রোতা চিত্রপুত্তলির মত অতৃপ্ত হৃদয়ে তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত সংগীত-সুধা পান করিত ও নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিত।

যাঁহার রচিত গান শ্রবণে পূর্ব্ব উত্তর ও মধ্য বঙ্গের লোক এত উন্মত্ত হইয়াছিল, তিনি কিন্তু সর্ব্বদাই নিজেকে গোপনে রাখিতে চাহিতেন; নতুবা কি তিনি বঙ্গদেশের এক ক্ষুদ্র পল্লীতে কাঙ্গালের মত জীবন যাপন করিতেন? তিনি আলোক সহিতে পারিতেন না। অপরের অলক্ষ্যে থাকিয়া কায করাই তাঁহার কামনা ছিল। প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় পত্রান্তরালে থাকিয়া সৌরভ বিকাশ করাই তিনি মহাব্রত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তাই, যদি কোন সময় তাঁহার কোন কথা স্মরণার্থ নোট করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যাইত, তাহা হইলে তিনি অপ্রতিভ ভাবে বলিতেন, "তোমরা কি আমায় পাগল করিবে? নীরবে কাজ কর,

গোলমালে কায নাই।” তিনি জগৎ হইতে কার্য্য করিবার প্রণালী শিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন। প্রতিদিন সূর্য্য উঠিতেছে, পৃথিবীর গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাতে নীরবে এক বালুকাকণাবৎ বীজ হইতে প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে; তিল তিল করিয়া বাড়িয়া প্রকৃতি মাতার কোমল ক্রোড়ে কিরূপে অভ্রভেদী কানন-শ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে; কোন প্রকার শব্দ নাই, অসন্তোষ নাই, অখণ্ড সহিষ্ণুতা, অনন্ত শান্তি; আমরা কেন অসহিষ্ণু, অশান্ত হইব? আমাদের ক্ষুদ্র কাযে কেন উচ্চ কলরব উঠিবে? ইহাই তাঁহার প্রদর্শিত শিক্ষা ছিল; তিনি জীবনে কখন এই পথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই।

বার্দ্ধক্য কালে হরিনাথ সর্ব্বদা ধর্ম্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। সংসারচিন্তা, অন্নকষ্ট কিছুই তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিত না। পরের উপকার করা তাঁহার জীবনের কার্য্য ছিল, অন্তিম মুহূর্ত্তেও তিনি সেই পরম পবিত্র ব্রত পালনে উদাসীন ছিলেন না। দুঃখী, তাপী, অনাথ, অসহায়, রোগী, শোক-কাতর ব্যক্তি সকলেই “কাঙ্গালের” স্নেহ পাইত। তিনি মাতৃহীনের মাতা, বিপন্নের বন্ধু, সম্পন্ন ব্যক্তির সুপরামর্শদাতা এবং কুপথগামী জনগণের সুপথপ্রদর্শক ছিলেন। দাসের ন্যায় তিনি অনাথের সেবা করিতেন। বিপন্ন ব্যক্তি তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিরুদ্বেগ হইত। যৌবনকালে হরিনাথ অত্যাচারীর যম ছিলেন। ধনী জমিদার, প্রতাপশালী নীলকর, দুর্দ্দান্ত মহাজনদিগের সহিত তিনি একাকী অসহায় হইয়াও বিধাতার চিরমঙ্গল আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অক্লান্তভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যে তিনি রোগী ও তাপীর সান্ত্বনার স্থল ছিলেন। উত্থানশক্তিরহিত মৃতকল্প চির রোগী, তাহাদের এই দেবহৃদয় বন্ধুটিকে দেখিয়া একবার সসম্ভ্রমে উঠিবার চেষ্টা করিত; পারিত না, শুধু জ্যোতিঃহীন দুইটি দীন নেত্র হইতে অবসাদপূর্ণ হৃদয়ের কৃতজ্ঞদৃষ্টি প্রেরণ করিত; হরিনাথ ধীরে ধীরে রোগীর মস্তকপ্রান্তে আসন গ্রহণ করিয়া তাহার শিরস্পর্শ করিতেন, কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন, কত আশার কথা বলিতেন, শুনিতে শুনিতে সেই মৃতপ্রায় দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইত। রোগীর শয্যাপার্শ্বে—তাঁহার সেই তেজঃপূর্ণ উন্নত সুগৌরদেহ, শ্বেত শ্মশ্রু, গৈরিক বস্ত্র, নগ্নপদ এবং পৃষ্ঠবিলম্বিত শ্বেতবর্ণ রুক্ষ কেশভার দেখিলে মনে হইত—স্বর্গ হইতে বিধাতা বুঝি কোন দেবদূতকে এই রোগীর সেবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন।

হরিনাথ আবাল্য ধর্ম্মানুপ্রাণিত হৃদয়ে সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতেন।

যৌবনে স্বদেশ সেবায় নিযুক্ত থাকিবার সময়ে যে আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম একটী ক্ষুদ্র কবিতায় লিখিয়া গিয়াছেন :—

পাপেতে পৃথিবী থার।
ধর্ম্ম তথা নাহি আর॥
অনেকে "মিলের" ছাত্র।
ধর্ম্ম কর্ম্ম কথা মাত্র॥
কপটতা ধর্ম্মসাজে।
পৃথিবী ঢাকিয়া আছে॥
ধর্ম্ম যদি চাও ভাই।
ধর্ম্মসাজে কায নাই॥
কপটতা পরিহর।
"ভাল হও ভাল কর॥"

এই আদর্শ হইতে প্রাণে যে ধর্ম্মানুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছিল; তাহাতেই শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। এক দিনের জন্যও তাঁহার লেখনী বিশ্রাম লাভ করে নাই। "ব্রহ্মাণ্ড-বেদ" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ মাসে মাসে তাঁহার সাধনতত্ত্বসমূহ প্রকাশ করিত এবং রোগে শয্যাশায়ী হইয়াও মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে "মাতৃ-মহিমা" নামে একখানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ২২ শে চৈত্র তাঁহার মৃত্যুদশা উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া যে শেষ উপদেশ কবিতায় রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই মুমূর্ষু সাহিত্য-সেবকের প্রাণের নিবেদন প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে। সেই শেষ উপদেশ এখনও যেন কর্ণোপান্তে ধ্বনিত হইতেছে।

"আগেও উলঙ্গ দেখ শেষেও উলঙ্গ।
মধ্যে—দিন দুই কাল বস্ত্রের প্রসঙ্গ॥
মরণের দিন দেখ সব ফকিকার।
তবে কেন মূঢ় মন কর অহঙ্কার॥
আমি ধনী আমি জ্ঞানী মানী রাজ্যপতি।
শ্মশানে সকলের দেখ একরূপ গতি॥
কেবা রাজা কেবা প্রজা কে চিনিতে পারে
তবে কেন মর জীব ধন অহঙ্কারে॥

পুঁথি পড় পাঁজি পড় কোরাণ পুরাণ।
ধর্ম্ম নাই এ জগতে সত্যের সমান॥
সত্য রাখি কর কর্ম্ম সংসার পালন!
পাপ নাহি হবে দেহে মৃত্যুর কারণ॥
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু সকলেই জানে।
লোভের ধাঁধায় প'ড়ে কেহ নাহি মানে॥
না মানে কুবুদ্ধি লোক মনে ভরা মল।
আগুনে পুড়িয়া মরে পতঙ্গের দল॥
মায়ের সমান নাই শরীরপালিকা।
ভার্য্যার সমান নাই শরীরতোষিকা॥
আনন্দ কারণ দেখ বালক বালিকা।
সর্ব্বদুঃখহরা দুর্গা রাধিকা কালিকা॥"

হরিনাথের সুপবিত্র কর্ম্মময় জীবনের কয়েকটিমাত্র কথা প্রসঙ্গক্রমে আমাদের সহৃদয় পাঠকগণের গোচর করিয়া তাঁহার মধুময়ী রচনার কিয়দংশ তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতেছি। হরিনাথের গ্রন্থাবলীর যে অংশ প্রকাশিত হইল, তাহা যদি আজিকার এই বিংশ শতাব্দীর নবউষালোকে উদ্ভাষিত নবরুচি-নিপুণ শিক্ষিত পাঠকের আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ভরসা করি, তখন এই স্বদেশভক্ত, ধর্ম্মপ্রাণ গ্রাম্যকবির আন্তরিকতাপূর্ণ রচনাবলীর অবশিষ্টাংশ তাঁহাদিগের সম্মুখে সমুপস্থিত করা প্রকাশকের পক্ষে নিতান্ত ধৃষ্টতার পরিচায়ক হইবে না।

বিনীত—
শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার।

পরমার্থ গাথা।

মানব জীবন।

এই ত মানব-জীবন ভাই !
এই আছে আর,—এই নাই।
যেমন পদ্মপত্রে, জল টলে সদাই ;—
তেম্‌নি দেখিতে দেখিতে নাই !
আজ গেল আবার
পরে যাবে কেহ ;—
অনিত্য এই মানব দেহ !
তবে কেন অহংকারে
বল মত্ত সদাই !
যদি যেতে হবে,—জান নিশ্চয়,
তবে বৃথা কেন হারাও সময় ?
চিন্ত অন্তের উপায়,
কর এখন সত্য আশ্রয় !
সময় যা যাবার, তা গেছে চ'লে,
আর হারাও কেন মায়ায় ভুলে ?
এখন কাতর হ'য়ে,
ডাক দীনবন্ধো ! ব'লে।

অনিত্য সংসার।

দেখলাম্ ভেবে সার, সকলি অসার,
অনিত্য সংসারে তুমি মাত্র সার।
পৃথক্ পৃথক্ কায়া, কেবলমাত্র মায়া,
ছায়া প্রায় মায়া না রহিবে আর ॥

আকাশের মেঘ কত ভাব ধরে,
অবস্থিত নহে তিলার্দ্ধের তরে ;—
তেমনি সংসার, স্বপ্ন-ব্যবহার,
এই দেখি আছে,—না দেখি আবার ॥

প্রলোভনী শক্তি পাপ-পুণ্য-কথা,
লৌহ আর স্বর্ণ শৃঙ্খল যথা ;
তুমি ভিন্ন আর সকলি যে বৃথা ;
তবে কেন আমি বলি আমার আমার।

গতি।

আমার কি হবে গতি ?
আমি ভব-কূলে আছি দাঁড়ায়ে সম্প্রতি ॥

তব নাম-রুচি, ভক্তি, প্রেম-বল,
ক'রেছিল যারা ভবের সম্বল,
(তারা) ত'রে গেল সবে, মহাভবার্ণবে,
আমার নাই সঙ্গতি ॥

দয়া বিতরণে, যে ধন রতনে,
দিয়াছিলে আমার সাথে ;—
সে ধন হারায়ে, ফকীর হইয়ে,
কাঁদিতেছি পথে পথে ;—

অমি দীন হীন কাঙ্গাল নিরুপায়,
না আছে আমার সম্বল সহায় ;
তুমি দয়া করি
না দিলে চরণতরি,
ডুবে মরি,—নাই গতি !

স্বপ্রকাশ।

একবার স্বরূপ প্রকাশ।
ওহে অবিনাশ ; মম হৃদয়-মন্দিরে।
তুমি না হ'লে প্রকাশ,
ওহে স্বপ্রকাশ !
প্রকাশিতে কে পারে ?

সন্দেহ-অনলে পুড়ে হৃদয় প্রাণ,
কঠিন হ'য়েছে পাষাণ সমান ;—
হৃদয় নাহি গলে আর,
শ্রবণে তোমার
মহিমা শ্রবণ ক'রে !

তব নাম স্মরণে, শ্রবণে কীর্ত্তনে,
(কত) মহাপাপী গেল ত'রে ;—
আমি, অতি মন্দমতি, তাইতে মম মতি
ফিরালেও নাহি ফেরে ;—
দয়াময় ! প্রকাশ হও হে ত্বরা ক'রে,
হৃদয়-মন্দিরে,—দেখি প্রাণ ভ'রে ;
পাষাণত্ব যাবে,
মানবত্ব হবে,
চরণ-পরশ ক'রে ॥

সদানন্দময়ী।

মাগো ! এই দশা কি তার ?
তুমি সদানন্দময়ী
জননী যাহার !

পুণ্যসুধা-অন্নে ভাণ্ডার পুরিয়ে,
পৃথিবীতে আমায় আনিলে ডাকিয়ে,
সে সুধা ভুলিয়ে,
গরল খাইয়ে,
জ্বলিতেছি—অনিবার!

দেখে, আমাদের দশা, কে বল্‌বে সহসা,
আমরা তোমার সন্তান?
তুমি নিত্য নিরঞ্জনী, জ্ঞান-স্বরূপিণী,
আমরা ঘোর অজ্ঞান!
নিত্যানন্দময়ীর সন্তান হইয়ে, নিরানন্দে আমরা রয়েছি ডুবিয়ে,
মাগো! এ কলঙ্ক হর,
আনন্দ বিতর
আনন্দময়ী এবার!

তুমি।

এই ত র'য়েছ তুমি!
প্রকাশিত নিজ মহিমায়!
কেমনে বলিব আমি, আমি আছি, তুমি নাই
হেথায়?

প্রতি শিরায় অস্থিরত, শোণিতবিন্দু প্রবাহিত,
নিশ্বাস প্রশ্বাস গত, প্রাণবায়ু সঞ্চারিত;
এ সব ক্রিয়া সম্পাদিত
হয় কি মম চেষ্টায়?

এই যে, জীবের জীবন পবন,
সদা করিতেছে গমন,
বারিদ করে বরিষণ,
এ কি মম ক্ষমতায়?

যদি মম ক্ষমতা হ'ত,
ইচ্ছাতে পবন বহিত,
ইচ্ছাতে ঘন সঞ্চারিত
ঘন বারি বরষিত,
সর্ব্ব কার্য্য সম্পাদিত, হ'ত মম ইচ্ছায়!

কেবা বলে আমি হই স্বাধীন,
চিরদিন তোমার অধীন,
তুমি আছ তাই আছি আমি,
নইলে আমার আমি কোথায়?
এ আমিত্বে তুমিত্ব প্রকাশ,
তাইতে বহে শ্বাস প্রশ্বাস,
তোমা ভিন্ন হে অবিনাশ!
ঘট পট সকলি আকাশ;
দেখিয়া না করে বিশ্বাস (মত্ত) মানব অহমিকায়॥

আমি।

তোমা বই কারে কই মরম বেদনা?
আমি ঘোর নারকী,
পরম পাতকী
গতি হবে কি— কিছুই জানি না!

তোমায় ডাকিব কেমনে,
কিবা সম্বোধনে,
কি বচনে,—আমি তা জানি না;—
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পিতা,
ব্রহ্মাণ্ডের মাতা,
জগৎ-প্রসবিতা আছে জানা।

পরমার্থ গাথা।

আমি অধম সন্তান
না জানি সাধন,
নাহি জানি তব আরাধনা ;
তুমি হও হে দীনবন্ধু,
করুণার সিন্ধু,
করুণাবিন্দু যাচে দীন জনা।

ভিক্ষা।

আমি চাইনে আর
তোমার কাছে অন্য ভিক্ষে।
তোমারি প্রীতি,
গতি মতি,
ভালবাসা, দাও হে শিক্ষে।

যেমন সতী,
যাচে পতি,
পতি-গতি সতীর পক্ষে ;
সেইরূপ আশা,
মম পিয়াসা,
থাকে যেন—তব লক্ষ্যে।

বৃক্ষের কোঠরে বাস, পক্ষপুট অপ্রকাশ
পক্ষি-শিশু রহে যেমন,
নাহি দেখে চক্ষে ;
মৃদুস্বরে, শব্দ করে, ডাকে মাকে অন্তরীক্ষে ;—
সেইরূপ ডাকি,
চেয়ে থাকি,
তোমার দয়া উপলক্ষ্যে।

আবদ্ধ গো-বৎস যেমন, আকুল হয় জননীর কারণ,
দুধের পিপাসা বারণ
না হয় ধারা চক্ষে ;
তব চরণ,—
সুধা কারণ,
যেন কাঁদি সেইরূপ দুঃখে ;—
চতুর্ব্বর্গ,
সুখ স্বর্গ,
উপসর্গ—মম পক্ষে !

উদ্দীপন।

মানস ! ভাব তাঁর।
মহিমা অসীমা যাঁর ;
নির্গুণ ত্রিগুণাতীত ভব-সারাৎসার।

ডাক মন ! প্রেমভরে,
প্রেমময় পরাৎপরে,
প্রেম বিনা এ সংসারে
নাহিক নিস্তার।

তিনি বিভু নিরঞ্জন,
লজ্জা-ভয়-নিবারণ,
পাপ-তাপ বিনাশন,
করুণা-আধার ;—

ত্যজিয়া বিষয়-বাসনা,
শান্ত হ'য়ে কর ধারণা,
যাবে রে সংসার-যাতনা,
হবে ভবে পার।

শান্তি নিকেতন ।

হে নিরাময়, শান্তি-নিকেতন !
হ'য়ে অনুগত-ব্রত, সংসার সেবিলাম কত,
একদিনের তরে সে ত,
না তোষিল, না করিল
শান্তি বিতরণ !

জানিলাম তোমা বিনে, শান্তি নাহি কোন স্থানে,
শান্তি নাহি দিতে পারে
এ অসার সংসার ;—
শান্তি নাহি যে সংসারে, আমি কেন ভজি তারে,
তোমা বিনা এ যাতনা
কে করে বারণ ?

অহর্নিশি যে সংসার দেয় যাতনা,
আমি কেন সে সংসারের করি উপাসনা ;
এ কি বিষম দুর্গতি,
দেখ হে জগতপতি !
ঘুচাও আমার কুমতি
লইলাম শরণ !

তাপিত-জীবন ।

তুমি শিব ! জীব-শরণ !
এই ভবে,
ভবভয়-বিভঞ্জন, নিরাময় নিরঞ্জন ।

পাপ-তাপ-হরণ, দারিদ্র্য-বারণ
পতিত-পাবন,
সর্ব্ব জীবের জীবন ;—
জগতের চিন্তামণি, ভবপারের তরণী
ভয়াপদে জননী
কর অভয় বিতরণ।

আমি ঘোর নারকী, পরম পাতকী,
অতি অভাজন,
ভক্তিহীন, না জানি ভজন ;
সংসার-যাতনা পেয়ে, ডাকি কাতর হৃদয়ে,
হৃদে একবার দেখা দিয়ে,
জুড়াও তাপিত জীবন।

মা।

তাই তোমায় ডাকি মা! বোলে।
ত্রিতাপ-তাপিত-হৃদয়,
পবিত্র-শীতল হয়,
মা ব'লে
ডাকিলে।

নানা রোগে জীর্ণ জরা, মল মূত্রে অঙ্গভরা
কেহ নাহি কাছে এসে,
ঘৃণা ক'রে—না পরশে,
মা না ফেলেন
এমন ছেলে।

সমাজ যারে ত্যাজ্য করে, দণ্ডিত যে রাজদ্বারে,
এমন ঘোর অপরাধী,
কেঁদে তোমায় ডাকে যদি,
তুমি অমনি
কর কোলে!

পাপ-রোগে রুগ্ন হ'য়ে, আছি দ্বারে হত্যা দিয়ে,
নিরুপায় কাতর হ'য়ে,
ডাকিতেছি মা। বলিয়ে,
স্থান দে মা!
চরণতলে!

প্রার্থনা

এই প্রার্থনা দীন জনের হে—
দীননাথ!
বিষয়-বিষ-হ্রদে যেন ডুবি না হে!

আমায় কখন ত্যাগ কর নাই তুমি,
(সাধু পাপী আমি যা হই হে)
যেন তোমায় ত্যাগ না
করি আমি।

আমায় স্বর্গে বা নরকে রাখ,
(তুমি যা কর তাই ভাল হে)
যেন তুমি আমার
হৃদয়ে থেক।

যে সুখ তোমাকে ভুলায়ে রাখে,
(নানা প্রলোভনে হে)
আমার কি কায আছে
এমন সুখে?

যে দুঃখ আমায় লয় তোমার নিকটে,
আমার সুখ হ'তে সে দুঃখ
বন্ধু বটে!

ঘুমাও না আর।

ঘুমাও না আর, জাগরে আমার মানস!
প্রভাত নিশি!
(দেখ্‌রে)
জ্ঞান-চক্ষু প্রকাশি,
হ'য়ে একতান
বিভুগুণগান গাইছে জগৎবাসী।

শোন্‌
ওরে মর্ত্ত্যধাম! গাও রে নাম,
বলে পূর্ব্বদিক হাসি ;—
বৃক্ষ অগণন, অশ্রু বরিষণ,—
করে প্রেমানন্দে ভাসি!

হৃদে,
আনন্দ না ধরে, প্রেমানন্দ ভরে,
সুমধুর স্বরে, প্রফুল্ল অন্তরে
পিতার নাম ধ'রে, গুণগান করে,
বিহঙ্গম বৃক্ষে বসি ;—
বিমল আকাশে, মহিমা প্রকাশে,
ভানু ভনু প্রকাশি ;—
তুমি, সচেতন হ'য়ে, অচেতনে র'য়ে,
ভুলে আছ
পিতার, গুণরাশি?

মঙ্গল আরতি।

বল,
সচ্চিৎ-আনন্দ, আনন্দ-বদনে।
গাও
মঙ্গল-আরতি,
প্রীতি মনে প্রতি জনে।

অসীম গগন থালে, নবভানু দীপ জ্বলে,
প্রভাত-পবন চলে,
মন্দ মন্দ
গন্ধ দানে।

ডাকিছে বিহঙ্গগণে, তূরী ভেরী বাজে সঘনে
সে তানে মিলায়ে প্রাণে,
গুণ গাও রে
তানে তানে।

পবিত্র করি হৃদিস্থানে সিংহাসন কর স্থাপন,
প্রেম-অশ্রু বিসর্জ্জনে,
ধোয়াও বিভুর
শ্রীচরণে।

জাগ! জাগ!

একবার জাগ জাগ ভাই!
ভারত-সন্ততি!
অজ্ঞান-আবৃত, মায়া-শয্যাগত,
নিদ্রিত দশায়
কত কর স্থিতি!

মিছে কেন আর কল্পনা-দীপ জ্বাল,
ভারত-আঁধারে সত্য-সূর্য্য উদয় হ'ল,
(উঠ্‌ল)
বিহঙ্গের ধ্বনি, মৃদঙ্গের ধ্বনি,
গাও মঙ্গলালয়ের
মঙ্গল-আরতি।

তত্ত্বজ্ঞান-সত্য-দিবাকর-করে, মহাঘোর মোহ-অন্ধকার হরে,
ভুবন আকাশে, মহিমা প্রকাশে,
(দেখ)
পরমানন্দের আনন্দ-মূরতি ;—

একান্ত-সলিল মনশ্বাধারে, করি প্রক্ষালন, কর পবিত্র আত্মারে,
অকপট-চন্দনে, মাখিয়ে যতনে
কর পরম পিতার
পদে অবস্থিতি !

দেখ না চাহিয়ে !

(একবার)
জাগ, জাগ রে, দেখ না চাহিয়ে !
(ঐ দেখ)
বনপাখিগণ, হইয়ে চেতন,
পিতার নাম স্মরি
গেল রে চলিয়ে।

আশা করি বুকে বাসা বাঁধিয়াছ,
চিরদিন ভবে রবে ভাবিয়াছ,
(ঐ দেখ)
হ'ল প্রাতঃকাল, এল ব্যাধ-কাল,

(কেন)
অকালে জীবন
হারাও ঘুমাইয়ে।

মানস-বিহঙ্গ কত ঘুমাইবি ?
দয়াময় বল মোক্ষফল পাবি,
(একবার)
বল্ রে আত্মারাম, পাবি নিত্যধাম,
(তোর)
সংসার-বৃক্ষবাস
যাবে রে ঘুচিয়ে!

সর্ব্বব্যাপী।

ভেবে দেখ একবার।
বাহিরে আছেন যিনি, তিনি হৃদয়ে তোমার।

যিনি আকাশ-মণ্ডলে,
তিনি আবার ধরাতলে,
যিনি জলে তিনি স্থলে,—সম ভাব তাঁর।

ওরে ভ্রান্ত মূঢ় মন!
বৃথা তীর্থ-পর্য্যটন,
হৃদে কর অন্বেষণ, দরশন পাবে তাঁরে ;—

ভক্তি-কুসুম তুলিয়ে,
প্রেম-চন্দনে মাখিয়ে,
কাতরে ডাকিয়ে তাঁরে দাও উপহার।

আপন।

গেল রে দিন,
ভুল রইল চিরদিন (মন রে)!
বিষয় রসে
দিন হারালি,
শেষের, সে দিন নিকট দিনে দিনে।

বিবিধ বিষয় ভবন, দারাপুত্র পরিজন,
সদা বল আপন আপন,
আপন কে তোর? তাঁরে চিন্‌লি নে।

ভুলে পরকে আপন বলিলি, আপন দোষে আপন হারালি,
কি করিতে কি করিলি,
অন্ধ হ'লি ঘোর অজ্ঞানে।

আয়ুশেষ।

আয়ু শেষ হ'ল
পলিত কেশ (মন রে!)
দেশে দেশে ঘুরি আর কত দিন
রবে বিদেশে?

স্বদেশে যেতে সম্বল, পাথেয় কি ক'রেছ বল?

বল পার হবে রে কিসে?
সে পথে সব আপন আপন, সঙ্গী না হবে পরিজন,
ধার মিলে না হ'লে প্রয়োজন
কেহ কারে না জিজ্ঞাসে।

বিষয়-বাসনা।

আমার গেল প্রাণ,
নাই আর পরিত্রাণ,
মন-দহে পাপানল জ্বলন্ত ;—
বিপদ সময়, কোথা দয়াময়, কাতরে ডাকি তোমারে,
ও নাথ !
সহেনা সহেনা যাতনা অনন্ত !

বিষয়-বাসনা পবন প্রবল,
করে উদ্দীপন নির্ব্বাণ পাপানল ;
চারিদিকে বেড়া সংসার-দাবানল,
জ্ব'লে মরি পাপ-দাহে অবিশ্রান্ত !

বিনা তব পদ-হ্রদ-সুধা-জল,
বিষয়-পাপানল না হয় শীতল,
দয়া করি দেও চরণ-শতদল,
শোক তাপ ত্যজি করি হে অন্ত !

সংসার সেবা।

ওহে পরমেশ !
নাহি পুণ্যলেশ
যাতনা অশেষ, সংসার সেবায় !
যদি করি পণ, তোমার সাধন,
দুর্জ্জয় প্রলোভন আসিয়ে দাঁড়ায় !

একেবারে তোমায় হৃদে-বিসর্জ্জন,
বিসর্জ্জন দিলায় যৌবন-রতন,

বার্দ্ধক্য আগত
কভু ভয়-ভীত,
তবু নহে রত ভক্তি-ভজনায়!

সদা কর মোর অন্তরে নিবাস,
তোমার সাক্ষাতে এ কি সর্ব্বনাশ!
এমন স্বাধীনতা,
কেন দিলে পিতা,
খাইলাম মাথা, হারালাম তোমায়!!

পাপাচার।

তুমি সত্য তুমি নিত্য, অনিত্য ভব-সংসারে।
আলোক ছাড়িয়ে আমি রইলাম প'ড়ে অন্ধকারে॥

একে দুর্ব্বল প্রকৃতি, তাহে লোভে পূর্ণ ক্ষিতি,
কি হবে আমার গতি, বিপদে ডাকি তোমারে,
ভক্তিহীন অভাজন ভবসিন্ধু-সন্তরণে ;——
স্বাধীনতার মুখে ছাই, হাতে তুলে গরল খাই,
ডুবু ডুবু যাই যাই, তবু রত পাপাচারে!

রসাতল।

দয়াময়!
এ ঘোর বিপদ-সময়,
স্থান দেও অভয় পদতলে।
আমি
হারায়ে এবার, জ্ঞান-কর্ণধার,
ডুবে মরি পাপ-জলধি-জলে!

আমি কূলে যেতে চাই,
ছ'জন নাবিক ভাই,
অরি সদাই ;—সে পথে না চলে !
(বিষয় লোভে পাকে হে)
(সদা ঘুরায় আমায়, পাকে পাকে)
তারা
ডুবাইল নরক-রসাতলে !

যদি দয়া করি, দেও হে চরণতরি,
তবে তরি, নইলে ডুবে মরি ;
(নিজ বল কিছু নাই)
(ডাকি তোমায়, পতিতপাবন ব'লে)
তুমি
দুর্ব্বলের বল বিপদকালে !

কি করিলাম।

ভবে এসে কি করিলাম ?
নিজ দোষে, বিষয়-রসে
মজিলাম !
ধন মান আশে, যশঃ-পরবশে
পরমার্থ ধন হারাইলাম !

যে অর্থ অনর্থ ঘটায় সর্ব্বক্ষণ,
জীবের শান্তি-সুধা সদা করে হরণ ;—
সেই অর্থ তরে, পাশরি তোমারে,
বিষয়-সাগরে ডুবে মরিলাম !

বারম্বার আমি হ'তেছি পতিত,
পতিত তনয়ে ধরিতেছ পিতঃ !

(ঐ)

না হ'ল আমার, জ্ঞানের সঞ্চার,
অসার সংসার সার ভাবিলাম!

শরণাগত।

ওহে দয়াময়! সর্ব্বজনাশ্রয়! আমি নিরাশ্রয়
লইলাম শরণ।
তুমি বিশ্বপতি, অগতির গতি, আমি পাপমতি
না জানি সাধন।

রিপুবশে আমি হইয়ে অজ্ঞান,
পরমার্থতত্ত্ব না করি সন্ধান;—
করুণানিধান! কর কৃপাদান, (দীননাথ হে);—
এই পতিতে উদ্ধার কর পতিতপাবন!

ভরসা।

দীন দয়াল!
আমার ভরসা এখন কেবল তুমি।

করি নিরবধি অহিতাচার,
নাহি শুনি উপদেশ তোমার;—
ঘোর নারকী পাতকী,
আমি অধম সন্তান!

তোমা বিনা আমার, কে আর আছে?
আমি কাঁদিব নাথ! আর কার কাছে?
কে বুঝিবে মনের বেদনা
তোমা বিনা হে?

আশা।

ওহে সর্ব্বাশ্রয়!
তুমি বিশ্বময়,
তবে হে হৃদয় ভয়ে কেন ভীত?
জীবগণ তরে, অক্ষয়-ভাণ্ডারে,
আছে স্তরে স্তরে
খাদ্য নানা মত!

বারণ ঘোটক আদি জীবগণ,
অনশনে মরে,—শুনি না কখন,
তবে কেন নর ব্যাকুল অন্তর,
দুর্ভিক্ষের ভয়ে হৃদি বিকম্পিত?

বুদ্ধিবৃত্তি নরের দেবারাধ্য বল,
ধর্ম্মবুদ্ধি কিবা অপূর্ব্ব সম্বল,
অকাল-মরণ নিজ কর্ম্মফল;
ভ্রমে দোষ তোমায় করি আরোপিত!

ভ্রম-পারাবারে মানব মগন,
পতিতে উদ্ধার পতিতপাবন!
দয়ার সাগর, ভয় বারণ কর,
তোমার চরণে ভাকত লুণ্ঠিত!

সত্য-সনাতন।

মন ভজরে নিত্য নিত্য,
সত্য সনাতন নিত্য;
সত্য বিনা মুক্তি নাই আর
জেন এই সত্য সত্য।

সত্য-সেবায় আত্ম-শুদ্ধি, দূরে পালায় ভ্রমবুদ্ধি,
সত্য-তত্ত্বে জ্ঞানবৃদ্ধি,
সুপ্রকাশ্য আত্মতত্ত্ব।

লইলে সত্যের শরণ, অহঙ্কার না থাকে কখন,
দ্বেষ হিংসা কাম ক্রোধ
দূরে করে পলায়ন ;—
সত্যকে রাখিলে হৃদে, ডোবে না জীব পাপহ্রদে,
সত্য কলুষ সংহারে,
প্রকাশে বিভু-মাহাত্ম্য।

সত্য ভিন্ন ধর্ম্মকর্ম্ম, ধর্ম্ম-নয়,—সে ধর্ম্ম-মর্ম্ম,
ভেদকরা কলুষ অস্ত্র,
মনে জেন নিশ্চয় ;—
শোন ওরে ভ্রান্ত মন! সত্য পথে কর ভ্রমণ,
ষড়্‌রিপু হবে দমন,
পাবে পরম পদার্থ!

আত্ম-সমর্পণ।

তোমারি মহিমা নাথ! হেরিতেছি অনুক্ষণ।
কি দিব হে উপহার?
ধর মোর প্রাণ মন।

যে দিকে ফিরাই নয়ন, তব প্রেমেতে মগন,
স্বভাব স্ব-ভাবে যেন
করে তব গুণগান!

উষায় পুষ্পিত বনে, ভূষিত নীহার-যতনে,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে যতনে,
পূজে নিত্য ও চরণ!

দিবায় আলোকদান, করিতে তব তপন,
শোভে আহা অনুদিন,
গগন-থালে কেমন ?

নিশায় শশী বিকাশে, তারাদল সুপ্রকাশে,
করে মন্ত্রের উল্লাসে
তব মহিমা ঘোষণ।

বিশ্বরূপ

নিস্বরূপ রূপ রে !
কে বলিতে পারে ?
যে রূপ সাধক-মানসে, স্ব-রূপ প্রকাশে,
সেইরূপ প্রকাশিতে
বাক্য মন হারে !

যে রূপের রূপে রবি তারা শশী,
আকাশে প্রকাশে, তমোরাশি-নাশি,
যখন
সে রূপের আভা হৃদে লাগে আসি,
নয়নজলে ভাসি,
ভাসি রূপ-সাগরে !

ঝাঁপ দিয়ে প'ড়ে সে রূপের সাগরে,
একেবারে আমি হারাই যে আমারে,
তখন,
তিনি আমি কে, চিনিতে কে পারে ?
স্ব-রূপে স্বরূপ
মিশে একেবারে !

সে রূপ-সাগরে যে তরঙ্গ দেখায়,
নেচে নেচে ছুটে তরঙ্গ খেলায়,—
তখন,
ভুবন ভুলায় রে—জীবন জুড়ায়,
মহা সিন্ধুনীরে
ডুবায় একেবারে!

যিনি পিতা, তিনি মা রূপে দেন দেখা,
পিতামাতা রূপে তিনি প্রেমে মাখা,
দেখ,
প্রকৃতির রূপে পুরুষরূপ ঢাকা,
সগুণে নির্গুণ—
রূপ প্রকাশ করে!

বিজয় বসন্ত।

উপক্রমণিকা।

একদা পরীক্ষিৎ রাজেন্দ্র সসৈন্যে মৃগয়ায় গমন করিয়া অরণ্য অবরোধ করিলে, বিপিনবিহারিগণ ভয়াকুল হইয়া ইতস্ততঃ নিবিড়ারণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। রাজানুচরেরা অনেকক্ষণ মৃগের অনুসন্ধানে ও অনুসরণে ক্লান্ত হইয়া, বিস্তৃত তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিল। রাজা অশ্বারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক হরিণ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি শরাসনে শরসন্ধান করিয়া মৃগপৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। মৃগবর তাহাতে কিছুমাত্র কাতর না হইয়া নক্ষত্র-বেগে ধাবিত হইল। রাজাও তাহার অনুগমনে ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু ঘোটক বন-পর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া মৃগতুল্য-বেগে ধাবিত হইতে পারিল না। হরিণ এই অবকাশে নরেন্দ্রের দৃষ্টিপথাতীত হইল। রাজা অশ্ববেগ সংবরণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন, দিবাকর মস্তকোপরি উঠিয়া, অনলশিখা-স্বরূপ কর প্রদান করিতেছেন। অশ্ব অতিশয় ঘর্ম্মাক্ত হইয়া সম্মুখে টলিত হইতেছে, এবং ফেনাক্ত-নাসিকায় সঘনে নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। আপনার অবস্থাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। পরিধেয় দুকূল ও উত্তরীয় বসন স্বেদজলে একেবারে আর্দ্র হইয়া গিয়াছে, তথাপি মৃগান্বেষণে বিরত হইলেন না। অনন্তর তিনি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলান্বেষণে সমীপস্থ এক তপোবনে প্রবেশ করিলেন এবং মৌনব্রত এক মুনির নিকটে কাতরস্বরে বারংবার জল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মুনিবর অনির্ব্বচনীয় ভাবের প্রাদুর্ভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য ছিলেন, রাজার বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল না; সুতরাং তিনি কোন কথার উত্তর দিলেন না। সম্রাট্ অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিয়া, দৈব-দুর্ব্বিপাকে রাগান্ধ হইলেন, এবং মহর্ষিকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া কহিলেন, রে তাপস! রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী তোর সমক্ষে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান ও পিপাসু হইয়া বারংবার

জল প্রার্থনা করিতেছেন; অভ্যর্থনা দূরে থাকুক, অহঙ্কার-বশতঃ তুই উত্তরদানেও বিরত হইলি। থাক্, ইহার উচিত প্রতিফল দিতেছি। এই বলিয়া তিনি চারি দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে এক মৃত সর্প দেখিতে পাইলেন। তাহাকে শরাগ্রে বিদ্ধ করিয়া মুনির কণ্ঠে অর্পণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

অপমানিত মুনির পুত্র শৃঙ্গী স্থানান্তরে বয়স্তের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। সন্দীপন মুনির পুত্র কৃশ যদৃচ্ছাক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া বারংবার ক্রীড়ার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিলেন। শৃঙ্গী ক্রোধ পরবশ হইয়া কহিলেন, কৃশে! আত্ম-গৌরব আর বৃদ্ধি করিস্ না, তোর পিতার যত বিদ্যা বুদ্ধি সকলই জানি, আমার পিতার সহায়তা ভিন্ন রাজ-সদনে যাইতে তাঁহার মুণ্ডচ্ছেদ হয়। কৃশ সক্রোধে কহিলেন, অরে, জানি রে জানি শৃঙ্গে! আর গৌরব করিস্ না, রাজার নিকটে তোর পিতার যত প্রভুত্ব ও মান সম্ভ্রম, অদ্য তাহা সকলই ভালরূপে প্রকাশ পাইয়াছে; গৃহে গিয়া দেখ্, রাজা পরীক্ষিৎ তোর পিতার কি দুর্দশা করিয়া গিয়াছেন। শৃঙ্গী ঈদৃশ-বজ্রবৎ-বাক্যশ্রবণে এককালে ক্রোধসাগরে ও বিষাদনীরে নিমগ্ন হইয়া গৃহে গমন করিলেন; এবং দেখিলেন, তাঁহার পিতার কণ্ঠদেশে মৃত সর্প দুলিতেছে। তখন সর্পসদৃশ তর্জ্জন-গর্জ্জনে কহিলেন, 'রে দুরাত্মন্ পরীক্ষিত! ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া নির্দ্দোষী ব্রাহ্মণকে যেমন আপমান করিলি, তেমনি সপ্তাহের মধ্যে তক্ষকদংশনে তোর প্রাণ বিয়োগ হইবে।'

নির্ব্বাত সময়ে সরোবরের স্থির সলিলে অকস্মাৎ শিলাখণ্ড নিক্ষিপ্ত হইলে সমুদায় জল যেমন চঞ্চল হইয়া উঠে, শৃঙ্গিকর্ত্তৃক অভিসম্পাতে মহর্ষির অন্তঃকরণ তদ্রূপ বিচলিত হইয়া তাঁহার সমাধি-ভঙ্গ করিল। তিনি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, হা বৎস! কি করিলে, যাঁহার শাসনে তপস্বিগণ নিরুদ্বেগে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, যাঁহার অসাধারণ পুণ্যবলে ধরণী প্রচুরশস্যশালিনী হইয়া প্রজাসকলকে সুখ সচ্ছন্দতা বিতরণ করিতেছেন, সেই মাদৃশজননাথ বন্ধুকে কেন এই নিদারুণ শাপে অভিশপ্ত করিলে। হাঁ রে নির্দ্দয়! ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণধর্ম্মকে এককালে কলুষিত করিলে! দয়া, ধর্ম্ম, ক্ষমাগুণেই এ কুল জগদ্বিখ্যাত; বৎস! অদ্য তোমা হইতে সেই নিষ্কলঙ্ক কুল কলঙ্কিত হইল। শৃঙ্গী পিতার ঈদৃশ-বাক্য শ্রবণে অনুতপ্ত হইয়া কহিলেন, তাত! আমার কথাতে কি হইতে পারে? আমি কাহাকে কি না কহিয়া থাকি? করিশিশুর ক্রোধে কি কখন কেশরীর মন্দ হইতে পারে? মহর্ষি, বালকের বাক্য শুনিয়া, হাস্য করিয়া কহিলেন, বাছা! সর্পশিশু কি স্বধর্ম্ম অবলম্বন করে না? তুলসীপত্র-মধ্যে কি

ইতর-বিশেষ আছে? তুমি কি কখন শুন নাই যে, মুনিতনয় দ্বন্দ্বপ্রিয়ের অভিসম্পাতে চিত্ররথ গন্ধর্ব্বপতি সহোদর ও সহধর্ম্মিণীর সহিত মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া কত কষ্ট পাইয়াছিলেন? আহা! তাঁহাদিগের সেই অপার দুঃখের কথা মনে হইলে, আমার হৃদয় অদ্যাপি বিদীর্ণ হইতে থাকে।

শৃঙ্গী পিতার প্রমুখাৎ শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব্বপতি প্রভৃতির দুরবস্থা-শ্রবণে, তাহার আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত শুনিতে একান্ত উৎসুক হইয়া সবিনয়ে কহিলেন, তাত! সেই মহাপুরুষেরা কি অপরাধে শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং কত দিনই বা মর্ত্ত্যলোকে দুর্গতি ভোগ করিয়া পুনরায় স্বধামে প্রতিগমন করেন, শুনিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে। মহর্ষি কহিলেন, বৎস! তাঁহাদিগের সেই দুঃখের বৃত্তান্ত সামান্য নহে যে সঙ্ক্ষেপে বলিব। যদি শুনিতে নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তবে এক্ষণে ক্ষান্ত হও, দিনকর অস্তাচলে গমন করিলে, অবকাশসময়ে সমুদায় বর্ণন করিব। শৃঙ্গী পিতার এই আজ্ঞা পাইয়া, সূর্য্যের অস্তাচলাবলম্বন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি সায়ংকালীন কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-সমাধান্তে অবকাশাসনে আসীন হইলে, শৃঙ্গী ও অন্যান্য মুনিকুমারেরা ইতিহাস-শ্রবণোৎসুক হইয়া, তাঁহাকেবেষ্টন করিয়া বসিল। মহর্ষি কথা আরম্ভ করিলেন।

মহর্ষি কহিলেন, বৎসগণ! শ্রবণ কর। যে বিস্তৃত পর্ব্বতমালা ভারতবর্ষের উত্তর সীমা, সেই পর্ব্বতের নাম হিমালয়। অতিপূর্ব্বকালে ঐ পর্ব্বত গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সরা প্রভৃতির নিবাসস্থান ছিল। চিত্ররথ নামে গন্ধর্ব্বরাজ পর্ব্বতের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার অনুজের নাম চিত্রধ্বজ। সেই দুই সহোদরের অকপট স্নেহের কথা কি কহিব; অনল অনিলের ন্যায়, তিলার্দ্ধকালও পরস্পরের বিচ্ছেদ ছিল না।

প্রসিদ্ধ প্রভাস নদের কূলবর্ত্তী কাম্যবনমধ্যে, গন্ধর্ব্বপতির বিশ্রামোদ্যান ছিল। সেই উদ্যানটী এমনি সুন্দর যে, অমরগণ অমরাবতী পরিত্যাগ করিয়াও তাহাতে বাস করিতে বাসনা করিতেন। উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী সুরম্য সরোবর; তাহার চতুঃপার্শ্ব-ভূমি শ্বেত-শিলায় মণ্ডিত এবং সোপানগুলি নীলবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত; সুতরাং জলাহরণার্থ নিম্নে গমন করিয়া হঠাৎ দেখিলে বোধ হইত, যেন নীলগিরি-শিখরে রাশীকৃত তুষার পতিত রহিয়াছে! সরোবরের নির্ম্মল বারিপুঞ্জে কমল, কুমুদ, কোকনদ প্রভৃতি জলপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া, মধুমত্ত মধুকরের চিত্ত নিরন্তর আকর্ষণ করিত এবং মন্দ মন্দ সমীরণ-প্রভাবে দিবসে যখন তাহার তরঙ্গমালা আন্দোলিত হইতে থাকিত, তখন আতপপ্রভাবে বোধ

হইত, নলিনীকান্ত নলিনীর বিরহানলে দ্রবময় হইয়া নলিনী সহিত সরোবরে জলক্রীড়া করিতেছেন; হংস, চক্রবাক, সারস, সারসী প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সেই তরঙ্গোপরি ইতস্ততঃ সন্তরণ করিয়া নলিনীনাথের অনুচিত ব্যবহার অপলাপ করিতেই যেন পক্ষপুট বিস্তার করিতেছে। কদম্ব, চম্পক, বকুল, নাগকেশর, শেফালী প্রভৃতি তরুমণ্ডলী; যুথী, জাতী, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি লতামণ্ডলী, যথানিয়মে শ্রেণীবদ্ধ থাকায়, তন্নিকটবর্ত্তী চতুঃপার্শ্ব-স্থল এরূপ সুরম্য হইয়াছিল যে, পরিশ্রান্ত জনগণ দর্শনমাত্রই বিশ্রামসুখে পরিতৃপ্ত হইত।

একদা গন্ধর্ব্বস্বামী সহোদর ও সহধর্ম্মিণী সহিত শকটারোহণে প্রভাস-তীর্থে যাত্রা করিলেন, এবং প্রভাস নদের সুস্নিগ্ধ সলিলে স্নানাদিক্রিয়া সমাধা করিয়া, চিত্তবিনোদনার্থ সেই বিশ্রামোদ্যানে উপস্থিত হইলেন। উদ্যান-পালক সহসা স্বামীকে সমাগত দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে প্রণাম করিল। চিত্ররথ কহিলেন, উদ্যান পালক, আমরা গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ পর্য্যন্ত এই স্থানেই অবস্থান করিব, এই সন্দেশ লইয়া তুমি রাজধানীতে গমন কর। উদ্যানপালক যে আজ্ঞা বলিয়া প্রস্থান করিল। গন্ধর্ব্বপতি সহধর্ম্মিণী-সহবাসে দিন-যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

এক দিন প্রভাকরের প্রখর-কর-প্রভাবে উদ্যানস্থল অতিশয় উত্তপ্ত হইলে, গন্ধর্ব্বস্বামী সীমন্তিনী-সমভিব্যাহারে জলাশয়ে জলক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। অনেকক্ষণ ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহারা মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন; সুতরাং তৎকালে তাঁহাদিগের হিতাহিত জ্ঞান কিছুমাত্র ছিল না। এমন সময়ে ঋষিতনয় ব্রহ্মপ্রিয় বনপর্য্যটনে তৃষ্ণাতুর হইয়া, সরোবরে নামিয়া করপুটে জলপান করিতে লাগিলেন। ক্রীড়াসক্ত গন্ধর্ব্বপতিদিগের পাদক্ষিপ্ত জল বারংবার তাঁহার গাত্রে পতিত হওয়ায়, প্রথমতঃ তিনি পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিলেন; পরিশেষে রোষপরবশ হইয়া কহিলেন, "রে নিলর্জ্জ ব্যলীক! ইন্দ্রিয়-সুখলালসায় এককালে লজ্জাভয়কে বিসর্জ্জন দিয়াছিস্, এবং অবজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অবমাননা করিতেছিস্। যদি ব্রহ্মবংশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, তবে এই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হেতু নিশ্চিত তোদিগকে মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং এখন যেমন তোদিগের অভেদ্য সৌহার্দ্দ দেখিতেছি, তদ্রূপ পরকালে ইহার বিপরীত বিচ্ছেদরূপ অনলে দগ্ধ হইতে হইবে। ঈদৃশ অভিসম্পাত করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। যেমন তক্ষক দংশনে প্রাণিগণ ভূতলে পতিত হয়, গন্ধর্ব্বেরা শাপগ্রস্ত হইয়া তদ্রূপ পতিত হইলেন।

মহর্ষি গন্ধর্ব্বদিগের শাপবৃত্তান্ত এইমাত্র কহিয়া, নিস্তব্ধ হইলেন। ঋষি-তনয়েরা সেই পুরাবৃত্ত-শ্রবণোৎসুক হইয়া বিনয়বাক্যে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে, তিনি অগত্যা সম্মত হইয়া পুনর্ব্বার কথা আরম্ভ করিলেন।

প্রথম অধ্যায়।

মহর্ষি কহিলেন, বৎসগণ! শ্রবণ কর। জয়পুর নামে যে মনোহর নগর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, সেই নগরে মহারাজ জয়সেন বসতি করিতেন; রাজার নামানুসারেই উক্ত নগরের নাম জয়পুর হইয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ পরাক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষের সম্রাট সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। তিনি আপন অধিকারের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রতিপ্রদেশে বিদ্যালয়, ধর্ম্মালয় ও চিকিৎসালয়,যথানিয়মে স্থাপন করাতে প্রজাবর্গ এরূপ সভারঞ্জক এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ছিল যে, রামরাজ্যও তদীয় রাজ্যের তুলনাস্থল হইতে পারে না। মহারাজের এক পট্টমহিষী ছিলেন,তাঁহার নাম হেমবতী। তিনি যেরূপ অলৌকিক রূপবতী, তদনুরূপ অসামান্য গুণবতী ও সুশীলা ছিলেন। তিনি সাবিত্রীতুল্য সতী, ছায়াতুল্য পতির অনুগামিনী, ও সখীতুল্য হিতৈ-ষিণী ছিলেন। বস্তুতঃ মহিলারা যেরূপ সদাচার গুণে গুরুজন নিকটে প্রতিষ্ঠিতা ও আদরণীয়া হন, তাঁহাতে সে সকল গুণের অভাব কিছুই ছিল না। কিন্তু গগনমণ্ডল অসঙ্খ্য নক্ষত্র-মালায় খচিত হইয়াও যেমন একমাত্র চন্দ্র-বিরহে রমণীয় হয় না, এবং তরুগণ শাখাপল্লবে উল্লসিত হইয়া সুদৃশ্য ও মনোরম হইলেও ফলবান্ না হওয়ায় যেমন তৎস্বামীর ক্ষোভোৎপত্তি হয়; মহিষী এতাদৃশ উৎকৃষ্ট-গুণসম্পন্না হইয়াও যথাকালে পুত্রবতী না হওয়ায় সেইরূপ অশোভনীয়া ও মহারাজের বিমর্ষের কারণ হইয়াছিলেন।

একদা নরপতি শারদী পৌর্ণমাসীর সায়ংকালে মহিষী সমভিব্যাহারে প্রাসাদো-পরি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বায়ুসেবন করিতেছেন, এইকালে পূর্ব্বদিক্ আলোক-ময় করিয়া পূর্ণচন্দ্র উদিত হইল; চকোর চকোরী সেই সুধাময় কিরণে ক্রীড়া করিতে করিতে শূন্যপথে উড্ডীয়মান হইল; কুমুদিনী প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে নিশানাথকে দর্শন করিতে লাগিল; বিটপিপুঞ্জের হরিদ্বর্ণ পল্লবে চন্দ্রের শুভ্র রশ্মি পতিত হওয়ায় এক আশ্চর্য্য মনোহারিণী শোভা প্রকাশ পাইল;—বোধ হয়, যেন তরুমণ্ডলী অগণ্য হীরকখণ্ডে ভূষিতা হইয়া পবনান্দোলিত শাখা-বাহু দ্বারা

ঋতুরাজকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছে। রাজা ও মহিষী এইরূপ সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনে সানন্দচিত্তে জগদীশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন।

এমত সময়ে রাজভবনের অনতিদূরে এক ব্রাহ্মণশিশু আখটী করিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলে, তাহার মাতা তাহাকে অঙ্কে ধারণ করিয়া, অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা চন্দ্রমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন; "বাছা রে! চুপ কর, ঐ দেখ বুড়ী মা আসিতেছে, এখনি তোমাকে ধরিয়া লইবে।" বালক তাহাতে ভয় না পাইয়া বরং আরও ক্রন্দন করিতে লাগিল। মাতা পুনরায় "চাঁদ আয়, চাঁদ আয়" বলিয়া, পুত্রললাটে অঙ্গুলিস্পর্শ করিতে লাগিলেন।

সন্তানবৎসলা ব্রাহ্মণপত্নীর বাৎসল্য-ভাবের এইরূপ মধুর বাক্য নরেন্দ্রের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, অপত্যস্নেহ-সাগর উদ্বেল হইয়া তাঁহার চিত্তক্ষেত্র এককালে প্লাবিত করিল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই হতাশবায়ু-প্রভাবে দুঃখের তরঙ্গ সমুদ্ভূত হওয়াতে, তিনি আপনার ইচ্ছাতরণীকে স্থির রাখিতে না পারিয়া, অমনি কহিয়া উঠিলেন,—"আহা! কি শুনিলাম, এতদিনে আমার শ্রুতিযুগল শ্রাব্যসুখে সুখী হইল। আমি অপুত্রক, যে স্থলে আমারই এরূপ হইল, সে স্থলে পুত্রবান্ ব্যক্তি, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত-সুকৃতি-ফলে এই অমূল্য পুত্ররত্ন প্রাপ্ত হইয়া, পুত্রের সুকোমল-অঙ্গ-স্পর্শ-সুখে এবং অর্দ্ধস্ফুট মধুর-বাক্য-শ্রবণে ও নবকুসুম-সদৃশ সুকুমার মুখচ্ছবিনিরীক্ষণে আপনাকে চরিতার্থ-বোধে কি না সুখ সম্ভোগ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ মহাপুরুষেরা কহিয়াছেন, একমাত্র পুত্রই কেবল জনক জননীকে পুন্নাম দুঃসহ নরক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণকরণে সমর্থ। পুত্রহেতু রমণীরা পতিপ্রিয়া আদরণীয়া হন। সন্তান-শূন্য গৃহে আর শ্মশানে কিছুই বিশেষ নাই। যে গৃহ বালকদ্বারা পরিবৃত না হইয়াছে, সেই গৃহ জনশূন্য অরণ্য, দীপশূন্য কুটীর, ও তারকশূন্য চক্ষুঃ স্বরূপ। সমুদ্র যেমন সকল রত্নের আকর হইয়াও লবণাম্বু-দোষে মনুষ্যের পানযোগ্য নহে; গৃহী ব্যক্তি ধনে মানে কুলে শীলে সুসম্পন্ন হইয়া, পুত্রবিহীন হইলে তদ্রূপ পিতৃবাসের অযোগ্য হন। গন্ধহীন পলাশ পুষ্প, অসার ফলশস্য, নির্ব্বাতায়ন অট্টালিকা এবং মূর্খ মনুষ্য শোভনতম হইলেও গ্রাহ্য নহে; স্ত্রীরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণে পরিপূর্ণ হইয়াও পুত্রবতী না হইলে, সেইরূপ অনাদৃতা এবং ভর্ত্তৃ ও পিতৃ উভয় কুলের অশেষ দুঃখের কারণ হইয়া উঠে।" রাজা এইমাত্র কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

সহসা নৃপেন্দ্রের মুখ হইতে এতাদৃশ ক্ষোভসূচক দুঃখদবাক্য নির্গত হইয়া রাজদারার সুকোমল সরল হৃদয়ে তীক্ষ্ণাস্ত্র-স্বরূপ বিদ্ধ হইল। তখন তিনি, একবারে

দুঃখের সাগরে নিমগ্না হইয়া অন্তর্বাষ্পভরে কণ্ঠাবরুদ্ধাপ্রায় হইলেন, এবং রাজাকে একটী কথাও না কহিয়া নির্জ্জন নিকেতনে প্রস্থান করিলেন। রাজা অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া, তাঁহার বাক্যে মহিষী মনঃপীড়া পাইয়াছেন, এই অনুশোচনা করিতে করিতে, শয়নালয়ে প্রবেশ করিলেন।

মহিষী ধরাসনে বসিয়া বাম করে কপোল বিন্যস্ত করিয়া,আপনার দুরদৃষ্টের বিষয়ে ভাবনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুধারা নির্গত হইয়া বামভুজ বহিয়া চলিল। সেই সময়ের ভাব ভাবনা করিলে বোধ হয়, যেন পদ্মাসনা মন্দাকিনী মৃণাল-বাহিনী হইয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় তিনি ধরা-শয্যায় নিদ্রাগত হইলেন, এবং যামিনী অবসান হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে স্বপ্নে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। এক মহাতেজস্বী তাপস যেন তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া মধুর-সম্ভাষণে কহিতেছেন, "বৎসে! আর বিলাপ করিও না, আমি তোমার মনোদুঃখ দূরীকরণাভিলাষে নব-দুর্ল্লভ দুইটী মনোহর ফল আনিয়াছি, গ্রহণ কর;" এই বলিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহার করে ফল অর্পণ করিতেছেন, এই কালে মহিষীর নিদ্রাভঙ্গ হইল।

স্বপ্নে এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়া রাজ-জায়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল প্রাতঃসময়ের শীতল সমীর সঞ্চালিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুশীতল ও রোমাঞ্চিত করিতেছে অনুভব করিলেন, এবং নিকটে কেহই নাই,পূর্ব্বের ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এইমাত্র দেখিতে পাইলেন। অমনি ব্যস্তত্রস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়া, দুঃখের দুঃখী সুখের সুখী প্রিয়তমা শান্তা দাসীকে নিকটে ডাকিয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কহিলেন। শান্তা অতিবৃদ্ধা ও বুদ্ধিমতী, সুতরাং স্বপ্নের মর্ম্ম অনায়াসে বুঝিতে পারিয়া, সহাস্যবদনে কহিলেন, ঠাকুরাণি! ভগবান্ আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ফলপ্রদানে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, এক্ষণে ষষ্ঠীদেবীর স্থানে গলবস্ত্রে প্রার্থনা করুন, তিনি আপনার স্বপ্ন সমূলক করিবেন।

অন্তঃপুর-মধ্যে পরস্পর এই কথার আন্দোলন হওয়ায় রাজার কর্ণ-গোচর হইল। যেমন অনাবৃষ্টিতে বিন্দুমাত্র মেঘবারি পতিত হইলে,চাতকের নিরাশ চিত্তে আশালতা অঙ্কুরিত হইতে থাকে, তদ্রূপ মহারাজের হতাশ চিত্তে কিঞ্চিন্মাত্র আশার সঞ্চার হইল।

বাপু সকল! সুখদুঃখের অবস্থা চিরকাল সমান যায় না। দুঃখান্তে সুখের উদয় এবং সুখান্তে দুঃখের ভার অবশ্যই বহন করিতে হয়। অতএব অতিমাত্র

বিপদ উপস্থিত হইলেও ধৈর্য্যাবলম্বনে কাল প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য। দেখ, মহারাজ জয়সেনও একাল পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বনে সময় প্রতীক্ষা করিয়া বিলম্ব-বৃক্ষে মানব-দুর্ল্লভ ফল প্রাপ্ত হইলেন, কেননা কিয়দ্দিবসান্তে হেমবতী গর্ভবতী হইলেন*।

গর্ভাধানে শশিকলা-সদৃশ রাজ-ললনার মুখশ্রী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি মধুর-রসাস্বাদ-বিরতা হইয়া দগ্ধ মৃত্তিকা ও অম্লরসাস্বাদে অধিক ইচ্ছাবতী হইলেন, অপূর্ব্ব পল্যঙ্কোপরিভাগ পরিত্যাগ করিয়া, ধরাতলে অঞ্চল-শয্যা সুখকর বোধ করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে পূর্ণগর্ভা হইলেন।

মহিষীর প্রসব-বেদনা উপস্থিত, রাজা এইমাত্র শ্রবণে প্রমোদ-বাটিকা প্রবেশ পূর্ব্বক অন্যমনস্কের মত, কখন বাহিরে কখন অন্তরে গমনাগমন করিতেছেন। ইতিমধ্যে ব্যজনিকাকে অদূরে ত্রস্তগামিনী দেখিয়া অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যজনিকে! সমাচার কি। অতিবেগে গমন করাতে সে ত তখন কিছুই বলিতে পারিল না, কেবল "মহারাজ!" এই সম্বোধনে সঘনে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। স্নেহের ধর্ম্মই অনিষ্টাশঙ্কা, ইহাতে রাজা একে আর বিবেচনা করিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন। পরে সে গতক্লম হইয়া কহিল, "আপনার একটী সুকুমার হইয়াছে।" রাজা আশানুরূপ শুভ সংবাদ শ্রবণে সন্তুষ্টচিত্তে আপনার কণ্ঠস্থিত বহুমূল্য মনিময় হার সংবাদ-দায়িনীকে পুরস্কার করিয়া অবিলম্বে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। কুমারের সুকুমার মুখ-চন্দ্রমা-নিরীক্ষণে তাঁহার হৃদয়-কুমুদ প্রফুল্ল হইল। তিনি তখনি নিমেষশূন্যলোচনে বারংবার সেই চন্দ্রাস্য অবলোকন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার নেত্র-পিপাসা ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। যতবার দেখেন ততই অভিনব বোধ হয়, এবং সেই সুকুমার সৌন্দর্য্যমালা নূতন নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার চিত্র-পটে অঙ্কিত হইতে থাকে। রাজা আনন্দে বিহ্বল হইয়া কহিতে লাগিলেন, সংসারীরা সংসার-ভারে অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া যে পুত্রের মুখাবলোকনে সকল দুঃখ দূর করেন, যে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে পিতৃলোক পরিতৃপ্ত হন, আমি আজ সেই পুত্রের মুখচন্দ্র অবলোকন করিতেছি, অতএব আমার ন্যায় ভাগ্যবান্ কে আছে?

পৈতৃকরীত্যনুসারে শুভ কর্ম্মে যে ক্রিয়া-কলাপ করিতে হয়, কালক্রমে তাহার কিছুরই অন্যথা হইল না। কুলাচার্য্য নৃপসুতের অলৌকিক রূপলাবণ্য দেখিয়া বিজয়চন্দ্র নাম রাখিলেন। ক্রমে ক্রমে পুত্র বিদ্যাভ্যাসোপযুক্ত-বয়স্ক হইলে, নৃপতি

---

* চিত্ররথ গন্ধর্ব্বপতি সেই অসামান্য দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ কঠোর জঠর-কারাবাস করিতে লাগিলেন।

সুমন্ত্র-নামা প্রধান মন্ত্রীকে উদ্যানমধ্যে এক বিদ্যামন্দির প্রস্তুত করাইতে অনুজ্ঞা করিলেন। মন্ত্রিবর স্থপতিকে ডাকাইয়া, প্রসিদ্ধপ্রণালীমত বিদ্যা-নিকেতন নির্ম্মাণ করিতে কহিলেন। স্থপতি অত্যল্প দিনের মধ্যেই এক অট্টালিকা প্রস্তুত করিল। অনন্তর রাজা ধৈর্য্যশীল, শ্রদ্ধাযুক্ত, ঋজু-স্বভাব, রীতিনীতিজ্ঞ, দূরদর্শী, কুসংস্কার-বিরত শমদমাদি বিশিষ্ট এক আচার্য্য নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সন্নিধানে পাঠার্থে পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। নগরস্থ অন্যান্য বিদ্যার্থীও তৎসঙ্গেই মিলিত হইল।

বাছা সকল! শুনিলে ত, শিক্ষাচার্য্যের কত গুণ থাকা আবশ্যক। উক্তরূপ আচার্য্য না হইলে, সুকুমার-হৃদয় শিশুগণের শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না; কেননা পরিণামে শিষ্যগণ শিক্ষকের প্রকৃতির অনুকরণ করে। যেমন তাম্রপাত্রে স্বর্ণ রাখিলে স্বর্ণ তাম্রবর্ণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিক্ষকের প্রকৃতি হীন হইলে শিষ্য-গণেরও চরিত্র হেয় হয়, সন্দেহ নাই। রাজা জয়সেনের স্থাপিত বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী এখন পর্য্যন্ত আমার মনে জাগরূক আছে। একদা আমি বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, বালকগন একাবলী-হার-স্বরূপ বৃষ্কিকামালায় * বসিয়া আছে, শিক্ষকগণ বেত্র সিংহাসনে বসিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন। সহসা আমাকে সমাগত দেখিয়া তাঁহারা সমুচিত সম্মান পূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন এবং বালকগণও বিদ্যালয়ের প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে সম্ভ্রমসূচক-বাক্য প্রয়োগে দণ্ডায়মান হইল। আমি সহাস্যমুখে তাহাদিগকে বসিতে বলিলাম। সকলে উপবেশন করিল। অনন্তর ক্রমে প্রতি শ্রেণীতে গমন করিয়া দেখিলাম বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, ভূগোল, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যাদি নানাপ্রকার শাস্ত্রের আলোচনা হইতেছে। প্রাসাদের ভিত্তিতে চিত্র-ভূগোল ও চিত্র-খগোল প্রভৃতি বিচিত্র চিত্র-ফলকে চিত্রিত রহিয়াছে। জগদ্‌বিখ্যাত মহামান্য পণ্ডিতগণের প্রতিমূর্ত্তি, দেশ-বিদেশীয় নানাজাতীয় জীব জন্তুর অবিকল চিত্র সকল, স্বচ্ছাদর্শে আবৃত রহি-য়াছে; এবং শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত ভগবান্ বাল্মীকি, ব্যাস, পরাশর প্রভৃতি মহাত্মা-দিগের প্রতিকৃতি দ্বারা বিদ্যালয় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে;—হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, যেন তাঁহারা জীবিত থাকিয়া বালকবৃন্দের বিদ্যা-বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতেছেন। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থসমুদায় গ্রন্থাগারে পুস্তকতক্তাবলীতে † স্তরে স্তরে স্থাপিত রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের প্রান্তরে এক ব্যায়ামালয়, দক্ষিণাংশে সঙ্গীত-শালা, উত্তরাংশে শিল্পালয়, যথানিয়মে প্রতিষ্ঠিত আছে। বিজয়চন্দ্র পাঠাভ্যাসে

---

* বেঞ্চ † চেয়ার।

নিযুক্ত হইয়া অত্যল্পদিনেই সর্ব্বশাস্ত্রে সুদীক্ষিত হইলেন। আচার্য্যেরা তাঁহাকে কৃতবিদ্য দেখিয়া উপযুক্ত প্রশংসাপত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি বিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া রাজনিয়ম ও রণকৌশল শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজাঙ্গনা হেমবতী পুনর্গর্ভবতী হওয়ায় চিত্রধ্বজ গন্ধর্ব্ব তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া যথাকালে ভূমিষ্ঠ হইলেন। গ্রহণোন্মুক্ত পূর্ণেন্দু বিমান-মণ্ডলে প্রকাশিত হইয়া বিমল প্রভা বিস্তার দ্বারা দিঙ্মণ্ডলীকে আলোকময়ী করিলে যেমন রমণীয় হয়, সদ্যোজাত সুত সেইরূপ সূতিকাগৃহকে, রমণীয় করিল। ক্ষুৎপিপাসু দীনজনের অন্নজললাভের সহিত স্বর্ণলাভ হইলে যেমন পরিতৃপ্তি ও আনন্দ জন্মে, এই শুভ সংবাদ শ্রবণে রাজারও তদ্রূপ প্রীতি ও আনন্দ হইয়াছিল। সময়োচিত প্রসব-সংস্কার একে একে সমাধা হইতে লাগিল। কালক্রমে যে যে ক্রিয়াকলাপ আবশ্যক, সে সমুদায়ই সম্পন্ন হইল। রাজা পুত্রের সুকুমার মুখশ্রী অবলোকনে বসন্তকুমার নাম প্রদান করিলেন। বসন্তকুমার মাতার হৃদয় সরোবরে পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটীত হইয়া পিতার নেত্রানন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। নৃপতি এইরূপে পুত্র-কলত্রাদি লইয়া নিরুদ্বেগে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

বৎস সকল! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই পৃথিবীতে সুখদুঃখের অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। যেমন দিননাথ অস্তগত হইলে, তামসময়ী যামিনীর আগমন হইয়া থাকে, সেইরূপ সুখের অবসানে দুঃখের উদয় হয়। রাজা জয়সেন-নিরুৎ-কণ্ঠে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, অকস্মাৎ মহিষীর হৃৎপিণ্ড বিকৃত হওয়ায় এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি দিনদিন কৃশা ও মলিনা হইতে লাগিলেন। তাঁহার অপরূপ লাবণ্য আর কিছুই থাকিল না; দুর্জ্জয় ব্যাধরাহু পূর্ণশশীকে যেন এককালে কবলিত করিল। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক-গণ আনুপূর্ব্বিক চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। উত্তরো-ত্তর ব্যাধির আতিশয্য হইয়া, মহিষী অগ্নিতাপিত পুষ্পের ন্যায় মলিন ও শয্যাগত হইলেন এবং আসন্নকালে প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়কে নিকটে বসাইয়া, বসন্তকুমারের হস্ত ধরিয়া বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, বাছা বিজয়! দুরন্ত কাল ব্যাধিরূপে আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। ইহার কঠিন হস্ত হইতে আর আমার অব্যাহতি নাই। বাছা রে! আমার মনের ব্যথা মনেই থাকিল। আমি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম। তোমরা দুটি ভাই চাঁদমুখে একবার মা বলিয়া ডাক, শুনিয়া জন্মের মত বিদায় হই। এই কয়েকটী কথা কহিবা মাত্র, অন্তর্বাষ্পভরে

কণ্ঠাবরোধ হইলে, তিনি চিত্রপুত্তলীর ন্যায়, পুত্রদিগের পানে চাহিয়া রহিলেন। বিজয়চন্দ্র মাতার এতাদৃশ বিলাপবাক্যশ্রবণে ও তৎকালঘটিত ভাব নিরীক্ষণে অপার বিষাদ-সাগরে পতিত হইলেন, নয়ন-যুগলের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইল। বসন্তকুমার নিতান্ত শিশু, মা বা কি জন্য কাঁদিতেছেন এবং দাদাই বা কেন কাঁদিতেছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, কেবল তাঁহারা কাঁদিতেছেন, অতএব মা মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

আহা! অপত্যস্নেহের কি আশ্চর্য্য ভাব! মহিষীর ত আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা নাই, ক্রমে মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল; তথাপি প্রাণাধিক পুত্রদ্বয়ের ব্যাকুলাবস্থা, উপস্থিত কষ্ট অপেক্ষা সমধিক বোধ হইল। তিনি রোদন-বদনে কহিলেন, বাছা বসন্ত! এস আমার কোলে এস, আর কাঁদিও না, তোমার ভয় কি? অনন্তর বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, বাছা! তুমিও কি পাগল হইলে! কোথায় বসন্তকে সান্ত্বনা করিবে,না আপনিই অধৈর্য্য হইলে! ছি! ছি! ক্ষান্ত হও,বসন্তকে কোলে লইয়া অভাগিনীকে চরিতার্থ কর। এই বলিয়া বসন্তকুমারকে বিজয়চন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, আমার জীবনের জীবন অঞ্চলের ধন তোমাকে দিলাম। তোমার ছোট ভাই বটে, তথাপি মায়ের মাথায় হাত দিয়া শপথ করিয়া বল, ইহাকে কখন কিছু বলিবে না, সর্ব্বদা নিকটে রাখিবে। বিজয়চন্দ্র অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, মা! বসন্তকে কাহার নিকটে রাখিয়া যান, এ রোদন করিলে আমি কি বলিয়া বুঝাইব। এইমাত্র কহিয়া উত্তরীয়বসনাঞ্চলে মুখাচ্ছাদন পূর্ব্বক হুহুশব্দে রোদন করিয়া উঠিলেন। রাজা মহিষীর বিলাপে ও পুত্রদ্বয়ের ক্রন্দনে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

শান্তা অকস্মাৎ দূর হইতে ক্রন্দনের ধ্বনি শুনিয়া দৌড়াদৌড়ি আসিয়া কহিল, আ! তোমরা কি সকলেই ক্ষিপ্ত হইয়াছ। মা ঠাকুরাণী একে ব্যাধির জ্বালায় অস্থির, তাহাতে আবার তোমরা কান্নাকাটি করিয়া আরও ব্যাকুলিতা করিতেছ; ইহারা ত ছেলে মানুষ, কাঁদিতেই পারে; মহারাজ ইহাদিগকে সান্ত্বনা করিবেন,—না আপনিও ছেলের মত হইয়াছেন। এইরূপ কহিতে কহিতে ষাট্ ষাট্ বলিয়া বসন্ত-কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া কহিল, বাছা রে! চুপ কর, আর কাঁদিও না, তোমার মা এখনি ভাল হইবেন। পরে বিজয়চন্দ্রের হস্ত ধরিয়া কহিল,বাছা বিজয়! তুমি ত অবোধ নও,তোমাকে আর কি বুঝাইব,এখন তোমার কাঁদিবার সময় নয়,দেখিতেছ না তোমার মা কেমন সঙ্কটে পড়িয়াছেন, কাঁদিলে আর কি হইবে বল, এক্ষণে পুত্রের যে কর্ত্তব্য তাহাই কর। শান্তা এইরূপে একে একে সকলকেই সান্ত্বনা করিল।

রাণী শান্তা আসিয়াছে জানিতে পারিয়া, নিকটে বসিতে কহিলেন। শান্তা নিকটে বসিলে, কাতরস্বরে কহিলেন, শান্তে। আমি সংসারের তাবৎ ভার হইতে অবসৃত হইলাম। তোমাকে যদি কখন কিছু বলিয়া থাকি, সে অপরাধ ক্ষমা করিয়া, জন্মের মত বিদায় দাও। অধিক আর কি বলিব, আমার বিজয়-বসন্ত আজি হইতে তোমার হইল। এই সংসারে আমার বলিয়া, উহাদিগের মুখপানে চায় এমন কেহই নাই, তুমি মা হইয়া পালন কর। এইরূপ কহিতে কহিতে রাজার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়ায় কহিলেন, মহারাজ! এ অভাগিনী আপনার দাসী হইয়া অনেক সুখসম্ভোগ করিয়াছে, সে জন্য কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই; এক্ষণে আমার আসন্ন কাল উপস্থিত, যদি যখন কোন অপরাধ করিয়া থাকি, দাসীকে অভয়দানে মার্জ্জনা করুন। আপনি ভূপতি, মনে করিলে আমা হইতে শত গুণে গুণবতী পাইতে পারিবেন; কেবল আমার বিজয়-বসন্তই মাতৃহীন হইল, তাহারা আর মা পাইবে না; আপনি পাছে তাহাদিগকে বিস্মৃত হন, আমার এই আশঙ্কা হইতেছে। দেখা সাক্ষাৎ যা হইবার জন্মের মত হইল। এই বলিয়া রাণী নিস্তব্ধ হইলে, রাজা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাজ্ঞীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে প্রাণ-বায়ু বায়ুর সহিত মিলিত হইল; কেবল মায়াময়ী ছবিমাত্র ধূলায় ধূসরিত হইতে লাগিল। পুরবাসিনীগণ, কেহ বা হা মাতঃ! কেহ বা হা রাজলক্ষি! কেহ কেহ প্রিয়সখি! সম্বোধনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। কেহ বা তাঁহার মৃত-শরীরোপরি অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিয়া অঙ্গের ধূলা ধৌত করিতে লাগিল। এইরূপে সকলের শোকানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার মা, মা শব্দ করিয়া তাহাতে রোদনাহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

প্রজেশ্বর প্রণয়িনীর বিয়োগে ব্যাকুল হইয়া দশ দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন। তখন তিনি, সুখের অবস্থায় কি দুঃখের দশায়, লোকালয়ে কি বিজন বনে, নিদ্রাবস্থায় কি জাগ্রত অবস্থায়, শূন্যপথে কি ধরাতলে আছেন, কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। কখন কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! কোথায় যাও, আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না; যদি নিতান্তই যাবে, তবে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর আমিও তোমার অনুগমন করিতেছি। কখন, হা সতি! তুমি কি নিষ্ঠুর, আমাকে প্রণয়পাশে বদ্ধ করিয়া এখন কোথায় যাইতেছ? আমি তোমা বই জানি না, চিরকাল একত্র ছিলাম, যাইবার সময় অপরিচিতভ্রমে কিছুই বলিলে না, আমি কি অপরাধ করিয়াছি? আর, যদি অপরাধী হইয়া থাকি, তাহাহইলে প্রেমাধীনকে

এরূপ দুঃসহ যাতনা দেওয়া উচিত নয়। ভাল, আমাকেই যেন বিশেষ অপরাধী জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলে, বল দেখি, তোর পুত্রেরা কি অপরাধ করিয়াছে? তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেন যাইতেছ? তুমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছ, তথাপি তাহারা দীননয়নে তোমাপানেই চাহিয়া আছে। নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক একবারও দেখিলে না?

মহারাজ করুণস্বরে এবংবিধ নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজার অমাত্যবর্গ মহিষীর শব লইয়া যথাবিধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন। ভূপতি প্রণয়িনীর বিয়োগে শোকাগারে শয়ন করিলেন এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত যতই তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইতে লাগিল, ততই ব্যাকুলিত হইয়া শোক-সাগরে নিমগ্ন হইতে লাগিলেন।

প্রধান মন্ত্রী নরনাথকে শোকসাগরে শয়ান নিরীক্ষণ করিয়া, প্রাঞ্জলি-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—মহারাজ! সাংসারিক অসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কেন শোক-সন্তাপ বিস্তার করিতেছেন? এই যে সংসার, কেবলই সং-সার। যেমন নাট্য-শালায় সূত্রধার শৈলুষগণকে নানাপ্রকার কৌতুকাবহ বেশ-ভূষণ ধারণ করাইয়া, পার্শ্ববর্ত্তী দর্শকদিগের চিত্তবিনোদনার্থ নাটকের ভাবানুসারে অভিনয়ারম্ভ করে, অভিনয়কারীদিগের কেহ অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের একাধীশ্বর হইয়া মণিময় সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়, কেহ জনশূন্য-উপদ্বীপবাসীর ন্যায় সন্তাপ প্রকাশ করে, কেহ পুত্র-শোকে কাতর হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতে থাকে, কেহ চিত্ততোষিণী প্রণয়িনীর বিরহ-বেদনায় ব্যাকুল হইয়া উন্মত্তপ্রায় হয়, এবং কেহ বা হৃদয়শোক-বিনোদন সুখ বর্দ্ধন বন্ধুর সম্মিলনে চিত্তানন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে; এইরূপে নিরূপিত সময় অতিবাহিত হইলে যাত্রাভঙ্গ হয়। তখন কোথা রাজা, কোথা প্রজা, কোথা শোক, কোথা হর্ষ, কিছুই থাকে না। বিবেচনা করিলে এই সংসারও তদ্রূপ নাট্যশালা। আপন আপন কর্ম্ম-বেশ ধারণ করিয়া জীবগণ নিরন্তর নাট্য-ক্রীড়া করিতেছে, সুতরাং কার্য্যান্তে প্রস্থান করিবে; এজন্য শোক-হর্ষে প্রয়োজন কি?

হে মনুজেশ্বর! আপনি জ্ঞানী হইয়া কি হেতু বিরহ-বিকারে বিচলিতচিত্ত হইতেছেন, এবং অপ্রয়োজন শোক ও অনর্থক অবসাদ প্রকাশ করিতেছেন? এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনি কার, আপনার কে, আপনা আপনি আপনাকে অপদার্থ বিবেচনায় শোক সাগরে নিপতিত করিতেছেন। ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, যে কালে এই পঞ্চ বিকৃত হইবে, সেই কালে এই প্রপঞ্চময়ী

পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া সকলেই করাল-কাল-কবলে পতিত হইবেন। তন্নিমিত্ত অহরহঃ বিরহদুঃখ প্রকাশ অতি অকর্ত্তব্য।

হে সার্ব্বভৌম! সত্ত্ব, রজঃ, তম, পৃথিবী এই ত্রিগুণাধার; এবং পরিবর্ত্তন তাহার স্বভাব। সুতরাং জরাজীর্ণতা দূরীভূত হইয়া, যাবতীয় জীব জন্তু এবং বৃক্ষলতাদি অভিনব রূপ ধারণ করিতেছে। বাস্তবিক, অনন্তব্রহ্মাণ্ডপতির সুকৌশল-সম্পন্ন পরমাশ্চর্য্য নিখিল ব্রহ্মাণ্ড-বিষয়ে চিন্তা করিলে, একবারে নির্ম্মল আনন্দনীরে নিমগ্ন হইতে হয়. এবং তদ্বিবর্ত্তন অনুধাবনপূর্ব্বক অবলোকন করিলে, বিস্ময়াপন্ন না হন, এরূপ ব্যক্তিই বিরল। মহারাজ! সহসা সকলেরই অন্তঃ-করণে বিবেক বৈরাগ্য উদিত হইয়া থাকে। কিয়ৎক্ষণ স্থিরান্তঃকরণে বিবেচনা করিলে, দেদীপ্যমানবৎ প্রকাশিত হইবে যে, এই মহীমণ্ডল সকলই পরিবর্ত্তন-পরতন্ত্র ও সকলই অনিত্য। হাব ভাব রূপ লাবণ্য বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে। ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য সুখস্বচ্ছন্দতা বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে। মান বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে, এবং প্রেম বিষয়ে পরিবর্ত্তন হইতেছে।

ঊষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া কুসুম-বনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলে, মকরন্দে পরিপূরিত প্রফুল্ল কুসুম-কলিকা সকল দৃষ্ট হয়। মধুব্রতকুলের মধুমিশ্রিত আনন্দ-ধ্বনিতে পরমানন্দরসে চিত্ত অভিষিক্ত হইতে থাকে। সুবাস-কুসুম-বাসিত সুশীতল সমীরণ-সেবনে সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল হইলে, কৃতজ্ঞচিত্তে জগদ্বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিতে হয়। কিন্তু সেই পরমরমণীয় শ্রান্তিহর প্রসূনারণ্যে মধ্যাহ্ন-কালে দৃষ্টিপাত করিলে, প্রচণ্ড তেজোময় প্রভাকরের করে সমগ্র কুসুমের মলিনত্ব, ষট্পদের ভগ্ন-চিত্ততা, মন্দ মন্দ মারুতের উষ্ণত্ব, ব্যতীত আর কিছুই অনুভূত হয় না এবং সেই প্রচণ্ড তেজোময় রবি মধ্যাহ্নকালে যে প্রকার জ্যোতিষ্মান্ দৃষ্ট হন, সায়াহ্নে তাঁহারই বা সে প্রখর ময়ূখমালা কোথায় থাকে, ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া তিরোহিত হয়। শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে শশিকলা প্রত্যক্ষ ও ক্রমশঃ পৌর্ণমাসীতে ষোড়শ কলা পরিপূর্ণ হইয়া, নির্ম্মল জ্যোতিঃ বিকিরণ দ্বারা ধরণীকে কি মরণীয় শোভায় শোভিত করে, এবং সেই সুচারু-চন্দ্রিকাধ্যানে কাহার অন্তঃকরণে ঈশ্বরানন্দ-রসের প্রবাহ প্রবাহিত না হইতে থাকে। অনন্তর অংশ পরম্পরার ধ্বংস হইলে, ঘোর-তিমিরাবৃত অমাবস্যাতে সেই নির্ম্মল দ্যুতির আর কিছুই নিদর্শন থাকে না।

মনুষ্যেরও বাল্যাবস্থার সহিত কৈশোর, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধাবস্থার তুলনা করিলে, বোধ হয়, বিশ্ববিধাতার বিশ্বরাজ্য কেবলই পরিবর্ত্তনশীল। মনুষ্য প্রথমে সংজ্ঞা-

বিহীন পঙ্গু ও পরাধীন থাকেন। পরে ক্রমে প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইলে বোধ হইতে থাকে, এরূপ সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্য্যের মধুর মাধুর্য্য কখনই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় যৌবনাবস্থার সেই সুন্দর রূপ লাবণ্যের সুদৃশ্যতা আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। শ্যামবর্ণ কেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ করে; কপোল-কণ্ঠ-পিশিত লোলিত হয়; শক্তি অভাবে তৃতীয়পদতুল্য-যষ্টিধারণ আবশ্যক হইয়া উঠে। দশনাভাবে রসনা স্পষ্ট বক্তৃতা করিতে সমর্থ হয় না। এবম্প্রকার সজীব ও নির্জীব সকল পদার্থেরই নিরন্তর পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইতেছে। অতএব অনিত্য প্রাণী ও অপ্রাণী পদার্থের বিয়োগে বিচ্ছেদদুঃখাপন্ন হওয়া বিজ্ঞ লোকের উচিত নয়।

যদি বলেন, নিয়মকাল প্রাপ্ত না হইতে কালপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ কি? মহারাজ! এ বিষয় কিয়ৎক্ষণ আলোচনা করিলে, দেদীপ্যমানরূপে প্রকাশিত হইবে যে, পরমকারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে বহুবিধ মনোবৃত্তি প্রদান করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির সহিত বাহ্য বস্তুসমুদায়ের সম্বন্ধ রাখিয়া,সুচারু-কৌশল-প্রদানে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ স্বরূপ এই অভিপ্রায় বিধান করিয়াছেন,—মার্জ্জিত বুদ্ধিসহকারে সমগ্র মনোবৃত্তি সঞ্চালিত করিয়া, সচ্ছন্দাবস্থায় সুন্দররূপে সুখসম্ভোগ করা কর্ত্তব্য। আমরা মনোবৃত্তি সকল পরিচালন করিয়া ভোজ্য ব্যবহার্য্য সমগ্র সামগ্রী প্রস্তুতকরণপূর্ব্বক বিবিধপ্রকার সুখসম্ভোগ করিতেছি; হিমাগম-কালে বিচিত্র পট্টবস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া হিমের হিমত্ব হইতে শরীর রক্ষা করিতেছি, এবং বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিভিন্ন বীজ রোপণ বা বপন করিয়া, কতপ্রকার সুস্বাদ উদ্ভিদ্ প্রাপ্ত হইতেছি। তুঙ্গ-শৈলারূঢ় হইয়া কাষ্ঠাদি কর্ত্তন করিয়া, তরণীগঠনদ্বারা ভূরি ভূরি উর্ম্মিমতী স্রোতস্বতীর পারাবতীর্ণ হইতেছি; এবং বিকটাকার মত্তমাতঙ্গ, তূর্ণগতি তুরঙ্গ, বলিষ্ঠ বৃষভ, শ্রমশীল উষ্ট্র, সহিষ্ণু গর্দ্দভাদি পশুকে যৎসামান্য বোধে বশীভূত করিয়া, স্ব স্ব মনোনীত কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছি। আমরা অসাধারণ বুদ্ধিবলে পরমমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের পরমমঙ্গলপ্রদ ভৌতিক নিয়ম সকল এরূপে অবগত হইতেছি যে, অনল-জলাদির নিকট হইতে মানবজাতির অতীব সাবধানতা আবশ্যক, কারণ ইহার দ্বারা মনুষ্যের জীবন অনায়াসে নষ্ট হইতে পারে। আবার এই বুদ্ধি দ্বারা শারীরিক নিয়ম অবগত হইতেছি।

দূষিত বায়ু সেবন করিলে এবং আহার-বিহারাদি প্রাত্যহিক ক্রিয়ার যথানিয়মের কিঞ্চিৎ বৈপরীত্য ঘটিলেই রোগগ্রস্ত হইতে হয়। সেই রোগ উপযুক্ত ঔষধ দ্বারা শান্ত না হইলে, সুতরাং অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার কারণ হইয়া উঠে। আর, সেই যে ভয়ঙ্কর মৃত্যু—যাহার নাম শুনিলে জীবমাত্রেরই হৃৎকম্প

হইতে থাকে, কিন্তু কিয়ৎক্ষণ আলোচনা করিলে জাজ্বল্যমানবৎ প্রতীত হইবে, যে সেই মৃত্যুকে জগদ্বিধাতা সৃজন করিয়া জগতের প্রতি অমৃত বর্ষণ করিয়াছেন। কারণ, অচিকিৎস্যরোগগ্রস্ত ও জলে পতিত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইলে যে প্রকার অসহ্য যাতনা উপস্থিত হয়, সেইরূপ যাতনা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত থাকিলে, কি কষ্টের বিষয় হইত, তাহা বচনাতীত। অতএব করুণাময় পরমেশ্বর মৃত্যু সৃষ্টি করিয়া এই সকল দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে জীবগণকে পরিত্রাণ করিবার উপায় করিয়াছেন। তন্নিমিত্ত শোকাকুল হওয়া বিজ্ঞ মনুষ্যের কখন উচিত নয়।

মন্ত্রীর প্রবোধবাক্যে রাজার অন্তঃকরণ অনেক সুস্থির হইল। তখন তিনি শান্তাকে ডাকাইয়া কহিলেন, শান্তে! আমার বিজয়-বসন্ত তোমার হইল। তুমি একালপর্য্যন্ত পালন করিয়াছ, এই হেতু ইহারা তোমাকে 'আয়ি' সম্বোধন করিয়া থাকে; এক্ষণে প্রতিপালিত ধন প্রতিপালন কর। আমার বলা বাহুল্য।

শান্তা কহিল, মহারাজ! বিজয়-বসন্তের জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। এক্ষণে এই প্রার্থনা, আপনি সুস্থ হইয়া রাজ-কার্য্য করুন। শোক করিলে আর কি হইবে, বিধাতার নির্ব্বন্ধ কখন খণ্ডন হয় না। এক্ষণে প্রায় সকল ঘরেই এইরূপ হইতেছে।

অনন্তর শান্তা অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারকে লইয়া বহির্বাটীর এক প্রকোষ্ঠে বাস করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

একদা ভূপতি বিচারাসনে আসীন হইয়া ন্যায়ান্যায় বিবেচনা-পূর্ব্বক বাদী ও প্রতিবাদীর অভিযোগের বিচার করিতেছেন, এমন সময় প্রতিহারী আসিয়া অবনতশিরে নিবেদন করিল—মহারাজ! আপনার কুলপুরোহিত ভগবান্ ধৌম্য বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন, আদেশ হইলে আসিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। মহীপাল সম্মান-পূর্ব্বক আনিতে আজ্ঞা করিলেন। পুরোহিত রাজ-সন্নিহিত হইয়া আশীঃপুষ্প প্রদান করিতে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিলেন। রাজা প্রণিপাত-পূর্ব্বক কুসুম গ্রহণ করিয়া, আসন গ্রহণ করিতে কহিলেন। ঋষিবর মণিময়-চতুষ্কোপরি উপবিষ্ট হইলেন। এই কালে সভা-ভঙ্গ-সূচক দুন্দুভিধ্বনি হইল, পাত্র-মিত্র প্রশ্নকর লেখক প্রভৃতি কর্ম্মকর ও কর্ম্মচারিগণ প্রস্থান করিলেন।

ধৌম্য ঋষিবর রাজার অবকাশ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া কহিলেন, মহারাজ! লক্ষ্মীস্বরূপিণী রাজ্ঞীর পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায়, আমি জীবন্মৃতবৎ হইয়া আছি। সাধ্য কি, সকলই ঈশ্বরের নিয়মাধীন, চিন্তা করিলে আর কি হইবে, উপায়ান্তর নাই। সর্ব্বদা শোকে মগ্ন থাকিলে নৃপতিরা সুচারুরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারেন না, সুতরাং রাজ্য-মধ্যে অবিচার হইয়া উঠে। অনর্থক চিন্তা, শরীরের লাবণ্য ও মনের সুস্থতা বিনাশ করিয়া মনুষ্যকে ক্ষিপ্তপ্রায় করে; অতএব এরূপ চিন্তা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু মনুষ্য বিষয়-কর্ম্মাদি হইতে অপসৃত হইয়া একাকী থাকিলে চিন্তা স্বভাবতই সহচরী হয়। এরূপ অবস্থায় কেবল প্রিয়তমা সহ-ধর্ম্মিণীই মধুর বাক্যালাপে চিত্ততোষণ করিয়া চিন্তা দূর করিতে সমর্থ। সহধর্ম্মিণীর সহিত সতত বাস করিলে, পুরুষ কখনই ব্যভিচার আশ্রয় করে না। অতএব এক্ষণে এই অনুরোধ, পুনর্ব্বার পাণিগ্রহণ করুন। রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনার বাক্য শিরোধার্য্য; কিন্তু অনেক কাল গত হইয়াছে, বৃদ্ধকালে এমত অনুমতি করিবেন না; পুত্র প্রয়োজনে ভার্য্যা; ঈশ্বরেচ্ছায় আমার দুইটী পুত্র জন্মিয়াছে, এক্ষণে আর পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হওয়া শ্রেয়ঃ নহে।

পুরোহিত কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা কহিতেছেন যথার্থ, কিন্তু গৃহাশ্রমীর এ নিয়ম অবলম্বন করা উচিত নয়, কারণ, সংসারাশ্রমে নারী শ্রেষ্ঠতরা, শ্রীহীন গৃহ শ্মশানতুল্য। স্ত্রীরা গৃহের শ্রীস্বরূপা বিবেচনা করিলে, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই। পুরুষ নিজ পুণ্যবলে যদি সাধ্বী স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে, পরিণামে বিপন্ন হন না। অগ্রে পতির মৃত্যু হইলে, সতী তাঁহার অনুগামিনী হইয়া অক্ষয় প্রদান করেন। পতি অতিঘোর কলুষে কলুষিত হইলে, সতী স্বকৃতপুণ্যার্দ্ধপ্রদানে পতিত পতিকে পাপপঙ্ক হইতে পরিত্রাণ করেন। বিশেষতঃ মৃতদার ব্যক্তির সাংসারিক কোন ক্রিয়াকলাপে অধিকার নাই।

হে সার্ব্বভৌম! সতীর গুণে কত শত মহাপরাক্রমশালী মহাত্মারাও আত্ম-রক্ষা করিয়াছেন। মহাবীর্য্য সত্যবান্ নরেন্দ্র বিজন বনে প্রাণত্যাগ করিয়াও কেবল পতি-প্রাণা সতী-সাবিত্রীর গুণেই পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন। ভগবান্ রামচন্দ্র সীতা সতীর অসামান্য শক্তিসাহায্যে দুর্জ্জয় দশস্কন্ধ রাবণকে পরাজয় করেন। মহাধনুর্দ্ধর পার্থ কেবল বলভদ্রের অনুজা সুভদ্রার শকটপরিচালন-কৌশলে সমুদ্র সদৃশ যাদব-সৈন্য-দলে জয়ী হইয়াছিলেন। পুরুষ মহারোগাক্রান্ত

হইলে, বন্ধু প্রতারণা-পূর্ব্বক দূরে পলায়ন করেন, পুত্র নিকটে আসিতে বিরক্ত হন, কন্যা দূরে থাকিয়াই ক্রন্দন করিতে থাকেন, কিন্তু পতি-প্রাণা সতী প্রাণকে পরিত্যাগ করেন, তথাপি পতিকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি পতির জীর্ণ দেহ ক্রোড়ে করিয়া শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করেন। অতএব স্ত্রী সম্পদের শ্রী, বিপদের আশ্রয় এবং আর্ত্তজনের জননীস্বরূপা। মহারাজ! এমন স্ত্রী গ্রহণে আপনি কখন অসম্মত হইবেন না।

পুরোহিতের এতাদৃশ-বাক্য-শ্রবণে রাজা দার পরিগ্রহে সম্মত হইলেন এবং ধৌম্যও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শান্তা তাঁহার পরিণয়সূচক কথার আন্দোলন জানিতে পারিয়া একদা বিজন নিকেতনে বিষন্নবদনে কহিল, মহারাজ! অশীতি বর্ষে কি আবার আপনার বিবাহ দেখিতে হইবে? এখন কি আপনার আর ইহা সাজে? ঈশ্বরেচ্ছায় বিজয়চন্দ্র বিবাহের যোগ্য হইয়াছেন, আপনি তাঁহার বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্তে অবশেষ কাল যাপন করিতে পারেন। আপনার পক্ষে এখন ত ইহা ভাল দেখায় না। লোকে শুনিলেই বা কি কহিবে। ছি ছি! আপনি কখন এমন কর্ম্ম করিবেন না। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, মৃতদার হইলেই কি বিবাহ করিতে হয়? কালাকাল কি কিছুই বিবেচনা করিতে হয় না? আপনি সর্ব্ব-শাস্ত্রদর্শী, আপনাকে আর অধিক কি বলিব। যাহা করিলে ভাল হয়, তাহাই করুন। শান্তা এইরূপ কহিলে, রাজা মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। কিছু দিন পরে পুরোহিত রাজসন্নিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে কেবল আপনার আগমনাপেক্ষা, আর সকল উদ্যোগ হইয়াছে, শুভ কর্ম্মে আর বিলম্ব কি? সেই স্থলে গমন করিতেও অন্ততঃ দুই দিবস হইবে, রথ প্রস্তুত, আরোহণ করুন। রাজা পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, অগত্যা পরিণয়সূচক পরিচ্ছদ পরিধান-পূর্ব্বক শকটারোহণে গমন করিলেন।

কন্যাকর্ত্তার নিকেতনে নিরূপিত দিনে উপনীত হইলে, সকলে স্ব স্ব যোগ্যাসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা দেশ-ব্যবহারের বাধ্য হইয়া স্ত্রী-আচার জন্য অন্তঃপুরে গমন করিলেন। মহিলাগণ মহীপালকে দর্শন করিয়া কৌতুকচ্ছলে কহিতে লাগিলেন, আঃ। ঈশ্বরের কি বিড়ম্বনা, আমাদের দুর্জ্জময়ী কোমলাঙ্গী, নবীনা, যুবতী, এ দিকে ত বরের বয়স শেষ। অজের গলায় কি গজমুক্তা সাজিবে? এক দুর্মুখ রমণী অমনি কহিয়া উঠিল, বিমলে! তুমি মিছে কেন রাজাকে ব্যঙ্গ করিতেছ, রাজার দোষ কি? অর্থলোভে ধর্ম্ম ব্যর্থ হইল। দুর্জ্জময়ীর পিতা দুর্জ্জয় ও তাহার মাতা দুর্নামী গোপনে কিছু অর্থ পাইয়াছেন, নহিলে কেন বৃদ্ধ

পাত্রে সাধের কন্যা সম্প্রদান করিবেন? অতি সুশীলা, জ্ঞানবতী এক যুবতী কহিল, হেমলতে! তুমি কেন দুর্জ্জয়ের দুর্নাম রটাইতেছ, লোভে শাস্ত্রলোপ হইল। ধৌম্য মুনি লোভে পড়িয়া শাস্ত্রলোপের কারণ হইয়াছেন। আমি পতির মুখে শুনিয়াছি, ভগবান্ মনু কহিয়াছেন—উন্মত্ত, বধির, খঞ্জ, অন্ধ, বাল, বৃদ্ধ প্রভৃতির বিবাহ করা অকর্ত্তব্য; রাজারা এ নিয়মের পালন করিয়া থাকেন; কিন্তু ঔষধ রোগনিবারণ করিবে কি, নিজেই রোগগ্রস্ত হইয়াছে। ললনাগণ কৌতুকচ্ছলে ভূপতিকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া গমন করিল। রাজা অতিশয় লজ্জিত হইয়া, "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন" এই প্রবোধে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। পরে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাজ্যশাসনে ও প্রজা-পালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

বাছা সকল! শেষ সংসারের কি অলঙ্ঘনীয় বশীকরণশক্তি! অতিমাত্র সদ্বিদ্বান্ ও জ্ঞানশীল ব্যক্তিও, যেমন রসে মীন, স্বরে হরিণ, গন্ধে ভৃঙ্গ, রূপে পতঙ্গ হতজ্ঞান হয়, তদ্রূপ নবপ্রণয়িনীর প্রেম-পাশে বদ্ধ হন। রাজা জয়সেনও তরুণ তরুণীর লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া পুত্রদ্বয়ের প্রতি ক্রমশঃ ভগ্ন-স্নেহ হইতে লাগিলেন।

বিজয়চন্দ্র, জনকের স্বভাব একপ বিপরীত ভাবাবলম্বন করিয়াছে, জানিতে পারিয়া, অতিশয় ক্ষোভযুক্ত হইলেন, কিন্তু তজ্জন্য বাক্যস্ফোটও করিলেন না। একদিন তিনি সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সহোদর-সমভিব্যাহারে প্রাসাদোপরি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, রাজমহিষী অন্তঃপুর হইতে নিরীক্ষণ করিয়া শান্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শান্তে! বিজয়-বসন্তের অন্তঃপুরে না আসিবার কারণ কি? আমি যে অবধি এখানে আসিয়াছি, তাহারা সেই অবধি বহির্বাটীতেই থাকে, একদিনের জন্যেও অন্তঃপুরে আইসে না। আমার ইচ্ছা, অন্তঃপুরে আনিয়া লালন পালন করি! শান্তা কহিল, ঠাকুরাণি! আপনি আপন পুত্র পালন করিবেন, কাহার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন? আমি যাই, বিজয়-বসন্তকে অন্তঃপুরে আসিতে কহি গিয়ে। এই বলিয়া শান্তা গমন করিল।

মহিষী পিত্রালয় হইতে দুর্লতানাম্নী এক পরিচারিকাকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুর্লতা অন্তরালে থাকিয়া, মহিষী আর শান্তাদাসীতে যে কথা বার্ত্তা হইতে-ছিল, সমুদায় শুনিতে পাইয়া, নির্জ্জনে রাণীকে কহিল, ওলো দুর্জ্জয়ি! শান্তার সঙ্গে গলাগলি হইয়া কি কথা কহিতেছিলে? মনে বুঝি করেছ সতিনীপুত্র পালন করিবে? রাণী কহিলেন, দুর্লতে! তোমার এমন দুর্ম্মতি দেখিতেছি কেন?

এমন কথা কহিও না, আমি মনে ব্যথা পাই। বিজয়-বসন্তের মা নাই, আমি তাদের মা হই।

দুর্লতা মুখ বাঁকাইয়া কি কথায় রাণীর মন ফিরাইবে, এই চিন্তাই করিতে লাগিল। এবং কিয়ৎক্ষণ মৌনবতী থাকিয়া কহিল, ওলো দুর্জ্জময়ি! একটী বিচার করিয়া দেখ, বিজয়চন্দ্র রাজা হইলে তোমার কি দশা হইবে। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় তোমার দুই একটি পুত্র হয়, তাহারা বিজয়-বসন্তের ক্রীত দাস হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ সাপিনীর সন্তানকে দুগ্ধ দিয়া পালন করিলে কালে আপন ধর্ম্মই প্রকাশ করে। কণ্টকবৃক্ষ উদ্যানে রোপণ করিলে সকল উদ্যান কণ্টকময় হয়। যেমন এক গাছের বাকল অন্য গাছে লাগে না, সেইমত সতিনীর পুত্রও কখন আপন হয় না।

বৎস সকল! দুঃশীলা রমণীগণের কথার ছন্দোবন্ধ বিবেচনা করা যোগী জনেরও দুঃসাধ্য। একে স্ত্রীজাতি, তাহাতে অল্পবয়স্কা, সুতরাং মহিষী দুর্লতার দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া কহিলেন; দুর্লতে! আমি এ ক্ষণে বুঝিলাম বিজয়-বসন্ত আমার পুত্র নহে, শত্রু। যাহাতে শীঘ্র বিনাশ পায়, তাহার উপায় কর। দুর্লতা হাস্য করিয়া কহিল, হাঁ বাছা! এখন পথে এস! বুঝেছ ত, তাহারা তোমার শত্রু কি না? আমি কাহারও মন্দ করি না, সকলেরই হিত করিতেই আমার চিরকালটা গেল। আর ব্যস্ত হইতে হইবে না, আমার কথা শুন, সত্বরেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে। শান্তা বিজয়-বসন্তকে অন্তঃপুরে আনিতে গিয়াছে, তাহারা আসিয়া যখন প্রণাম করিবে, তুমি সম্ভাষণ করিও না, কাজেই অন্তরের শত্রু অন্তর হইবে। পরে অঙ্গাভরণ পরিত্যাগ করিয়া ধূলায় শয়ন করিবে। রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলে রোদন-বদনে কহিবে, কুপুত্র বিজয়-বসন্ত অন্তঃপুরে আসিয়া আমাকে যে প্রকার প্রহার করিয়াছে, তাহাতে ক্ষণকালের জন্য বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। তাহা হইলেই ইষ্ট দেবতা ইষ্টসিদ্ধির পথ করিয়া দিবেন। দুর্লতা এইরূপ কহিয়া প্রস্থান করিল।

মহিষী দুর্লতার দুষ্প্রবৃত্তির বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময় বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার শান্তার সঙ্গে আসিয়া প্রণাম করিলেন। রাণী কিছুই কহিলেন না, বরং যে পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহার নিকটে থাকিলেন, কেবল দ্বেষ-ভাবেরই চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শান্তা, রাণীর স্বভাব বিপরীত ভাব অবলম্বন করিয়াছে, বুঝিতে পারিয়া দুটী সহোদরকে সঙ্গে লইয়া প্রতিগমন করিল। তাহারা গমন করিলে, রাজ্ঞী পরিধেয় নীল বসন খণ্ড খণ্ড করিয়া অঙ্গাভরণ পরি-

ত্যাগ করিলেন, এবং স্ব-করাঘাতে নিজ অঙ্গে প্রহার-চিহ্ন করিয়া ঈষদ্বক্রভাবে অবস্থানপূর্ব্বক বাম করতলে কপোল সংলগ্ন ও গৃহভিত্তি অবলম্বন করিয়া অর্দ্ধ-শয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। মুক্ত কবরী ও স্খলিত বেণী জলদজালের ন্যায়, তাঁহার মুখচন্দ্রকে আংশিক আবৃত করিল। মহিষীর অনলঙ্কৃত অঙ্গ পতি-বিয়োগ-বিধুরা রতির তনুতুল্য হইল। পরিচারিকাগণ কারণ জিজ্ঞাসিলে, তিনি কাহারও কথার উত্তর দিলেন না।

রাজা অন্তঃপুরে আসিয়া, মহিষীকে ঐরূপ নিরাসনে নিরীক্ষণ করিয়া, কিঞ্চিৎ-ক্ষণ চিত্রার্পিতপ্রায় দণ্ডায়মান থাকিলেন। পুরুষ বৃদ্ধকালে সহজে নারীর বশীভূত হয়। রাজা তদপেক্ষাও স্ত্রৈণ, সুতরাং ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, প্রিয়ে! কি নিমিত্ত চন্দ্রমা বামে হেলিত হইয়া কলদলাশ্রয় করিয়াছে? মেঘমালা ধরা চুম্বন করিতেছে? মন্দাকিনী সুমেরু-শিখর লঙ্ঘন করিয়া বেগবতী হইয়াছে। নীলাম্বরী জীর্ণরূপ ধারণ করিয়াছে? ভূষণ সকল তোমার অঙ্গ-বিরহে ধূলায় পড়িয়া রোদন করিতেছে? রাণী কিছুই উত্তর দিলেন না, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজা হস্ত ধরিয়া পল্যঙ্কে বসাইলেন এবং পরিধেয় বসনাঞ্চলে গাত্রের ধূলা ও চক্ষের জল মোচন করিতে যত্ন করিলেন। একে স্ত্রীজাতি, তাহাতে স্বামীর সোহাগ, যেন উত্তপ্ত স্বর্ণে সোহাগা পতিত হইল। রাজা পুনর্ব্বার কহিলেন, প্রিয়ে! অকস্মাৎ কেন এমন হইলে? তোমার কোন প্রিয়-তমের কি কোন অমঙ্গল হইয়াছে, অথবা কোন ব্যক্তি নিরঙ্কুশ মাতঙ্গে আরোহণ ও সর্পবিবরে হস্তার্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে? প্রকাশ করিয়া বল, তাহার প্রতিফল উত্তমরূপে দিতেছি। সত্য করিতেছি, পুত্র হইলেও ক্ষমাযোগ্য হইবে না।

মহিষী রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া কপট-রোদন-বদনে কহিলেন, মহারাজ! আপনার দুটী কুপুত্র বিজয়-বসন্ত অকস্মাৎ অন্তঃপুরে আসিয়া আমাকে অনেক অযোগ্য কথা কহিল। পরে যে প্রকার প্রহার করিল, তাহা আর কি বলিব, প্রত্যক্ষই দেখিতেছেন। তিলার্দ্ধকাল আর বাঁচিতে ইচ্ছা নাই। মনে হইতেছে অনলে প্রবেশিয়া সকল দুঃখ নির্ব্বাণ করি, আপনি পুত্র লইয়া সুখে রাজ্য করুন। আমি ত প্রিয়জন নহি, আমাকে আর কি প্রয়োজন? রাজা মহিষীর কপট বাক্যে সুরা-সেবকের ন্যায় একেবারে হতবুদ্ধি হইলেন এবং নগর-পালকে ডাকা-ইয়া কহিলেন, নগরপাল! বিজয়-বসন্ত দুই দুর্ব্বৃত্তকে অদ্য রজনীতে কারাবদ্ধ করিয়া রাখ, প্রভাতে উপযুক্ত দণ্ড বিধান করা যাইবে। নগরপাল অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজাজ্ঞা-পালনে তৎপর হইল।

বৎসগণ! রাজা কোপাবিষ্ট হইয়া পুত্রদিগকে বন্ধন করিতে আদেশ করিলেন। এক শান্তা ভিন্ন তাহাদিগের মুখপানে চায়, এমন দ্বিতীয় জন ছিল না। সে কার্য্যান্তরে গিয়া রাজা ও মহিষীর কথোপকথন-শ্রবণার্থ অন্তরালে দণ্ডায়মান ছিল। যখন রাজার মুখ হইতে "বিজয় বসন্ত দুই দুর্বৃত্তকে কারাবদ্ধ কর" এই নিদারুণ বাক্য নির্গত হইল, তখন শান্তা হা ঈশ্বর! বলিয়া ভূতলে মূর্চ্ছা গেল। পরে চৈতন্য পাইয়া কহিতে লাগিল, হা নিদারুণ বিধাতঃ। এত দিনে কি এই করিলে? হা ধর্ম্ম! তুমি কোথায়? সময়ে কি তুমিও অন্ধ হইলে? অরে নির্দ্দয় পক্ষপাত! তুই ত সামান্য নহিস্, এমন গম্ভীরাকৃতিকেও গুণশূন্য করিলি? আহা কি পরিতাপ! সাগর লঙ্ঘন করিয়া আসিলাম, তটে প্রাণ যায়! বিধাতার কি দোষ, আমি অতি অভাগিনী, চিরকাল পরের জ্বালায় জ্বলিতেছি। পরের ছেলে মানুষ করিলে আপনার প্রাণ হইতে অধিক হয়, লোকে তাহা বুঝে না। হা বিধে! বড় আশা করিয়া দুটা ভাইকে একাল পর্য্যন্ত পালিতেছিলাম, আমার সে আশা একেবারে নির্ম্মূল হইল!

শান্তা এইরূপ বিলাপ-বদনে বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারের নিকটে গেল। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, আয়ি! তুই কাঁদিস্ কেন? তোর কি হইয়াছে? কে তোরে আজি এমন ক'রে কাঁদাইল? শান্তা কহিল, বাছা রে! আমার মনের ব্যথা বলিবার নহে; বলিতে বাক্য সরে না। বুক ফাটিয়া যাইতেছে। তোদের বিমাতা সাপিনী অজ্ঞাতসারে তোদিগকে দংশন করিয়াছে, আর উপায় নাই। আমি তোদের পিতাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলাম, তিনি তাহা না শুনিয়া ডাকিনীকে বিবাহ করিলেন। সেই অবধি আমার মনে সর্ব্বক্ষণ যে আশঙ্কা হইত, আজি তাহাই ঘটিয়াছে। কামিনী রাজাকে যে কথা কহিল, তাহা অকথ্য। রাজা বিচার না করিয়া তোদিগকে বাঁধিতে কহিলেন। কালি প্রভাতে প্রাণনাশ করিবেন। হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ! অকস্মাৎ কেনই বা এমন হইল, এ বিষম সঙ্কটে কে তোদের পক্ষ হইবে? এখানে ত সকলেই রাজার তোষামোদ করে। তিনি যাহা বলিবেন, তাহাই বিচার-সঙ্গত হইবে। কাল রজনী প্রভাত হইলে আর দেখিতে পাইব না। চাঁদ-মুখে সুধামাখা কথা আর শুনিব না। তোদিগকে আর কোলে লইতে পারিব না। আয় রে বিজয়! আয় রে আমার নয়নপুত্তলি বসন্ত! আয়, এ জন্মের মত একবার কোলে করি!

শান্তা এইরূপ কহিতে কহিতে দুটী ভাইকে বক্ষঃস্থলে চাপিয়া ধরিল, এবং সকরুণ-স্বরে কহিতে লাগিল, অরে বিজয়! তোদের মা ত ভাগ্যবতী, পুত্র

রাখিয়া অগ্রে গমন করিয়াছেন। কেবল আমাকেই দুঃখের ঘরে চাবি দিয়া পূর্ব্ব-জন্মের সাদ সাধিলেন। হা সতি! তুমি কোথায়? তোমার বিজয়-বসন্ত কালিনীর মায়াজালে বদ্ধ হইয়া বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছে, এ ঘোরাপদের সময় একবারও দেখিলে না? হা মৃত্যু! তুমি কোথায়, এখনও আমাকে লইলে না? আমি বারংবার তোমাকে স্মরণ করিতেছি, তুমিও কি দুঃখিনী বলিয়া আমাকে স্পর্শ করিলে না! পৃথিবি! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তবু তুমি বিদীর্ণ হইলে না। একবার কৃপা করিয়া বিদীর্ণ হও, তাহাতে প্রবেশ করি। হে বজ্র! তোমার প্রবল প্রতাপে কত কত পর্ব্বতের চূড়া চূর্ণ হইতেছে, আমার বক্ষে পতিত হইয়া কিছুই করিতে পারিলে না? সময়ে কি তোমার প্রতাপ খর্ব্ব হইল? অরে নিষ্ঠুর প্রাণ! লৌহ হইতেও কি তুই কঠিন, এখনও বাহির হইলি না? আর কি সুখে দেহে রহিয়াছিস্? হায় কি হ'ল রে! ইহা ত আমি স্বপ্নেও জানি না যে, আমার বিজয়-বসন্তের এমন বিপদ্ হইবে! হা কালিনি! তোর মুখে মধু অন্তরে গরল, ইহা ত আগে জানিতে পারি নাই। হা দুর্বৃত্তে! রাজবংশধ্বংসকারিণি! ধর্ম্মপথে একেবারে জলাঞ্জলি দিলি। শান্তা এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ-বাক্যে রোদন করিতেছে, এমন সময় নগরপাল যমদূতের ন্যায় ভয়ঙ্কর বেশ ধরিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জনে দ্বারে দণ্ডায়মান হইল।

নগরপালের শরীর যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ, তেমনি স্থূল ও দীর্ঘ। দুই চক্ষু জবাপুষ্পের ন্যায় আরক্ত, গণ্ড অবধি নাসিকাতল পর্য্যন্ত দীর্ঘ শ্মশ্রু। পরিধান রক্তবস্ত্র, পৃষ্ঠদেশে ঢাল, কক্ষস্থলে তরবারি, এবং হস্তে বন্ধনরজ্জু। কথাগুলি অতি কর্কশ, হঠাৎ শুনিলে পিশাচ-শব্দ বোধ হয়। মনুষ্য দূরে থাকুক, তাহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে, সিংহ ব্যাঘ্রও প্রাণভয়ে পলায়ন করে। নগরপালেরা স্বভাবতঃ নির্দ্দয়, তাহাতে আবার রাজার আজ্ঞা, অতএব গভীরস্বরে কদর্য্যবাক্যে ভৎসনা করিতে লাগিল। তাহার তর্জ্জনে বিজয়চন্দ্র প্রবাহস্থিত সুকোমল তরুতুল্য কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার দুটী নয়নে বাষ্পবারি-সঞ্চার হইয়া আসিল, বাক্‌শক্তি রোধ হইল, এবং প্রফুল্ল মুখচন্দ্র রাহুভয়ে এককালে মলিন হইয়া গেল। তিনি দুঃখ কাহাকে বলে তাহার কিছুই জানিতেন না, অকস্মাৎ এই আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া, একেবারে হতজ্ঞান, হইলেন দুরন্ত নগরপালের কথার কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। কেবল চিত্রপুত্তলিপ্রায় দণ্ডায়মান থাকিলেন।

নগরপাল আর বিলম্ব না করিয়া স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল এবং বন্ধন করিতে উদ্যোগ পাইল। তখন বিজয়চন্দ্র কাঁপিতে কাঁপিতে কাহিলেন,

নগরপাল! তুমি কি দোষে আমাদিগকে বন্ধন করিতে আসিয়াছ? আমরা ত কোন অপরাধ করি নাই। পিতা অকারণে ক্রোধ করিয়া যদি কারাবদ্ধ করিতে আদেশ করিয়া থাকেন, তবে চল, যে খানে রাখিবে সেই খানেই থাকিব, বন্ধন করিয়া কেন অধিক ক্লেশ দাও। নিশা প্রভাতে তোমার হস্তে আমাদের নিশ্চয় মরণ, তবে কেন বন্ধন করিয়া অগ্রেই প্রাণনাশ কর। না হয়, এখনি কেন প্রভাত-কালের কর্ম্ম সমাধা কর না। তাহা হইলে বন্ধন-যাতনা আর সহ্য করিতে হইবে না। নির্দ্দয় নগরপাল বিজয়চন্দ্রের বিনয়বাক্যে কর্ণপাতও করিল না, তাঁহার হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া কসিতে লাগিল। বিজয়চন্দ্রের শরীর নবনীত-স্বরূপ সুকোমল। কঠিন বন্ধনের ক্লেশে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, এবং নয়নে অবিশ্রান্ত অশ্রু নির্গত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল।

নগরপাল বিজয়চন্দ্রকে বন্ধন করিয়া বসন্তকুমারকে বন্ধন করিতে উপক্রম করিল। বসন্তকুমার অতি শিশু; নগরপালকে দেখিবামাত্রই ভয়ে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল; তখন তিনি আতঙ্কে বিজয়চন্দ্রকে বেষ্টন করিয়া ধরিলেন এবং কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, দাদা! ও কে? উহাকে দেখিয়া ভয় হইতেছে, আমাকে কোলে কর।

বিজয়চন্দ্র বসন্তকুমারকে ব্যাকুল দেখিয়া শোকার্ত্ত হইয়া বক্রভাবে হৃদয় দ্বারা আবৃত করিলেন। হস্ত-বন্ধন জন্য ক্রোড়ে করিতে পারিলেন না। কেবল নয়ননীরে অনুজের শিরোদেশ সিক্ত করিতে লাগিলেন। নগরপাল অন্ত্যজ জাতি, সহজে নির্দ্দয়, বিজয়চন্দ্রের ক্রোড় হইতে অন্তর-করণেচ্ছায় বসন্তকুমারকে বারংবার আকর্ষণ করিতে লাগিল। বিজয়চন্দ্র নিরুপায় হইয়া বিনয়পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, নগরপাল! তোমার দুটী পায় ধরি, ক্ষান্ত হও, বসন্তকে কিছু বলিও না। এই দেখ, বসন্ত তোমার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আমাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে, বায়ু-চালিত কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতেছে, ইহার চাঁদমুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, নয়নে নিরন্তর বারিধারা বহিতেছে, দেখিয়া দয়া হয় না? তোমার হৃদয় কি এমন কঠিন?

নির্দ্দয় নগরপাল তথাপি নিবৃত্ত হইল না, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণ করিতে লাগিল। বিজয়চন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, নগরপাল! তোমার কঠিন বন্ধনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, বসন্তের অঙ্গ নিতান্ত কোমল, কখন সে বন্ধন-যাতনা সহ্য করিতে পারিবে না, প্রাণে মরিবে। বসন্তকে বন্ধন করিতে যদি নিতান্তই প্রয়াস হইয়া থাকে, তবে তোমার শাণিত তরবারে অগ্রে আমার

প্রাণদণ্ড কর ; পশ্চাৎ যেরূপ অভিরুচি করিও। আমার সাক্ষাতে বসন্তকে কিছু বলিও না, উহার যাতনা আমি কদাচ দেখিতে পারিব না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

নগরপাল বিজয়চন্দ্রের অনুনয়ে কর্ণপাতও করিল না, প্রত্যুত তাঁহার ক্রোড় হইতে বসন্তকুমারকে আকর্ষণপূর্ব্বক বন্ধন করিতে উদ্যত হইল। বসন্তকুমার একে শিশু, সহজেই ভীরু, কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, নগরপাল! আমি কিছুই দোষ করি নাই, আমাকে বেঁধ না, তোমার দুখানি পায় ধরি, ছেড়ে দাও, আমি আয়ির কাছে যাই। নগরপাল নিবৃত্ত না হওয়ায়, বসন্তকুমার বালক-স্বভাব-বশতঃ কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, যাও নগরপাল! তুমি বড় খারাপ, আমার হাতে ব্যথা দিও না, ছেড়ে দাও, যদি না দাও, তবে বাবার কাছে সব কথা বলে দিব, দাদাকে মেরেছ ; আবার বেঁধেছ, তাও বলে দিব, তা হলে তুমি আচ্ছা জব্দ হবে।

নগরপাল বসন্তকুমারের এই সকল করুণ-বাক্য শ্রবণ করিল, কিন্তু তাহার পাষাণ-হৃদয়ে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না; অনায়াসে বসন্তকুমারের সুকুমার করদ্বয় দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল। বসন্তকুমার বিপরীত বন্ধন-যাতনা সহ্য করিতে না পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নগরপাল সে আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া দুই সহোদরের বন্ধনরজ্জু ধারণপূর্ব্বক গৃহের বাহিরে লইয়া যাইতে উপক্রম করিল।

শান্তা রোদন করিতে করিতে নগরপালের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিতে লাগিল, নগরপাল! আমি অতিবৃদ্ধা, চিরকাল তোমাদের মহারাজের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছি, এইজন্য দুটো কথা বলি, আমার কথা রাখ, দুটী ভাইয়ের বন্ধন-দড়ী খুলিয়া দাও। উহাদিগের দুঃখ আর দেখিতে পারি না, আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আমি অতি দুঃখিনী, ইহারা ভিন্ন আর আমার কেহই নাই। তোমার পায় ধরি, আমার দুটী নয়ন পুত্তলিকে আঘাত করিও না। ইহারা রাজার ছেলে, অতি যতনের ধন, সুখ বিনা কখন দুঃখের বেদনা জানে না। তুমি চোরের মত বাঁধিয়াছ, বল দেখি কেমন করিয়া সহ্য করিবে।

নগরপাল শান্তার এইরূপ কাতর-বাক্যে অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া তাহার গলদেশে ধাক্কা মারিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিল এবং দুটী সহোদরকে লইয়া নিবিড়ান্ধকার কারায় রুদ্ধ করিল। আহা! সেই সময়ের ভাব কি হৃদয়বিদীর্ণকর! যেন শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত রাবণপুত্র দুর্জ্জয় মহীরাবণের কারাবাসে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

বসন্তকুমার বন্ধন-যাতনায় কাতর হইয়া বিজয়চন্দ্রকে কহিতে লাগিলেন, দাদা! আমি আর সহিতে পারি না, আমার হাতের দড়ী খুলিয়া দাও; আপনি কোথায় আছেন, আমি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, আমার বড় ভয় হইতেছে, শীঘ্র আমার নিকটে আসুন, আমাকে কোলে করুন। বিজয়চন্দ্র অনুজের এইরূপ বাক্য শুনিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, বসন্ত! আমি কি করিব, আমার হস্ত পদ-শৃঙ্খলে বদ্ধ, আমি উঠিতে পারি না। তুমি পরম করুণাময় পরমেশ্বরকে স্মরণ কর, তিনি তোমাকে রক্ষা করিবেন। বিজয়চন্দ্র এইরূপ কহিতে কহিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিভাবরী অবসান হইল, প্রভাতে বিহঙ্গমদল সুললিতস্বরে জগদ্বিধাতাকে স্মরণ করিতে লাগিল। বোধ হইল যেন বিজয়-বসন্তের দুঃখ মোচনার্থ একান্তমনে পরম পিতাকে ডাকিতেছে।

রাজা প্রাতঃসময়ে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ নগরপালকে কহিলেন, নগরপাল! বিজয় ও বসন্ত দুই দুর্বৃত্তকে শীঘ্র আমার নিকটে লইয়া আইস। আমি রাজা, অন্য দুর্বৃত্ত হইলে যথোচিত দণ্ড করিয়া থাকি; আমার গৃহে এমন নরাধম জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমি ইহার সমুচিত দণ্ড অবশ্য দিব। এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইল। সভ্যগণ ভূপতিকে অত্যন্ত কোপাবিষ্ট ও ক্ষিপ্তপ্রায় দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। নগরপাল হস্তপদবদ্ধ দুটী ভাইকে আনিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল। রাজা পুত্রদ্বয়কে সক্রোধ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বিন্দু-পরিমাণেও দয়ার সঞ্চার হইল না, বরং তিনি সাতিশয় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, ওরে নগরপাল! এই দুই দুর্বৃত্তকে হত্যালয়ে লইয়া শীঘ্র নিপাত কর্; আমার সম্মুখে আর রাখিস্ না; ইহাদিগকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণের অনল আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠি-তেছে। নগরপাল রাজাজ্ঞাপালনে উদ্যত হইল।

বিজয়চন্দ্র সবদ্ধকরপুটে রাজার চরণ ধরিয়া কহিলেন, পিতঃ! আমরা কি উৎকট অপরাধ করিয়াছি? কি অপরাধে আমাদিগকে নগরপালের হস্তে জন্মের মত সমর্পণ করিলেন? এইমাত্র কহিতে কহিতে তাঁহার বাক্য-শক্তি রুদ্ধ হইল, এবং নয়নদ্বয়ে বাষ্পবারি সঞ্চারিত হইয়া অবিশ্রান্ত নির্গত হইতে লাগিল। বিজয়-চন্দ্রের বাক্য সমাপ্ত না হইতে হইতেই রাজা গম্ভীরস্বরে কহিয়া উঠিলেন, ও রে নগরপাল! এ পাপ আমার সম্মুখে কেন রাখিয়াছিস্? বিজয়চন্দ্র রাজার তর্জ্জনে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, পিতঃ! আমিই যেন আপনার চরণে অপরাধী হই-য়াছি আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন; কিন্তু বসন্ত অতিশিশু, সে কোন অপরাধ

করে নাই, তাহার প্রাণদণ্ড করা কখন বিচারসঙ্গত হইতে পারে না। একবার সদয়নয়নে দেখুন, বসন্ত ভয়ে ভীত হইয়া গাভীহারা বৎসের ন্যায় চতুর্দ্দিকে কেমন করিয়া চাহিতেছে; নগরপালের কঠিন বন্ধনে উহার দুটী হস্তের চর্ম্ম ভেদ হইয়া রক্তধারা নির্গত হইতেছে, যাতনায় চাঁদমুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, দুটী চক্ষে সঘনে ধারা বহিতেছে। পিতা হইয়া সন্তানের দুঃখ কেমন করিয়া দেখিতেছেন! আপনার কিঞ্চিৎ দয়াও হয় না? সেইরূপ সদয় হৃদয় কি এক্ষণে পাষাণে বাঁধিয়াছেন? নতুবা পিতা হইয়া কিরূপে নিরপরাধ সন্তানের প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইতেছেন?

বিজয়চন্দ্র এইরূপ সকরুণবাক্যে রোদন করিতেছেন; বসন্তকুমার সহসা রাজার সন্নিহিত হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, বাবা! ঐ নগরপাল আমাকে বেঁধেছে, দেখ বাবা! আমার হাত দিয়া কেমন করে রক্ত পড়িতেছে। উহারা কেহই খুলে দিল না। আপনি শীঘ্র খুলে দিন। নগরপাল আমাপানে বারে বারেই কেমন করে চাচ্চে, ও বুঝি আমাকে আবার বাঁধিবে, আপনি শীঘ্র কোলে করুন, তা হলে ও আর বাঁধিতে পারিবে না। এইরূপ কহিয়া রাজার কোলে উঠিতে চাহিলে, রাজা হস্ত ধরিয়া ভূমে নিক্ষেপ করিলেন। বসন্তকুমার পিতার নিকটে অনাদৃত হইয়া ছল-ছল-চক্ষে সভ্যগণের প্রতি ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সভ্যগণ অতিশয় দুঃখিত হইয়া রাজার ভয়ে অশ্রুজল অম্বরে সংবরণ করিতে লাগিলেন, এবং রুদ্ধ-বাক্য-প্রায় হইয়া পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন।

প্রধান অমাত্য বসন্তকুমারের কাতর বাক্যে স্নেহার্দ্র হইয়া রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! বিজয় বসন্ত যদিও আপনার নিকটে অপরাধী হইয়াছেন, তথাপি পুত্র-হত্যা করা কখন উচিত হয় না। পুত্রহত্যা মহাপাতক, পারত্রিকে ঈশ্বর-সমীপে কখন ক্ষমাযোগ্য হইবেন না, এবং ঐহিকেও অনুতাপজনিত অসহ্য যাতনা পাইবেন ও লোকালয়ে অশেষরূপে অপবাদিত হইবেন।

রাজা কহিলেন, অমাত্য! উহারা মাতৃহত্যাকারী মহাপাতকী, আমি উহাদিগের মুখ আর দেখিব না এবং উহাদিগকে আমার রাজ্যেও বাস করিতে দিব না। অদ্য হইতে উহারা আমার ত্যাজ্য পুত্র হইল। এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিরুচি তাহাই কর। রাজা এই বলিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

অমাত্য রাজার আশ্বাস পাইয়া, দুইটী সহোদরের বন্ধনরজ্জু স্বহস্তে খুলিয়া দিলেন, এবং মন্দুরা হইতে দুইটী অশ্ব আনিয়া বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, যুবরাজ!

সহোদরের সহিত ঘোটকারোহণে রাজ্যান্তরে প্রস্থান করুন। নতুবা রাজা যেরূপ বিপরীত স্বভাব আশ্রয় করিয়াছেন, কখন কি করেন বলা যায় না। মন্ত্রীর বাক্যানুসারে দুই সহোদর অশ্বারোহণে গমনোন্মুখ হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার রাজার নিকট চির-বিদায় হইয়া দেশান্তরে গমন করিতেছেন, শান্তা এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া দৌড়াদৌড়ি রাজপথে আসিল এবং পথ আগুলিয়া সজলনেত্রে কহিতে লাগিল, আহা! আমি মনে মনে কত আশা করিয়াছিলাম, বিজয়চন্দ্রকে বিবাহ দিয়া বধূবসহিত একত্র লালনপালন করিব। বিজয় রাজা হইবে, দেখিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিব। হায় হায়! আমার সে আশা একবারে নির্ম্মূল হইল! কোথায় রাম রাজা হইবেন, না বনবাসে গমন করিলেন! উঃ! কি নিদারুণ কথা! এতাবৎ কহিতে কহিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতল-শায়িনী হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য পাইয়া কহিল, বসন্ত! বাছা তুমি কেমন করিয়া বিদেশে যাইবে? সূর্য্যোদয় না হইতেই ক্ষুধায় কাতর হও, আমার বক্ষঃস্থল না হইলে নিদ্রা যাইতে পার না, তিলার্দ্ধকাল আমাকে না দেখিলে তোমার বিধুবদন নয়নজলে ভাসিতে থাকে। হা পরমেশ্বর! ঘুমাইলে যাহাকে চিয়ান যায় না, আদর্শে আপনার মুখ দেখিয়া যে আপনি ধরিতে চায়, আপনার বস্ত্র-ফাঁদে যে আপনি বন্দী হয়, আপনার উচ্ছিষ্ট যে গুরুজনের মুখে দেয়, আপন পর যাহার কিছুই বিবেচনা নাই, অরণ্যে এই অবোধ শিশু পশুসমাজে কিরূপে রক্ষা পাইবে। হে বিধাতঃ! তুমি শিশুরক্ষক; পশুপতি, মহাদেব! তুমিই পিতা, তুমিই মাতা, এ বিষম সঙ্কটে আমার বিজয়-বসন্তকে রক্ষা কর।

শান্তা এইরূপ খেদ করিয়া, বিজয়চন্দ্রকে কহিল, বিজয়! যদি তোমরা গমন করিলে, তবে এই প্রাণশূন্য দেহে আমার কি ফল? আমি তোমাদের সঙ্গে যাইব, আমাকে লইয়া চল। বিজয়চন্দ্র সজলনয়নে কহিলেন, আয়ি! আপনি অতি বৃদ্ধা। কেমন করিয়া গমন করিবেন? আপনার বিপদ্ হইলে আমরাও বিপদে পড়িব। এ ক্ষণে গৃহে গমন করুন, জীবিত থাকিলে অবশ্য সাক্ষাৎ হইবে। বসন্তকুমার কহিলেন, আয়ি! তুই কাঁদিস্ কেন? আমরা যাই, এখনি আসিব।

এই বলিয়া শান্তার গলদেশ ধরিয়া ঘোটক হইতে নামিলেন, এবং উত্তরীয় বসনে শান্তার চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন। শান্তা এইরূপ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বক্ষঃস্থলে রাখিয়া রাজার ভয়ে বিদায় করিল। দুটী সহোদর গমন করিলেন, কিন্তু শান্তা যে পর্য্যন্ত অদৃশ্য না হইল, সে পর্য্যন্ত এক একবার পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে লাগিলেন। শান্তাও যতক্ষণ দেখিতে পাইল, একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল; অবশেষে একবারে অদৃশ্য হইলে, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

শুন বৎসগণ! তাঁহারা রাজপুত্র, কখন গৃহের বাহির হন নাই। কোন্ পথ অবলম্বনে কোন্ দিকে গমন করিতে হয়, সে বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না; অশ্বদ্বয় যে পথাবলম্বনে ধাবমান হইল, অগত্যা সেই পথেই গমন করিলেন। ঘোটকদ্বয় কত রাজধানী, কত শত গ্রাম, নগর, উদ্যান, নদ, নদী, দীর্ঘিকা, সরোবর ও পর্ব্বত প্রভৃতি পশ্চাৎ করিয়া, বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় এক নিবিড় বনে প্রবেশ করিল। সেই বনটী ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুর নিবাসস্থান। তথায় মনুষ্যের সমাগম নাই। দুই সহোদর সেই ভয়ঙ্কর বন দর্শনে সাতিশয় ভীত হইলেন। অশ্বদ্বয়, দিনমান তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয় এই কালে, এক পর্ব্বত-সন্নিহিত হইয়া গমনে নিবৃত্ত হইল।

ঐ পর্ব্বতের উপত্যকা অতিশয় সুদৃশ্য ও মনোরম, কেননা অপরিচ্ছন্ন তরুমাত্রই তাহার নিকটে ছিল না। কেবল কতকগুলি তাল তমাল, বকুল প্রভৃতি প্রাচীন বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ থাকায়, পথশ্রান্ত পথিকের বিশ্রাম-নিকেতনস্বরূপ হইয়াছিল, এবং তন্মধ্যে একটী বৃক্ষমূল মণ্ডলাকারে শ্বেত-শিলা-মণ্ডিত; বোধ হয়, যেন পথশ্রান্ত পর্য্যটকগণের শ্রমাপনোদন জন্য জগৎ পিতা অপূর্ব্ব সিংহাসন সন্নিবেশ করিয়া রাখিয়াছেন। একটী অনতিদীর্ঘ জলাশয় পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ অত্যাশ্চর্য্য শোভায় শোভিত করিতেছে। তাহাতে নিরন্তর নির্ঝর-বারি ঝর্ ঝর্ শব্দে পতিত হওয়ায় সহস্র সহস্র বিম্ব এককালে বিকীর্ণ হইয়া আদিত্যাভায় নানা বর্ণে অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে; এবং সেই জলাশয়ের এক পার্শ্ব ভেদ করিয়া একটী প্রবাহ বনান্তরে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার একদিকে পাষাণময় কৃত্রিম সোপান নির্ম্মিত থাকায়, অতি রমণীয় শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে।

বিজয়চন্দ্র এতাদৃশী মনোমোহিনী ভূমি নিরীক্ষণে বিশ্রাম-প্রত্যাশায় অশ্ব হইতে অবরোহণ করিলেন, এবং হস্ত ধরিয়া বসন্তকুমারকে নামাইয়া সোপানোপরি বসাইলেন। রাশরজ্জু মুক্ত হইলে, অশ্বদ্বয় ইতস্ততঃ নবদূর্ব্বাদলাদি ভক্ষণ করিতে

লাগিল। সহোদরদ্বয় সোপান-শয্যায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, হস্ত পদ মুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক করপুটে জলপান করিলেন; তাহাতে অনেক শ্রান্তির অন্ত হইল।

পুনর্ব্বার সোপান-শয্যায় উপবিষ্ট হইলে, বসন্তকুমার কহিলেন, দাদা! আমাকে কোথায় আনিলে? এখানে ত একটী লোকও নাই, চারিদিকে জঙ্গল দেখিতেছি। আমাদের বাড়ীর কোটা কই? শাস্তা আয়ি কই? কিছুই না দেখে আমার বড় ভয় হইতেছে। আমাকে বাড়ী লইয়া চলুন। আমি শাস্তা আয়ির কাছে যাই। আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে। বিজয়চন্দ্র বসন্তকুমারের এই-রূপ বাক্যশ্রবণে অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিলেন, বসন্ত! আর কি আমাদের সে দিন আছে! আমরা সকল বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া অপার দুঃখসাগরে ঝাঁপ দিয়াছি। শাস্তা আয়িকে আর কেন মনে করিতেছ? আমরা তাহাকে জন্মের মত পরি-ত্যাগ করিয়াছি। আর রোদন করিও না, আমার কোলে এস। এই বলিয়া ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎক্ষণ পরে রোদন সংবরণ করিয়া কহিলেন, বসন্ত! তুমি এই স্থানে বসিয়া থাক, বন হইতে ফল লইয়া আমি শীঘ্র আসিতেছি। এই প্রকারে তিনি বসন্তকুমারকে সান্ত্বনা করিয়া ফলচয়নার্থ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

বৎসগণ! বিপদ্ কখন একাকী আসে না, সঙ্করব্যাধির ন্যায় অনুচরদিগকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়া থাকে; একের সহিত সাক্ষাৎ করিলে অপরের সহিত অগোণে সাক্ষাৎ করিতে হয়। শিলাবৃষ্টি ঝড় ও বজ্রপাতের ন্যায় ক্রমে ক্রমে সকলপ্রকার বিপদই উপস্থিত হইয়া থাকে। বিজয়চন্দ্র গমন করিলে, বসন্ত-কুমার একদৃষ্টে তাঁহার প্রবেশ-পথ-পানে চাহিয়া থাকিলেন। এই সময় সন্নিহিত বৃক্ষ হইতে রক্তবর্ণ একটী মনোহর ফল ভূমে পতিত হইয়া ক্রমে নিম্নে যাইতে যাইতে বসন্তকুমারের সম্মুখে অবস্থিত হইল। বসন্তকুমার অতি ক্ষুধাতুর হইয়া-ছিলেন, ঐ ফল ভক্ষণ করিবামাত্র অচেতন হইয়া সোপান-শয্যায় শয়ন করিলেন। বিষম বিষের জ্বালায় তাঁহার সুবর্ণ-বর্ণ বিবর্ণ ও শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইল, এবং বিম্বাধরে অনবরত বিম্ব উঠিতে লাগিল।

এদিকে বিজয়চন্দ্র নিবিড় কাননে ফল চয়ন করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। নয়ন-যুগলে বাষ্প-বারি পরিপূর্ণ হইয়া আসিল। ছিন্ন ফল হস্ত হইতে ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল, এবং অন্তঃ-করণে কত অনির্ব্বচ ভাবের উদয় হইল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগি-লেন, এই অপার দুঃখের উপর আবার কি দুঃখ উপস্থিত। রাজ্যসুখ-প্রত্যাশা-

লতা একবারে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন অমঙ্গল হইলে আমার মন এরূপ ব্যাকুল হইবে কেন। বুঝি প্রাণাধিক বসন্তের কোন বিপদ্ হইয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া তিনি দ্রুত প্রত্যাগমন করিলেন এবং কিঞ্চিৎ দূর হইতে বসন্তকুমারকে সোপান শয্যায় শয়ান নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,হে হৃদয়! তুমি যে আশঙ্কা করিয়া বিদীর্ণ হইতেছিলে, আমার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। আবার মনে করিলেন বসন্ত ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া বুঝি সোপান-শয্যায় নিদ্রা যাইতেছে, আমি কেন তাহার অমঙ্গল চিন্তা করিতেছি। অন্তঃকরণে এইরূপে বিতর্ক করিতে করিতে নিকটবর্ত্তী হইয়া, সচেতন-বোধে কহিলেন, বসন্ত! উঠ উঠ, এত কাতর কেন? নিদ্রালস্য ত্যাগ কর। আহা! সমুদয় দিন গত হইয়াছে, কিছুই খাও নাই। সূর্য্যের খরতর কিরণে চাঁদমুখ আরক্ত হইয়া ক্রমে মলিন হইয়া গিয়াছে। আমি অনেক আয়াসে তোমার জন্য ফল আনিয়াছি, এই ধর, উঠিয়া ভক্ষণ কর। এইরূপ উত্তরোত্তর ডাকিতে ডাকিতে চৈতন্যাভাব-বিবেচনায় বসন্তকে ক্রোড়ে করিতে উদ্যত হইয়া দেখিলেন, সর্পদংশন-সদৃশ তাঁহার বিম্বাধরে বিষ উঠিতেছে, শ্বাস প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়াছে। এই অমঙ্গল ঘটনা-দর্শনে বিজয়চন্দ্র, সর্প-দংশনে অনুজের মৃত্যু বিবেচনায়, বসন্ত রে—বসন্ত! এই শব্দ করিয়া উন্মূলিত কদলীতরুর ন্যায় সোপানোপরি পতিত হইলেন। অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া বসন্ত-কুমারকে ক্রোড়ে করিয়া কহিলেন, বসন্ত! তুমি নগরপালের ভয়ে পিতার কোলে উঠিতে গিয়াছিলে, পিতা অনাদর করিয়া তোমাকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া-ছিলেন; বুঝি সেই অভিমানে প্রাণত্যাগ করিলে? তোমা বিনা আমার আর কেহই নাই। মাতা ত্যাগ করিয়াছেন, পিতা ত্যাগ করিলেন, ভাই তুমিও কি আমাকে ত্যাগ করিলে? আমার গতি কি হইবে? আমি কাহার মুখপানে চাহিয়া দুঃখানল শীতল করিব? দাদা বলিয়া কে আমার কোলে উঠিবে? কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া, শোকে বিহ্বল হইয়া পুনরায় কহিলেন, বসন্ত! এত নিদ্রালস কেন? তুমি না এখনি বলিয়াছ, 'দাদা, আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে।' আমি অনেক পর্য্যটনে ফল আনিয়াছি, এই ধর, ভক্ষণ কর। আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে, বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, দুটী বাহু প্রসারিয়া আমার কোলে উঠিয়া একবার চাঁদমুখে দাদা বল, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক। কিঞ্চিৎ-ক্ষণ মৌনী থাকিয়া কহিলেন, বসন্ত! তুমি উঠিলে না, তবে এই খানেই থাক, আমি চলিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া, প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কহিলেন, বসন্ত! আমি তোমাকে একা রাখিয়া কোথায় যাইতেছি। আমার হৃদয় বড়

কঠিন, তুমি বুঝি ভয় পাইয়াছ, এস তোমাকে কোলে করি। তদনন্তর বসন্তকুমারকে বক্ষঃস্থলে ধারণপূর্ব্বক শান্তাকে উদ্দেশিয়া কহিলেন, শান্তে! তুমি যাহাকে কখন কোল হইতে নামিতে দাও নাই, যাহার মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ ঘর্ম্মাক্ত হইলে অঞ্চলের দ্বারা বাতাস করিয়াছ, যাহার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইলে ব্যতিব্যস্তা হইয়া ঔষধ-অন্বেষণে ব্যগ্রা হইয়াছ, এবং সুস্থ হইলে পরমসুখে কালাতিপাত করিয়াছ; তোমার অঞ্চলের নিধি, যতনের ধন, সেই বসন্তকুমার আজি ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে, শীঘ্র আসিয়া কোলে কর। বিজয়চন্দ্র এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া বিবেচনা করিলেন, যদি বসন্ত আমাকে নিতান্তই পরিত্যাগ করিল, তবে জীবিত থাকিয়া আমার আর কি সুখ আছে। এই জলাশয়ে প্রবেশ করিয়া শোকানল নির্ব্বাণ করি। তিনি এই স্থির করিয়া জলমগ্ন হইতে উপক্রম করিলেন।

নিকটে এক পরমহংসের আশ্রম ছিল। সেই সাধু তখন বন-পর্য্যটনে গমন করিয়াছিলেন; ভাগ্যক্রমে তৎকালে সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং দূর হইতে বিজয়চন্দ্রের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, 'সর্ব্বনাশ! ও কি! ও কি কর!' এই শব্দ করিতে করিতে ত্বরায় নিকটবর্ত্তী হইয়া বিজয়চন্দ্রের হস্তধারণপূর্ব্বক কহিলেন, এ কি! একি কর! আত্মহত্যা, মহাপাতক, বিস্মৃত হইয়াছ? তুমি কি জান না, আত্মহত্যাকারী অপেক্ষা পাপাত্মা আর নাই। বিজয়চন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আমার জীবন অগ্রে যাত্রা করিয়াছে, একণে শূন্য দেহ জলমগ্ন করিতে যাইতেছি, ইহাতে আত্মঘাতী পাতকী হইব কেন? এইমাত্র কহিতে কহিতে শোকাচ্ছন্ন হইয়া ঝটিকোন্মূলিত-তরুতুল্য সোপানশায়ী হইলেন।

পরমহংস ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিজয়চন্দ্রকে হস্ত ধরিয়া তুলিলেন এবং অনেকপ্রকার সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৎস! মৃত শিশুটীর লক্ষণ দেখিয়া আমার বিলক্ষণ অনুমিতি হইতেছে উহার মৃত্যু হয় নাই। তবে কি না বিষাক্ত ফল অথবা বিষপত্র ভক্ষণে এরূপ ঘটনা হইয়া থাকিবে, ইহার প্রতিকার সত্বরেই হইতে পারে। এ নিমিত্ত এত ব্যাকুল হইতেছ কেন? বোধ হয়, জগদীশ্বর অবিলম্বেই বিপদ্ ভঞ্জন করিবেন। এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন, এবং সত্বরেই ঔষধ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক ঐ ঔষধ ফুৎকার দ্বারা বসন্তকুমারের কর্ণ ও নাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট করাইলে, তাঁহার কিঞ্চিৎ শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল। বসন্তকুমার কিয়ৎক্ষণান্তে নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন, এবং বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, দাদা! আমি ঘুমাইয়াছিলাম। আপনি ফল আনিতে গিয়াছিলেন, কৈ ফল কৈ,

আমাকে দিন, আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে। বিজয়চন্দ্র বসন্তকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া সজলনয়নে কহিলেন, বসন্ত! যথার্থ বটে, তুমি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলে, আমিও মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইতেছিলাম, ভাগ্যে এই ভগবান্ কৃপা করিয়া দুজনকেই চৈতন্যপ্রদান করিলেন, নতুবা সাক্ষাৎ হইবার আর সম্ভাবনা ছিল না।

তদনন্তর বিজয়চন্দ্র সঞ্চিত ফলার্দ্ধ বসন্তকুমারকে ভক্ষণ করাইয়া, অবশিষ্টার্দ্ধ আপনি ভোজন করিলেন। তাহাতে তাঁহাদের ক্ষুধা অনেক শান্ত হইল। পরমহংস দুটী সহোদরের আপাদ-মস্তক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, আমার বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে, তোমরা কোন রাজকুল অলঙ্কৃত করিয়াছ, কিন্তু কি নিমিত্ত এই দুর্গম বনে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিয়াছ, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বিজয়চন্দ্র আদ্যোপান্ত সমগ্র বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, দিগম্বর কর্ণকুহরে হস্তার্পণপূর্ব্বক বিস্ময়োৎফুল্লান্তঃকরণে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, বিষয়ী মনুষ্যেরা রিপুপরতন্ত্র হইয়া কি না ধর্ম্মবিগর্হিত কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়! অপত্যস্নেহ-সেতু ভঙ্গ করিয়া অপত্য-হত্যা করিতেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে! হা পরমেশ্বর! তুমি কি সহিষ্ণু!

তত্ত্বজ্ঞানী এইরূপ চিন্তা করিয়া বিজয়চন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! রজনী আগতা, হিংস্র জন্তু সকল জলপানাশয়ে এই নীরাশয়ে ধাবিত হইবে। অতএব এই স্থানে আর অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য নহে। অদ্য রজনীতে আমার আশ্রমে আতিথ্যসৎকার গ্রহণ কর। বিজয়চন্দ্র, "আপনার অনুমতি শিরোধার্য্য" বলিয়া, দক্ষিণ হস্তে অনুজের হস্ত, এবং বামহস্তে অশ্বদ্বয়ের রজ্জু ধরিয়া তপোনিধির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন।

পরমহংস সেই পর্ব্বত-কঙ্কালে এক প্রশস্ত গুহায় বাস করিতেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া, দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক গুহা প্রবেশ করিলেন। বিশ্বমণ্ডল যতই অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল, কন্দর-স্থান দিন মানের ন্যায় ততই প্রদীপ্ত হইল। বিজয়চন্দ্র চমৎকৃত হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক দেখিলেন, একখান প্রস্তরের জ্যোতিতে এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে। তদনন্তর গুহাদ্বারে দুটী অশ্ব বন্ধন করিয়া স-সহোদর গুহা-প্রবেশ করিলেন। পরমহংস আহারার্থ নানাপ্রকার সুস্বাদু ফল-মূল প্রদান করিলে, ভোজনান্তে বসন্তকুমার নিদ্রাগত হইলেন। বিজয়চন্দ্র পরমহংসের সহিত ধর্ম্মালাপে অধিকাংশ যামিনী অতিবাহিত করিয়া, পরে নিদ্রিত হইলেন।

পর দিন সহোদরদ্বয় পূর্ব্বদিকে দিননাথকে উদিত দেখিয়া, পরমহংসকে

প্রণাম-প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক তুরঙ্গারোহণে যাত্রা করিলেন। অশ্ব-দ্বয় সেই পর্ব্বতের নিম্ন ভূমি দিয়া ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই পথ অতিশয় দুর্গম, সুতরাং বিজন। তাহার দক্ষিণ প্রদেশ পর্ব্বতময়, উত্তর প্রদেশে অরণ্য ব্যবধান, স্থানে স্থানে শিলাখণ্ড ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সমুদায় পতিত হইয়া পথিকদিগের অতিশয় দুঃখদ হইয়াছিল। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারের এই পথেই তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। তথাপি তাঁহারা তাহার অন্য কোন দিকে আর পথ পাইলেন না। পরিশেষে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ছিন্ন তরুপল্লবের ন্যায় এককালে মলিন এবং ক্রমে ক্রমে বাক্‌শক্তিহীন ও দুর্ব্বল হইলেন, তখন কেবল ঘোটকাবলম্বনে গমন করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় কিয়দ্দূর গমন করিলে, তুরঙ্গদ্বয় এক লতাবলয়ে উপস্থিত হইয়া পথাভাবে দণ্ডায়মান হইল। সেই স্থানটী আবার এমনি ভয়ঙ্কর যে, তথায় দিবসেই রজনী বোধ হয়। তাহার দুই দিকে কণ্টকী বেণুবন, এবং মধ্যস্থলে নর-কপাল ও বৃহৎ বৃহৎ পশ্বাদির অস্থি সকল বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সমীপবর্ত্তী পর্ব্বত-কঙ্কালে এক বিস্তৃত সুরঙ্গ। তাহা হঠাৎ দেখিলে সাধারণ মনুষ্যগণ পাতাল-প্রবেশের পথ অনুমান করে। বাস্তবিক ঐ সুরঙ্গটী তাড়কা রাক্ষসীর বাসস্থান ছিল। ত্রেতাযুগে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র যখন মিথিলা-নগরে গমন করেন, এই স্থানে সেই দুরন্ত নরনাশিকা তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি সম্মুখ-সংগ্রামে তাহাকে বধ করিয়া, মথিলাগমনের সুলভ পথ নিষ্কণ্টক করেন। বিজয়চন্দ্র অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া বসন্তকুমারকে অভয় দিয়া কহিলেন, বসন্ত! এত ব্যস্ত হইতেছ কেন? ভয় কি, আমি ত তোমার সঙ্গেই আছি। অনন্তর ইতস্ততঃ গমনে পথান্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন্ দিকে পথ থাকিল, অন্ধকার-প্রযুক্ত তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। সূর্য্যাস্তের কত বিলম্ব আছে, জানিবার জন্য এক সুদীর্ঘ বৃক্ষারোহণ করিলেন, দেখিলেন দীননাথ পশ্চিমাচলে লুকাইতেছেন এবং অন্ধকার তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, তিনি ক্রোধে আরক্তবর্ণ হইয়াছেন। বিজয়চন্দ্র বৃক্ষ হইতে শীঘ্র নামিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে কহিতে লাগিলেন, অদ্য এই স্থানে আমাদের প্রাণ যাইবে, সন্দেহ নাই; হয় ত এই সুরঙ্গ হইতে অজগর ভুজঙ্গ বাহির হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবে, না হয় কোন করাল-বদন নর-খাদক আসিয়া সংহার করিবে, এ বিষম সঙ্কটে আমাদের আর নিস্তার নাই। কাদম্বিনী মায়ের জলোখাদ্য বুঝি আজি পূর্ণ হইল। হায়! মরণের সময় বন্ধু বান্ধব কাহারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না। হা

শান্তে! তুমি কোথায়! বিজন বনে আমরা প্রাণত্যাগ করিলাম, তুমি ইহার কিছুই জানিতে পারিলে না। এইরূপ খেদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বসন্ত পাছে ভয় পায়, এই ভয়ে মনের ভাব কিছুই প্রকাশ করিলেন না। নয়নে বাষ্প-বারি সঞ্চার হইয়া আসিলে, পরিধেয়বস্ত্রাঞ্চলে সংবরণ করিতে লাগিলেন।

বসন্তকুমার অগ্রজের ভাব ভঙ্গিতেই বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, দাদা! ও কি, তুমি কাঁদ কেন? যদি ভয় পাইয়া থাক, তবে কেন শান্তা আয়িকে ডাক না? সে তোমার কথা শুনিতে পাইলে, অমনি দৌড়াদৌড়ি আসিবে। বিজয়চন্দ্র সহোদরকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া রোদন সংবরণ করিলেন, এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে এই কাল রজনী অতিবাহিত করিব; এরূপ ভয়ঙ্কর স্থানে অনল ব্যতীত থাকা উচিত নয়, যেহেতু অগ্নি দেখিলে সর্প, ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু নিকটস্থ হয় না। এই জনশূন্য অরণ্যে বা কিরূপে অগ্নি প্রাপ্ত হইব। ক্ষণ-কালের পর দুইখান শুষ্ক বেণুদণ্ড আনিয়া পরস্পব ঘর্ষণ করিলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে তন্মধ্য হইতে ধূম ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। ইহাতে অনল উদ্দীপন কবিতে তাঁহাকে আর অধিক কষ্ট পাইতে হইল না। অগ্নি সম্পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত হইলে, সেই স্থানটী কিঞ্চিৎ আলোকময় হইল। বিজয়চন্দ্র অশ্বদ্বয়ের পর্য্যাণ ও মুখবন্ধ খুলিয়া শয্যা প্রস্তুত করিলেন। বসন্তকুমার ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতব হইয়াছিলেন, সেই পর্য্যাণ-শয্যায় নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। ঘোড়া দুটী এদিক ওদিক লতা পত্র তৃণ খাইতে লাগিল।

বৎস সকল! সময়ে কি না করে। মণিময় পর্য্যঙ্কে কুসুমতুল্য সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া যে বসন্তকুমারের নিদ্রা হইত না, এক্ষণে সামান্য পর্য্যাণ-শয্যায় তাঁহার সুষুপ্তির অবস্থা হইল। বিজয়চন্দ্র কখন্ কোন্ বিপদ্ ঘটে এই আশঙ্কায় নিদ্রা না যাইয়া অনুজের নিকট বসিয়া থাকিল, এবং অনলের উত্তাপে তাঁহার শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইলে উত্তরীয় বসনাঞ্চলে বাতাস করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় প্রায় সমস্ত রজনী গত হইলে বসন্তকুমাবের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি অত্যন্ত পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া কহিলেন, দাদা! আমার বড় পিপাসা হইয়াছে, আমি কথা কহিতে পারি না, আমাকে শীঘ্র জল আনিয়া দাও। বিজয়চন্দ্র কহিলেন, বসন্ত! এমন সময়ে কোথায় জল পাইব বল, কিঞ্চিৎকাল ধৈর্য্য করিয়া থাক, প্রভাতে জল আনিয়া দিব।

পরে শর্ব্বরী অবসান হইল, বিহঙ্গকুল কলরব করিয়া উঠিল, তুষারবিন্দু মুক্তা-হারের ন্যায় তরু-পল্লব-খলিত হইতে লাগিল, পূর্ব্ব দিক্ রক্ত বস্ত্র পরিধান

করিল। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার তিরোহিত হইয়া, লতাবিতান অত্যন্ত আলোকময় হইয়া আসিল। বিজয়চন্দ্র আর বিলম্ব না করিয়া, বসন্তকুমারকে হাত ধরিয়া অশ্ব-পৃষ্ঠে উঠাইয়া দিলেন, এবং আপনিও অশ্বাসীন হইয়া, ইতস্ততঃ পথান্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ মিথিলা-গমনের পথ দেখিতে পাইলেন। বসন্তকুমার ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, সুতরাং কিয়দ্দূর গমন করিয়া নিতান্ত অশক্ত ও অশ্বপৃষ্ঠে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। না হইবারই বা বিষয় কি, একে ছেলে মানুষ, তাহাতে আবার দিবারাত্র নিরম্বু উপবাস। তখন তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন, দাদা! আমি আর অশ্বে থাকিতে পারি না, আমার শরীর অবশ হইয়াছে, আমাকে ঘোড়া হইতে শীঘ্র নামাও, না হয় পড়িলাম। বিজয়চন্দ্র অমনি ব্যস্ত হইয়া ঘোটক হইতে অবরোহণপূর্ব্বক বসন্তকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া নামাইলেন, এবং সজল-নেত্রে কহিলেন বসন্ত! তুমি কিঞ্চিৎক্ষণ আমার অপেক্ষা করিয়া থাক, আমি জল লইয়া শীঘ্র আসিতেছি। এই বলিয়া জলান্বেষণে গমন করিলেন। বসন্তকুমার অনিমিষ-লোচনে তাঁহার পথপানে চাহিয়া থাকিলেন। এবং পীযুষ-পিপাসু আবদ্ধ গোবৎস যেমন ক্ষণে ক্ষণে শব্দ করে, তদ্রূপ তিনিও দাদা দাদা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

বিজয়চন্দ্র প্রসিদ্ধ পথ ধরিয়া কতক দূর চলিয়া গেলেন, কিন্তু জল বা কোথায়, কোন দিকেই বা যান, কিছুই নিশ্চয় করিতে না পরিয়া, এক তমাল তরু-তলে বসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দেখিলেন একটী শশকী কতকগুলি শিশু সন্তান লইয়া তাহাদের গাত্র লেহন করিতে করিতে আসিতেছে। শশক-শিশুদিগের কাহারও গাত্রে কর্দ্দমচিহ্ন, কাহারও সর্ব্ব শরীর জলার্দ্র। বিজয়চন্দ্র শশ-দর্শিত পথাবলম্বনে গমন করিয়া অনতিবিলম্বে একটী সুদীর্ঘ জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী হইলেন, এবং "আমার সঙ্গে পাত্র নাই, কি প্রকারে জল লইয়া যাইব" এই চিন্তা করিতেছেন, হঠাৎ পার্শ্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, একটা দিগ্‌-গজ মস্তকোপরি শুণ্ড তুলিয়া অতিবেগে ধাবিত হইতেছে। অমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মান হইলেন। করিবর দূর হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে, বিজয়চন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া সেই দিকেই ধাবিত হইল।

বিজয়চন্দ্র ভয়ে জড়ীভূত হইয়া কহিলেন, হা পরমেশ্বর! এবার এই হস্তীর হস্তেই আমার প্রাণ গেল! আমি মরিলাম সেজন্য দুঃখ নাই, কিন্তু বসন্তকুমার বিজন বনে পড়িয়া জলাভাবে আহি আহি করিতেছে, সেই জনশূন্য অরণ্য-মধ্যে জলদানে কে তাহার প্রাণ রক্ষা করিবে! হায় কি সর্ব্বনাশ! এ দিকে

দুরন্ত বারণ আমাকে বিনাশ করিতে আসিতেছে, ও দিকে পিপাসায় বসন্তকুমারের ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়াছে। কি করি, এখানে এমন কেহ নাই, যে তাহাকে বসন্তের কথা বলিয়া দি। হে করুণাময় পরমেশ্বর! মৃত্যু সময়ে আমি কাতরে এই প্রার্থনা করিতেছি, সেই নিরাশ্রয় বালককে রক্ষা কর। বিজয়চন্দ্র এইরূপ কহিতে কহিতে আতঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পড়িলেন। মত্ত দন্তী তাঁহাকে কর-বেষ্টন-পূর্ব্বক মস্তকে তুলিয়া প্রচণ্ড শব্দ করিতে করিতে ধাবিত হইল।

এ দিকে বসন্তকুমার ক্ষুধা তৃষ্ণায় একান্ত অস্থির হইয়া মৃতপ্রায় ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছেন, বাক্য-প্রয়োগের শক্তি নাই, তথাপি মৃদুস্বরে দাদা বলিয়া ক্ষণে ক্ষণে মুখ-ব্যাদান করিতেছেন। তাঁহার বিম্বাধর বিবর্ণ ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়াছে। এমন সময় সারদ্বাজ মুনি সেই পথে গমন করিতেছিলেন, বসন্তকুমারকে তদবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন— এই বালকটী আকার প্রকারে রাজপুত্র অনুমান হইতেছে, কিন্তু কিজন্য এই বিজন বনে একাকী আসিয়া এই দশাগ্রস্ত হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা আর কেহ ইহার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি, যেহেতু দুইটী ঘোটক দেখিতেছি। এ ক্ষণে ইহাকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিবার সময় নাই; অগ্রে জলদানে সুস্থ করি, পরে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিব। তদনন্তর এক কমণ্ডলু-পরিপূর্ণ বারি আনিয়া প্রথমে বিন্দু বিন্দু পরিমাণে বসন্তকুমারের জিহ্বাগ্রে দিতে লাগিলেন। পরে তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে স্বহস্তে কমণ্ডলু-স্থিত সমুদয় জল পান করিয়া, মুনির মুখপানে চাহিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি কে, আমার প্রাণ যাওয়ার সময় জল দিয়া বাঁচাইলেন? আপনি বলিতে পারেন, আমার দাদা কোথায় গেলেন? তিনি আমার জন্য জল আনিতে অনেকক্ষণ গিয়াছেন, এখনও ফিরিয়া আসিলেন না। বসন্তকুমারের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে তপস্বী বুঝিতে পারিলেন, ইহার সঙ্গে ইহার অগ্রজ আসিয়াছে। বোধ করি তাহার কোন বিপদ্ হইয়া থাকিবে, নতুবা এ পর্য্যন্ত না আসিবার কারণ কি? সে যাহা হউক, এক্ষণে ইহাকে সান্ত্বনা করা আমার কর্ত্তব্য।

মুনিবর প্রবোধ-বাক্যে কহিলেন, বৎস! তোমার ভয় কি? বোধ করি তোমার দাদা এখনি আসিবেন। তিনি যে পর্য্যন্ত না আইসেন, আমি তোমার নিকটে থাকিব। বাছা রে! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল দেখি, তোমরা দুটী ভাই কিজন্য এই দুর্গম বনপথে আসিয়াছ? বসন্তকুমার কহিলেন, মহাশয়! আমি তা ভালরূপ জানি না, দাদা আসিলে তাবৎ বলিতে পারেন।

এতৎ শ্রবণে মুনিবর বিবেচনা করিলেন, এ যেরূপ বালক, ইহাকে দুই এক কথা জিজ্ঞাসা ভিন্ন ইহাদের এরূপ অবস্থায় অবস্থিত হইবার কারণ জানিবার অন্য উপায় নাই; অতএব সেইরূপই জিজ্ঞাসা করি। বৎস রে! তোমরা কার ছেলে? তোমাদের বাড়ী কোথায়? বসন্তকুমার কহিলেন, আমার পিতার নাম রাজা জয়সেন, দাদার নাম বিজয়চন্দ্র, আমার নাম বসন্তকুমার; বাড়ী জয়পুরে। তপোধন এই কয়েকটী কথা শুনিয়া অনুমান করিলেন, শুনিয়াছি জয়পুরাধিপতি রাজা জয়সেন প্রথম সংসাব গত হওয়ায় পুনর্ব্বার বিবাহ করেন। বোধ করি তাঁহা-কর্ত্তৃক এই ঘটনা হইয়া থাকিবে। ভাল, বিশেষ করিযা জিজ্ঞাসা কবি। তপস্বী কহিলেন, বাছা বসন্ত! বল দেখি তোমার বিমাতা কি তোমাদিগকে কিছু বলিয়াছিলেন? না তোমাদের পিতা তোমাদিগকে মারিয়াছেন? বসন্তকুমার কহিলেন, না মহাশয়! মা কিছুই বলেন নাই। আমরা কোটার ভিতর বসিয়াছিলাম, শান্তা আয়ি আসিয়া দাদার কাছে কি বলিয়া যেন কাঁদিতে লাগিল। খানিক পরেই নগরপাল আমাকে আর দাদাকে দড়ী দিয়া বাঁধিয়া এক আঁধার ঘরে রাখিল। এই দেখুন তাহার দাগ এখনও আমার হাতে রহিয়াছে, বলিয়া তিনি তপস্বীকে হাত দেখাইতে লাগিলেন। মুনিবর দৃষ্টি করিয়া চমৎকৃত ও দুঃখিত হইয়া কহিলেন, হাঁ বাছা! তার পরে কি হইল? বসন্তকুমার কহিলেন, রাত্রি প্রভাত হইলে, নগরপাল আমাকে আর দাদাকে লইয়া পিতার সম্মুখে রাখিল। তিনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে কাটিয়া ফেলিতে বলিলেন। দাদা তাঁহার দুখানি পা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তবু তিনি শুনিলেন না। পরে মন্ত্রী মহাশয় আমাদের হাতের দড়ী খুলিয়া দিয়া এই ঘোড়া আনিয়া দিলেন; আমি একটায়, আর দাদা একটায় চড়িয়া চলিলাম। দাদা আমাকে এখানে আনিয়াছেন, আমি কত বার কহিলাম, দাদা, চল বাড়ী যাই, তিনি তা শুনিলেন না। ভাল মহাশয়! আপনি না বলিলেন, "তোমার দাদা এখনি আসিবেন"; কৈ তিনি ত এখনও আসিলেন না। আমার বড় ক্ষুধা হইয়াছে, আমি কার কাছে বসিব?

তাপসশ্রেষ্ঠ, বসন্তকুমারের এই সকল কথা শুনিয়া, তাঁহাদিগের যে যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিলেন। তপস্বিদিগের চিত্ত স্বভাবতঃ দয়ার্দ্র, তাহাতে আবার এই সকল দুঃখজনক বাক্য শ্রবণ করায় একবারে দ্রব হইয়া গেল। তখন তিনি দুঃখ গদগদ হইয়া কহিলেন, বাছা বসন্ত! তোমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে? তুমি এই খানে কিঞ্চিৎকাল বসিয়া থাক, আমি বন হইতে ফল আনিয়া দিতেছি। এই বলিয়া গমনোন্মুখ হইলেন। বসন্তকুমার

অতি কাতরস্বরে কহিলেন, ঠাকুর মহাশয়! আপনিও কি আমাকে ফেলিয়া চলিলেন? আমার উপায় কি হবে? এই কয়েকটী কথা বলিতে বলিতে নয়ন-জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল। তপস্বী কহিলেন, বাছা রে! আমি আর তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না। তুমি এ আশঙ্কা কেন করিতেছ? যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে আমার এই কাঁথা আর কমণ্ডলু রাখ। তাহা হইলে আমি আর যাইতে পারিব না। মুনি কাঁথা কমণ্ডলু বসন্তকুমারের নিকটে রাখিয়া ফলান্বেষণে গমন করিলেন এবং অনেক পর্য্যটনে আতা, পেয়ারা প্রভৃতি কতকগুলি পরিণত ও সুস্বাদু ফল আনিয়া দিলেন। বসন্তকুমার পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজন করিলেন। মুনিবর বিজয়চন্দ্রের আগমনাপেক্ষায় অনেক ক্ষণ তথায় অবস্থিতি করেন, এ দিকে বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হয়। বিজয়চন্দ্রের আর আগমনের সম্ভাবনা না দেখিয়া কহিলেন, বাছা বসন্ত! তোমার দাদা বুঝি আর আসিলেন না। যদি জীবিত থাকেন, তবে কোন সময়ে অবশ্য সাক্ষাৎ হইবে। তুমি আমার সঙ্গে আইস। মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র বসন্ত-কুমার, দাদা, দাদা, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তপোধন প্রবোধ দিবার জন্য কহিলেন, বাছা রে! আর কাঁদিও না, চুপ কর, তুমি কি শুনিতেছ না, বনের মধ্যে বাঘ ডাকিতেছে। আর এ খানে থাকা হয় না, চল আমরা শীঘ্র শীঘ্র যাই। বসন্তকুমার ভয়ে অমনি চুপ করিলেন। তপস্বী তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া দিলেন এবং স্বহস্তে লাগাম ধরিয়া চলিলেন। দ্বিতীয় অশ্বটী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

মুনিবর সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে নিজাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। আশ্রমবাসিগণ, একে একে সকলেই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বসন্তকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করি-লেন। তিনি তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলে, তপস্বি-সম্প্রদায় চমৎকৃত ও সাতিশয় দুঃখিত হইলেন।

ভারদ্বাজ মুনি অনপত্য, এজন্য তদীয় পত্নী সুদক্ষিণা সর্ব্বক্ষণ পর-পুত্র-পালনে একান্ত ইচ্ছাবতী ছিলেন। বসন্তকুমারকে দেখিয়া, তাঁহার আর আহ্লাদের পরিসীমা থাকিল না। আবার বসন্তকুমারের এমনি সুন্দর মুখশ্রী ছিল, যে, শত্রু-পুত্রপ্রভৃতিও তাঁহার মুখপানে চাহিলে, লালন পালন করিতে ব্যগ্র হইত। বিশে-ষতঃ মুনিপত্নী সন্তান-বিহীনা, সুতরাং তিনি আহ্লাদ-সাগরে নিমগ্না হইয়া বাহু-যুগল প্রসারণপূর্ব্বক বসন্তকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া কুটীরে গমন করিলেন। রজনী প্রভাতা হইল। মুনিকুমারেরা বসন্তকুমারের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে কুটীরদ্বারে

দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি অপরিচিত বোধে কাহারও নিকট গেলেন না; রজনীতে কেবল ব্রাহ্মণপত্নীকে দেখিয়াছেন, অতএব তাঁহারই নিকটে বসিয়া থাকিলেন। যখন তাঁহার অন্তঃকরণে বিজয়চন্দ্রের কথা জাগ্রৎ হইতে লাগিল, তিনি অমনি দাদা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। দ্বিজরমণী তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া হরিণ-শিশু ও কবুতর দেখাইয়া প্রবোধ-বচনে সুস্থির করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় দুই চারিদিন গত হইল। যখন তাপস-তনয়দিগের সহিত তাঁহার প্রণয়সঞ্চার হইল, এবং ক্রীড়া কৌতুকে অন্তঃকরণ সর্ব্বদা ব্যগ্র রহিল, তখন বিজয়চন্দ্রের কথা ক্রমে ক্রমে অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল।

এতদবস্থায় কিছু কাল অতিবাহিত হয়। তাপসশ্রেষ্ঠ ভারদ্বাজ অন্যান্য মুনিকুমারের সহিত বসন্তকুমারের পাঠাভ্যাস করিতে সময় নিরূপণ করিয়া দিলেন। প্রথমতঃ তাহাতে তাঁহার কিঞ্চিৎ কষ্ট ও বিরক্তি বোধ হইল বটে, কিন্তু যৎকালে কিঞ্চিৎ বোধ হইয়া উঠিল, তখন তিনি ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত হইলেন। একে রাজপুত্র স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহাতে আবার তপস্বিদিগের উপদেশ, সুতরাং অত্যল্প পরিশ্রমেই চিত্তোৎকর্ষ হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় বর্দ্ধিত হওয়ায়, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল তাঁহার ঘৃণার্হ হইল। ইহাতে আর বিদ্যাভ্যাসের ফল কি না দর্শিল?

বাছা সকল! সংসারী ব্যক্তিগণ নানাবিদ্যায় বিভূষিত হইয়াও গ্রন্থবাহক চতুষ্পদ-তুল্য। যে হেতু তাঁহারা কাপট্য, চপলতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি কৃত্রিম স্বভাবের বশবর্ত্তী হন। তপস্বিদিগের সেরূপ ব্যবহার কিছুই নাই। লোকালয়ে সুস্বভাব মনুষ্য প্রাপ্ত হওয়া সামান্য ব্যাপার নহে; সদ্যঃপ্রসূত শিশু মাতৃক্রোড় হইতে কৃত্রিম প্রকৃতি অবলম্বন ও চাতুর্য্য, বঞ্চকতা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, আর যাবজ্জীবন তদনুশীলনেই ব্যাপৃত থাকে। তপস্বিগণের বাল্যাবধি বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত কেবল সত্যসূচনা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ, মনন, ধৈর্য্য ও ক্ষমা এই সকল সৎগুণেরই পরিচালনা হইয়া থাকে। ইহাতে আর তপোবনবাসীরা কৃত্রিম স্বভাবের বশীভূত কেন হইবেন?

বসন্তকুমার আনুপূর্ব্বিক সকল শাস্ত্রে পারদর্শী এবং ক্রমে কৈশোরাবস্থা পশ্চাৎ করিয়া যৌবনোদ্যানে উপস্থিত হইলেন। তাপসশ্রেষ্ঠ ভারদ্বাজ, তাঁহার স্বাগত যৌবনাবলোকনে নিকটে বসাইয়া, চরিত্রপরীক্ষার্থ [illegible] তাঁহাকে একটী প্রশ্ন করিলেন।

বাছা বসন্ত! মনুজনামা এক ব্রাহ্মণকুমারের কৈশোরাবস্থা গত হইলে, তিনি যৌবনের প্রারম্ভে সন্দেহ-পন্থায় ইতস্ততঃ গমন করিতে করিতে, সম্মুখে এক চিন্তাশৈল দেখিতে পাইলেন; সেই পর্ব্বতের শিখরদেশ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া গগন স্পর্শ করিয়াছে। মনুজ তাহাব সমীপবর্ত্তী হইতে সমুৎসুক হইয়া দ্রুত-বেগে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু বন্ধুর ভূমি প্রযুক্ত বারংবার তাঁহার পদস্খলন ও গতিরোধ হইতে লাগিল; সুতরাং ক্লেশ পাইতে লাগিলেন। তিনি বহুধা যত্নে নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন,সেই শৈলের শিখবদেশ হইতে ছুইটী দিব্যাঙ্গনা বহির্গতা হইয়া তাঁহার নিকটে কুঞ্জবগমনে আসিতেছে। তন্মধ্যে একটী অঙ্গনা বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কাবে বিভূষিতা ও চঞ্চল প্রকৃতি। দ্বিতীয় অঙ্গনাটী অতি সুশীলা, সাধুমতী, সলজ্জবদনা এবং অঙ্গসৌষ্ঠবেই অলঙ্কৃতা হইয়াছেন।

এইরূপ দৃষ্টি কবিতে কবিতে প্রথমা রমণী দ্রুতগমনে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া অপাঙ্গ-ভঙ্গিতে কহিলেন, মনুজ! তুমি কি চিন্তা করিতেছ? তোমার এত বিচারের প্রয়োজন কি? আমাব এই সুগম পথে গমন কর। মনুজ আশ্চর্য্য ঘটনা নিরীক্ষণে চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, আপনি কে? কি নিমিত্ত আমার নিকটে আগমন কবিয়াছেন?

স্বাগতা ললনা উত্তর করিলেন, আমি প্রেয়ঃ, তোমাকে উভয়পথের সন্ধিস্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া সুগম পথ দেখাইতে আসিয়াছি। আমার পশ্চাৎ বিনি আসি-তেছেন, তাঁহার নাম শ্রেয়ঃ। তাঁহার প্রদর্শিত পথ এমন দুর্গম যে, সে পথে যাত্রি-গণ কিঞ্চিৎ গমন করিয়া প্রায়ই প্রত্যাবর্ত্তন কবেন। উনি মনুষ্যদিগকে আনন্দ ও ভাবি সুখের প্রত্যাশা দিয়া থাকেন; সে কেবল আশামাত্র, তাহা কোন কালে পরিপূর্ণ হয় কি না, সন্দেহ। সুতরাং মানবমাত্রেই সেই পথের পান্থ হইতে ইচ্ছুক নহেন। আমার এই পথ সুগম জানিয়া এ ক্ষণে প্রায় সকলেই ইহার অনুবর্ত্তী হইতেছেন। অধিক কি বলিব, যাত্রিগণের সমাগমে সকল স্থান পরিপূর্ণ হইয়াছে।

প্রেয়োঙ্গনা এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে শ্রেয়োঙ্গনা ধীরাগমনে মনুজের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া মৃদু মধুর সম্ভাষণে কহিলেন, বাছা মনুজ! তোমাকে উভয় পথের সন্ধিস্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া সাধুপথ প্রদর্শন করাইতে আমি এ পর্য্যন্ত আসিয়াছি। এক্ষণে তুমি বিচার করিয়া সৎপথ অবলম্বন কর।

প্রেয়োঙ্গনা কহিলেন, মনুজ! তুমি শ্রেয়েব কথায় মুগ্ধ হইও না। উঁহার প্রদর্শিত পথে সুখ পাওয়া বড় কঠিন। তুমি আমার প্রদর্শিত পথে চল, আমি এ পথের যে সমুদায় সুখ বর্ণন কবিব, তাঁহার ফল প্রত্যক্ষই দেখিবে। আর

ওপথের পথিকদিগের যে দুর্গতি, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমার এ পথের পান্থ-দিগের যে কত সুখ, আহা! তাহা কি এক মুখে বর্ণন করিয়া শেষ করা যায়? দেখ, এক বসন্তকালেই বা কত সুখ; নব-কুসুমিত তরু সকল দৃষ্টি করিলে অন্তকরণে কত নব নব ভাবেরই সঞ্চার হইতে থাকে, এবং প্রফুল্ল কমল-দলে মধুকরকে মধুপান করিতে নিরীক্ষণ করিলে পথিকের অন্তঃকরণে কি অনির্ব্বচনীয় ভাবেরই উদয় হয়! আতপ-তাপিত ব্যক্তি যখন মলয় সমীরণের সুমন্দ সঞ্চারে সুশীতল-বকুল-মূলে উপবেশন করে, সেই সময় অলিবৃন্দ গুণগুণ ধ্বনিতে কোকিল কোকিলা কুহুরবে, কি আশ্চর্য্য সুখে তাহাকে সুখী করিয়া থাকে! আবার বিষয়বিলাসী মনুষ্যগণ, দ্বিতল, ত্রিতল, কেহ কেহ ততোধিকতল গৃহে মণি-ময় পর্য্যঙ্কে কুসুমতুল্য সুকোমল শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া, রতিরূপা কামিনী-সঙ্গে হাস্য কৌতুকে, তাহাদিগের নৃত্য ও অপাঙ্গ-ভঙ্গিমায় এবং সুবভিমুখচন্দ্রমাঘ্রাণে, কি না সুখ সম্ভোগ করেন? তাহার নিকটে শ্রেয়ের ভাবি সুখ কি সুখ বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কোন্ মূর্খ ভাবি দুর্লভ সুখ প্রত্যাশায় প্রত্যক্ষ সুলভ সুখ পরিত্যাগ করে?

শ্রেয়ঃ কহিলেন, বাছা মনুজ! প্রেয়ঃ যাহা কহিলেন, তাহা যথার্থ বটে, কেননা আমার এ পথ অবলম্বন করিলে প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, যেহেতু ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত এ পথের পান্থ হইতে কেহ সমর্থ হয় না। শম-বিশিষ্ট হওয়া মনুষ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ, কিন্তু মনুষ্য সকল ক্রমে কৃত্রিম ব্যবহার-প্রণালীর বশবর্ত্তী হওয়ায় আপন স্বভাবদোষে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ সহ্য করিয়া, অমূল্য শান্তি-সম্পত্তি হইতে পরাঙ্মুখ হইতেছেন। এক্ষণে সকলেই তাহাকে কষ্টসাধ্য বোধ করেন। কিন্তু যে মহাত্মা কুজন-সহবাস বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়-বশীকরণ দ্বারা সাধু-সঙ্গাবলম্বনে আমার এই নিত্যানন্দ পথের পথিক হইয়াছেন, তিনি জলে, স্থলে, লোকালয়ে, বিজনে, পূর্ব্বাহ্নে, সায়াহ্নে, নিশীথ সময়ে, সকলাবস্থায় সকল স্থানে সর্ব্বক্ষণ নিরুপমানন্দ ভোগ করিতেছেন। এরূপ একটি বাক্য নাই যে, সে আনন্দ ব্যক্ত করি। যাঁহারা সেই সুখশৈলারোহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, সে কিরূপ আনন্দ। অন্যে তাহা প্রকাশ করিতে সাধ্য কি?

বাছা রে! তুমি বিচার করিয়া দেখ, প্রেয় যে সকল সুখ যাহা বর্ণন করিলেন, সে সকল অস্থায়িনী ও আশুতোষিণী। ঐ আশুতোষিণী সুখধারা পরিণামে গরল-ময়ী হয়, তাহার সন্দেহ নাই। প্রত্যক্ষ দেখ, প্রেয়ঃ যে কুসুমের বর্ণন করিলেন, তাহা যে সময়ে প্রফুল্ল হয়, তাহার পর ক্ষণেই মলিন হইয়া যায়। সুখবিলাসিনী

ললনাগণের যৌবনাবস্থা পুষ্প হইতে আর অধিক কি? এই দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রেয়ঃ-পথের সমুদয় সুখ বুঝিয়া লও।

মুনিবর এই অবধি কহিয়া বসন্তকুমারকে জিজ্ঞাসিলেন, বাছা! বল দেখি, এই উভয়ের কোন্ পথ অবলম্বন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য? বসন্তকুমার কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া কহিলেন, তাত! প্রেয়ঃ-পদবী কেবল আশুতোষিণী। শ্রেয়ঃ-পথাবলম্বন করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। তপোধন প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়া কহিলেন, হাঁ সত্য বটে, কিন্তু আধুনিক মনুষ্য সকল, বিশেষতঃ সংসারিদিগের মধ্যে বিদ্বান্ ও ধনবান্ মহাশয়েরা, প্রেয়ঃপথের পথিকই অধিক, তবে যে বাহিরে সাধুবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সে কেবল লোকে খ্যাতিপ্রত্যাশায়, কিন্তু অন্তরে অন্য-প্রকার-ভাবান্বিত। পরচিত্ত অন্ধকার, ইহাও যথার্থ বটে, আবার কার্য্য দ্বারাও কাহারও আন্তরিক ভাব গোপন থাকে না। যদি সকলে স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া বলেন, তাহা হইলে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, কে কেমন সাধু।

বসন্তকুমার মুনির আশ্রমে এবংবিধ নানাপ্রকার শাস্ত্রালাপে বয়োবিদ্যায় বর্দ্ধিষ্ণু হইতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৎসগণ! বসন্তকুমার সাবদ্বাজ মুনির আশ্রয় পাইয়া বিবিধ বিদ্যায় বিভূষিত হইতে লাগিলেন। এ দিকে বিজয়চন্দ্রকে করিবর করবেষ্টন করিয়া ধাবিত হইল, তোমরা এইমাত্র শুনিয়াছ। পরে তাঁহার কি দশা হইয়াছিল, এ ক্ষণে বিস্তারিত-তাহাই বর্ণন করিতেছি, মনোনিবেশপূর্ব্বক শ্রবণ কর। অন্যমনস্ক হইলে কিছুই স্মরণ থাকিবে না।

যে সরোবরের কূলে বিজয়চন্দ্রকে করিবর করাবদ্ধ করে, তথা হইতে ছয়-ক্রোশান্তর বায়ুকোণে সুপ্রসিদ্ধ বিজয়পুর; উক্ত নগর অদ্যাপি বর্ত্তমান রহি-য়াছে। উহা রাজা রমণীমোহনের রাজধানী ছিল। নৃপতির যেরূপ পরমেশ্বর-পরায়ণতা ও উদার চরিত্র, তাদৃশ বিক্রম বা বিষয়-বুদ্ধি ছিল না। তাঁহার প্রধানা মহিষীর নাম সুশীলা। তিনি গুণানুরূপ রূপবতী ছিলেন না। কেবল বিবিধ বিদ্যা-ভূষণে ভূষিতা হওয়ায়, পতির মনোমোহিনী হইয়াছিলেন। মধুরস্বরের রূপ

কুৎসিত হইলেও গুণে যেমন লোকে মোহিত হয়, রাজাও তদ্রূপ প্রিয়তমার গুণে একান্ত বশীভূত ও বিমুগ্ধ ছিলেন। বস্তুতঃ গৃহিণীগণের যে সমস্ত গুণ থাকা আবশ্যক, রাজ্ঞী সে সমুদায়ের একাধার বলিলেও বলা যায়। রাজমহিষী বলিয়া তাঁহার কিছুমাত্র অভিমান ছিল না। তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া পরিবার এবং পরিচারিকাদিগকে ভোজন করাইতেন। পালিত পশু ও রোপিত বৃক্ষলতাদির তত্ত্বাবধান নিজে করিতেন। প্রতিবাসিগণের ভবনে উপস্থিত হইয়া দীনকে অর্থ, রোগীকে পথ্য, ভোগীকে উপদেশ, দিতেন। এই নিমিত্ত সকলেই তাঁহাকে জননীস্বরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। রাজ্ঞী অলীক গল্প করিয়া তিলার্দ্ধ সময়ও নষ্ট করিতেন না। অবকাশ-সময়ে পতির সহিত সমবেত হইয়া রাজ্যের শুভাশুভ ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য তর্কবিতর্কপূর্ব্বক স্থিরীকৃত করিতেন। বাস্তবিক, তিনি সর্ব্ববিষয়েই পতির সহকারিণী ছিলেন।

মহিষী যথাসময়ে একটী কন্যাসন্তান প্রসব করেন। অনুক্রমে জাতকর্ম্মাদি সমুদয় সংস্কার সম্পন্ন হইলে, রাজা তনয়ার বিমল-রূপলাবণ্য বিলোকনে বিমলা নাম রাখিলেন। বিমলা বৃদ্ধিশীল-বায়ু-বর্দ্ধিত তরঙ্গমালাতুল্য বৃদ্ধিশীলা হইতে লাগিলেন। রাজাঙ্গনা সুশীলা, কন্যাকে সুশীলা ও ঈশ্বরপরায়ণা করণাভিলাষে, পঞ্চবর্ষ বয়সে উপযুক্ত আচার্য্য-হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এই সময়ে সাম্রাজ্যের সামন্ত সমুদায়, ভূপতিকে নিতান্ত হীনবীর্য্য দেখিয়া, বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। চারি দিক্ হইতে এককালে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। রাজা দাবানল-বেষ্টিত দ্বিরদতুল্য ও বাড়বানল-বেষ্টিত সাগরবাসীর ন্যায়, একবারে ভয়ে বিহ্বল হইলেন। তাঁহার অন্তঃকরণে রণোৎস উৎসারিত না হইয়া বরং প্রস্থানস্রোত বহিতে লাগিল। বিপদে বিহ্বল হওয়া নাশের হেতু, ইহা বিবেচনা করিয়া রাজমহিষী নৃপতির নিকটবর্ত্তিনী হইলেন, এবং তাঁহাকে ধৈর্য্যশালী, সাহসী ও উৎসাহান্বিত করণার্থ, প্রিয়সম্বোধনে কহিলেন "মহারাজ! আপনি এত কাতর হইতেছেন কেন? বিপদ্ ও সম্পদ্ উভয়ই মনুষ্যেরা ভোগ করিয়া থাকেন। পরমেশ্বর জীবগণের মঙ্গলের নিমিত্তই অমঙ্গল সৃষ্টি করিয়াছেন। দুঃখ না থাকিলে সুখানুভব কে করিত? অতএব তিনি যাহা করেন, তাহাই আমাদের মঙ্গলের কারণ। পার-জিগমিষু যেমন তরণী অবলম্বন করে, তদ্রূপ বিপদ্-কালে সাহসাবলম্বন করা উচিত। কাপুরুষেরাই বিপদে ভীত হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা ধৈর্য্যাবলম্বনে কৌশলে কার্য্য সম্পন্ন করেন। বীর্য্যহীন লোকেরাই সময়ে সময়ে বিপদে বিহ্বল হয়, কিন্তু বীর পুরুষেরা আমোদ

জ্ঞান করিয়া তাহাতে অগ্রসর হন। শিবাগণ গজগর্জ্জনে শঙ্কাতুর হইয়া বিবরান্তরে প্রবেশ করে, কিন্তু সিংহ তাহাতে আনন্দ জ্ঞান করিয়া সমরে উপস্থিত হয়। যেমন, সময় উপস্থিত হইলে, অনল দাহন করিতে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতে, কিরণ-মালী কিরণ অর্পণ করিতে, পবন গমন করিতে, দেবরাজ দৈত্য দলন করিতে, বিরত হন না; তদ্রূপ ক্ষত্রিয়সন্তানগণ, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, যুদ্ধদানে কদাচ পরাঙ্মুখ হন না। রাজা যুদ্ধদানে বিরত হইলে ও ভয়প্রযুক্ত পলায়ন করিলে, রাজশ্রী-ভ্রষ্ট এবং ইহলোকে অকীর্ত্তিমান্ ও পরলোকে পাপভাজন হন। বীরপুরুষ যদি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সম্মুখ সংগ্রামে তনুত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি ঐহিকে কীর্ত্তিশালী ও পারত্রিকে ধর্ম্মশিখরবাসী হন। অতএব মহারাজ! যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া কদাচ পলায়ন করিবেন না।" রাজা প্রিয়বাদিনী প্রেয়সীর এরূপ উৎসাহবাক্যে উত্তেজিত হইয়া সমরোদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রাজাজ্ঞায় অস্ত্র শস্ত্র পরিষ্কৃত ও শাণিত, সেনা গজ বাজী পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত, রথ সংস্কৃত এবং আহারীয় দ্রব্য সঞ্চিত হইয়া দুর্গ পরিপূরিত হইল।

দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া রাজা রমণীমোহন, দুর্গরক্ষক সৈনিক দ্বারা দুর্গ দৃঢ়তর বদ্ধ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। পতিপ্রাণা সুশীলা পতির সাহস ও উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাঁহার সহচরী হইলেন। বিপক্ষের সম্মুখস্থ উপযুক্ত স্থানে শিবির সন্নিবেশিত হইল। নৃপতি কেবল বনিতার বুদ্ধি-কৌশলে সেনাশ্রেণী সংস্থাপন করিয়া অভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। কালাগ্নিসদৃশ যুদ্ধাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। কোন্ পক্ষে পরাজয়, কোন্ পক্ষে বিজয় হইবে, তাহার কিছুই নির্দ্ধারণ হইল না। উভয় পক্ষের দলবলই অপরিমিত পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। সৈন্যকোলাহলে, কোদণ্ড-টঙ্কারে, রথচক্র-শব্দে, গজগর্জ্জনে এবং হ্রেষারবে, রণ-স্থলী ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিল। এই কালে বিপক্ষপক্ষ হইতে হঠাৎ এক সুতীক্ষ্ণ সায়ক আসিয়া রাজার ললাটদেশ একবারে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া বাতোৎপাটিত বনস্পতির ন্যায়, কেশরি-কর-বিদীর্ণ-শিরা করীর ন্যায়, রথোপরি পতিত হইলেন। সারথি তৎক্ষণাৎ রথপ্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শিবিরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ভারতবর্ষীয় সেনা ও সেনানায়কগণের চিরপ্রসিদ্ধ প্রধান দোষ এই যে, রাজা যুদ্ধে মৃত বা হীনবল হইলে সহস্র সহস্র যোধ সত্ত্বেও তাহারা ভগ্নোৎসাহ ও শ্রেণী-ভঙ্গ হইয়া পলায়নপরায়ণ হয়। রাজা রমণীমোহনের সেনামধ্যেও তদ্রূপ গোলযোগ উপস্থিত হইল।

রাণী এই ঘটনায় নিতান্ত উৎকণ্ঠিতা হইলেন। এবং পতিবিয়োগ-শোকসাগর উদ্বেল হইয়া উঠিলেও, তৎকালে দুঃখ সংবরণ করিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বনে যুদ্ধসজ্জায় রণক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। তাঁহার তৎকালের ভীষণাকৃতি দেখিয়া সকলের বোধ হইতে লাগিল, যেন ভগবতী শ্যামাকৃতি হইয়া তুহিনাচলে দৈত্যদল দলন করিতে যাইতেছেন। রাজ্ঞী ব্যূহপ্রবেশপূর্ব্বক সৈন্যদিগকে উৎসাহ প্রদান করিয়া কহিলেন, "আমি পতিহীনা হইয়াছি বটে, কিন্তু পুত্রহীনা হই নাই। এখনও আমার সহস্র সহস্র পুত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারা কেহই হীনবীর্য্য নহে, সকলেই অপরিমিত-পরাক্রমশালী। হায়! এ কি সাধারণ দুঃখের বিষয়, আমি সহস্র-সহস্র-বীর-মাতা হইয়াও বিপক্ষের হস্তগতা হইব। আমার পুত্রেরা কি তাহা স্বচক্ষে দেখিবে! সংসারে যতপ্রকার সুখ আছে, স্বাধীনতা-সুখ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ। সংসারে যতপ্রকার দুঃখ আছে, পরাধীনতা-দুঃখ সকল হইতে দুঃসহ। হায়! আমার বীর্য্যবান্ সন্তানেরা কি পরাধীনতাশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইবে এবং দারুণ পরনিগ্রহ সহ্য করিবে! যে স্বর্ণময়ী বিজয়নগরী জয় করিতে ইন্দ্রসুত জয়ন্তও ভীত হইতেন, এ ক্ষণে কি সেই নগরী সামান্য সামন্ত-সমরে পরাজিত হইয়া অপহৃত হইবে! আমি সিংহপরাক্রমশালী এত অসংখ্য বীরের মাতা হইয়া এখন কি শৃগালভার্য্যা হইব!" মহিষীর এতাদৃশ খেদপূর্ণ উৎসাহ-বাক্য শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দল সৈন্যগণ, পদদলিত ভুজঙ্গ, তিরস্কৃত মাতঙ্গ, ঘৃতলগ্ন বহ্নি ও মেঘান্ত সূর্য্যের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বল বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। অতি অল্প ক্ষণেই বিপক্ষ-পক্ষ মহাভয়ে ভীত হইয়া স্থিরতরু-সদৃশ স্তব্ধ হইয়া রহিল। রাজ্ঞী পুনর্ব্বার সৈন্যদিগকে উৎসাহান্বিত করণাশয়ে বলিলেন, "ভগবান্ রামচন্দ্র একাকী দুর্জ্জয় রাবণকে পরাজয় করিয়া সীতা উদ্ধার করিয়াছিলেন। অজাত-প্রতিযোধ ধনঞ্জয় অসংখ্য নৃপকুল হইতে একাকী দ্রৌপদীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভগবান্ পরশুরাম পিতৃবৈরী ক্ষত্রিয়দিগকে একবিংশতি বার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া নিহত করেন। তোমরা তত্তুল্য সহস্র সহস্র যোদ্ধা কি জননী-স্বরূপা জন্মভূমিকে রক্ষা করিতে পারিবে না? তোমাদিগের পিতৃবৈরী এখন পর্য্যন্তও জীবিত রহিয়াছে?" প্রতিফল কিছুই প্রাপ্ত হইল না।"

পতিবিরহ-কাতরা মহিষীর এইরূপ খেদপূর্ণ উৎসাহ-বাক্য-শ্রবণে সৈন্যেরা, প্রবল পবনের ন্যায় ধাবিত হইয়া বিপক্ষের দুর্ভেদ্য ত্রিশূল-ব্যূহ ভেদ করিয়া ফেলিল। শত্রুরা অসহ্য পরাক্রম আর সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রেণীভঙ্গ-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়িত মৃগানুসরণে কেশরী যেমন ধাবিত

হয়, রাজা রমণীমোহনের সৈন্যগণ বিদ্রোহিদলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তদ্রূপ ধাবিত হইল। শিবিরোপরি বিজয়পতাকা উড্ডীন দেখিয়া রণজয়-সূচক বাদ্য বাজিতে লাগিল। সেনা ও সেনাপতিগণ, রণশ্রান্তি শান্তি করিয়া, শান্ত-প্রকৃতি-অবলম্বনে ক্রমে ক্রমে শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া, রাজার বিয়োগজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মহিষী নৃপতির মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুটী নেত্র হইতে অজস্র অশ্রুধারা নির্গত হইয়া রাজার অঙ্গ ধৌত করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে বোধ হইল, যেন অন্তঃসলিলা ফল্গু নদী পৃথিবীর অন্তস্তাপে উত্তাপিতা হইয়া সহস্রমুখী হইলেন। রাণী শোকমোহে মুগ্ধা হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হা নাথ! আমাকে অনাথিনী করিয়া একাকী কোথায় গমন করিলে? আমি তোমার মুখারবিন্দের মধুর সম্ভাষণ না শুনিয়া একবারে দশ দিক্ শূন্য দেখিতেছি। অনিবার্য্য শোক আমার শরীর জর্জ্জরীভূত ও হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। একবার গাত্রোত্থান কর, আমার সহিত কথা কহ, এবং আমাকে বাহু-লতা দ্বারা বদ্ধ করিয়া আলিঙ্গন কর। আমার তাপিত তনু শীতল হউক্।" রাজ্ঞী এইরূপ কহিতে কহিতে শোকমোহে মুগ্ধা হইয়া বাহুলতা দ্বারা পতিকে বেষ্টন করিয়া ধূলায় বিলুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণানন্তর নৃপজায়া জ্ঞানপ্রাপ্তা হইয়া কহিলেন, "হা জীবিতেশ্বর! জগদীশ্বর আপনার প্রতি প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়াছেন। আপনি বিপক্ষভয়ে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ-ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা করিলে পারত্রিকে পরমেশ্বরসমীপে দণ্ডনীয় হইবেন, আমি এই ভয়ে আপনাকে যুদ্ধপক্ষাবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। আপনি সম্মুখ সংগ্রামে শরীর ত্যাগ করিয়া পরম পিতার সহবাসের পাত্র হইলেন। কিন্তু আমাকে শোক-সাগরে পতি-নিধনরূপ-কলঙ্ক-তরঙ্গোপরি যাবজ্জীবন ভাসমান রাখিলেন।"

রাজ্ঞী এইরূপ বিলাপ করিয়া পতিসহগামিনী হইতে ইচ্ছাবতী হইয়া, চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। সৈন্যেরা চন্দনকাষ্ঠ আহরণ করিয়া সমাধিকুণ্ড প্রস্তুত করিল। পতিপ্রাণা সুশীলা পতির সহমরণে একান্ত উদ্যোগিনী হইলেন। চিতা-রোহণ করিতে যান, এমন সময়ে প্রধান সেনাপতি ধূম্রাক্ষ তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "মাতঃ! পিতা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন কি আপনিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন? আমরা কাহাকে আশ্রয় করিব? কে আমাদিগকে প্রতিপালন করিবে? আমরা কাহার জন্য

বহুপ্রাণী নিধন করিয়া রণজয়ী হইলাম? আপনি না থাকিলে অগত্যা পুনর্ব্বার আমাদিগকে পরাধীন হইতে হইবে, কিন্তু আমরা কখনই পর-নিগ্রহ সহ্য করিতে পারিব না, এই জ্বলন্ত-চিতারোহণ করিয়াই প্রাণত্যাগ করিব। তজ্জন্য আপনিই ঈশ্বরসমীপে দণ্ডনীয়া হইবেন।" কিন্তু রাণী ইহাতে নিবৃত্তা না হওয়ায়, সেনাপতি পুনর্ব্বার কহিলেন, "মৃত ভর্ত্তার অনুগামিনী হইলেই যে তাঁহার সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ হয়, তাহা নহে। যেহেতু, মানবমাত্রেই আপন আপন কর্ম্মানুযায়ি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এবং সহমৃতা হইলেই যে পতিব্রতা-ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, অন্যপ্রকারে হয় না, এরূপ নহে, বরঞ্চ ইহাতে আত্মহত্যা-মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। পতিব্রতা সহস্রপ্রকারে স্বকীয় পতিব্রতা-ধর্ম্ম প্রতিপালন ও পতি-ভক্তি প্রকাশ করিতে পারেন। সতীদিগের পতির প্রিয়কার্য্য-সাধন ও যথার্থরূপে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিলেই পতিব্রতা-ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইতে পারে; অনুমরণ-ধর্ম্মাপেক্ষা জীবিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত সহস্রাংশে উৎকৃষ্ট তাহার সন্দেহ নাই।" প্রধান সেনাপতির এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী পতির সহমরণে নিবৃত্তা হইলেন। রাজার অন্ত্যেষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইলে, মহিষী উক্ত স্থানে জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ এবং যুদ্ধ-বিবরণ তাহাতে ক্ষোদিত করাইলেন। অনন্তর রাজধানী প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক প্রধান মন্ত্রীর হস্তে রাজকার্য্য সমর্পণ করিলেন।

রাজ্ঞী মন্ত্রি-হস্তে রাজ্য-ভার সমর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু আপনি বিশেষ সতর্কতা ও পরিশ্রমপূর্ব্বক সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। এটী কেবল তাঁহার বিদ্যোপার্জ্জন ও জ্ঞানপরিমার্জ্জনের ফল। অবিদ্যাবতী সাধারণ রমণীকর্ত্তৃক এতদ্বৃহৎকার্য্য কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। তিনি রাজকার্য্যালোচনানন্তর পতির পাদুকা-দ্বয় পূজা করিতেন, এবং পতিকে ধ্যানপূর্ব্বক হৃদয়-ফলকে অঙ্কিত করিয়া, ভক্তিকুসুম ও শ্রদ্ধা-চন্দন তদীয় পদযুগে সমর্পণ করিতেন। পতির প্রেমে তদ্গতচিত্তা হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিতেন; নাথ! আর কত দিনের পর আমাকে আপন সহবাসিনী করিবেন? আমি কঠোর বিরহ-যাতনা সহ্য করিতে পারি না। অনন্তর পরমেশ্বরকে ধ্যান করিয়া কহিতেন, হে অন্তর্যামিন্! আমার অন্তরের ভাব তুমি সকলই জান, তথাচ প্রার্থনা করিতেছি, আমার মৃত্যু হইলে আমি যেন আমার স্বামীর সহবাসিনী হইতে পারি।

স্ত্রীজাতি এরূপ ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতনিষ্ঠা হইলে, পুরাণশাস্ত্রানুসারে পুনর্ব্বার দ্বিতীয়-বার পাণিগ্রহণ করা প্রয়োজন রাখে না। বস্তুতঃ স্বামিসহগামিনী অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতাবলম্বিনী সহস্রাংশে গুরুতরা ও দেবতার ন্যায় পূজনীয়া, তাহার সন্দেহ নাই।

রাজা রমণীমোহন, একটী করভকে শিশুকালাবধি প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং তাহার আহার ও স্নানাদি করাইতেন এবং সময়ে সময়ে গাত্র-কণ্ডূয়ন করিয়া দিতেন। যে যাহাকে স্নেহ করে, সেই তাহাকে ভালবাসে। আপ্যায়িত করিলে পরও আপনার হয়, এবং অনাপ্যায়িত হইলে আপনও পর হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আদর করিলে বন-বিহারী পশু পক্ষীও অনুগত হয়। রাজা হস্তিশাবককে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন; হস্তিশিশুও তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। তিনি যে স্থানে যাইতেন, ছায়ার ন্যায় প্রায়ই অনুগামী হইত। বিশেষতঃ করি-শাবক যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে নৃপতির অবগাহনসময়ে, বৃহদ্দন্তোপরি মণিমণ্ডিত সিংহাসন ধারণ করিয়া অবনীনাথের অপেক্ষা করিত। অমরনাথের ঐরাবতা-রোহণের ন্যায় অবনীপতি গজারোহণ করিয়া স্নানার্থ গমন করিতেন।

যুদ্ধে রাজার প্রাণ-বিয়োগ হইলে ঐ মাতঙ্গবর, শোকোন্মত্ত হইয়া ব্যাধ-তাড়িত কুরঙ্গের ন্যায় ধাবিত হয়। হস্তিপ সাধ্যানুসারে নিবারণ করিতে চেষ্টা করিল, বারণ কিছুতেই বারণ না মানিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর বিজয়-চন্দ্রকে বৃক্ষান্তরালে দেখিতে পাইয়া, মৃতনৃপতিকে জীবিতজ্ঞানে তাঁহাকে কর-বেষ্টন করিয়া শিরে ধারণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। করিবর নগর প্রবেশ করিলে, নাগরীয় জনগণ, ঐরাবতারোহণে বাসবের আগমন বিবেচনায়, হস্তীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। মহিলাগণ গৃহকার্য্যে নিরতা ছিল, এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র, পাককারিণী দর্ব্বী, ও বেশকারিণী অঞ্জনালক্ত, করে-করিয়া রাজপথে দণ্ডায়মানা হইল। একচিত্তে কোন রমণী বেণীবন্ধন করিতেছিল, অর্দ্ধবন্ধন না হইতেই বাম-বক্র-গ্রীবায় বামহস্তে অর্দ্ধবেণী-গ্রন্থি ধারণ করিয়া গবাক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল, গ্রন্থাবশিষ্ট কেশগুলি মুখোপরি পতিত হওয়ায়, একটী আশ্চর্য্য শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল, হঠাৎ বোধ হয় যেন চন্দ্রমা নীরদজালে অর্দ্ধাবৃত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে।

রাজমন্ত্রী প্রজাগণের আবেদন-পত্র পাঠ এবং রাজমহিষী যবনিকার অন্তরাল হইতে তাহা শ্রবণ করিতেছেন, এই কালে দন্তিবর পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ বিজয়চন্দ্রকে রাজসিংহাসনোপরি স্থাপন করিয়া সেনাগজগণের সহিত মিলিত হইল। তৎকালে বিজয়চন্দ্র অচৈতন্যাবস্থায় ছিলেন। দেখিয়া, মীনাহতি-রহিত নিস্তব্ধ নীর হঠাৎ আলোড়িত হইলে তদ্বাসী জন্তু যেমন বিচলিত হয়, সভ্যগণ সেইরূপ সচকিত হইয়া উঠিলেন। রাজমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ বিজয়চন্দ্রকে ব্যজন করিতে লাগিলেন, ভৃত্যেরা বারি আনিয়া তাঁহার চক্ষে ও মস্তকে সিঞ্চন করিতে লাগিল। রাজবৈদ্য

বিজয়চন্দ্রের চৈতন্যসম্পাদন জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইলেন। এবংবিধ শুশ্রূষায় তিনি অবিলম্বেই পুনর্ব্বার চৈতন্যাশ্রয় করিলেন। স্বাস্থ্যাবস্থায় জিজ্ঞাসিত হইলে, মন্ত্রীর নিকট আত্মপরিচয় আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণন করিয়া, বসন্তের নিমিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তৎকালে বিজয়চন্দ্র শোকে ও তাপে অত্যন্ত ভগ্নচিত্ত ও উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন, এবং এরূপ দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে, একপদ-গমনেও মোহ উপস্থিত হইত। সুতরাং তিনি স্বয়ং অনুজের অন্বেষণে অশক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ অনবরত অনুজচিন্তায় নিরত রহিল। রাজসচিব বসন্তকুমারের অন্বেষণার্থ বিজয়চন্দ্রের প্রদর্শিত পথে শত শত ভৃত্যকে দ্রুতগামী অশ্বারোহণে প্রেরণ করিলেন। পরতাপাদ্র সারদ্বাজ মুনিবর বসন্তকুমারকে আপন ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং অন্বেষণকারী ভৃত্যেরা ইতস্ততঃ বিস্তর তত্ত্ব করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বিমর্ষ মনে সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। বিজয়চন্দ্র সহোদরের মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া হৃদয়বিদীর্ণকর বাক্যে নানাবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বিলাপ শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী ও অন্তঃপুরিকাগণ, মন্ত্রী ও সভাস্থ সভ্য সমুদায়, অজস্র অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সমীপস্থিত তরুলতা সকল, ফল পুষ্প পত্র বিক্ষেপ করিয়া, যেন শোকচিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। রাজমন্ত্রী স্বয়ং বিজয়চন্দ্রের শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিলেন। প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া নানাপ্রকার শাস্ত্রীয়ালাপে তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিজয়চন্দ্রের বাক্পটুতা ও শাস্ত্রপারদর্শিতা দেখিয়া তাঁহাকে একজন অসাধারণ পণ্ডিত বিবেচনায় পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

প্রভাতীয় দীপশিখা যেমন ক্রমশঃ স্তিমিতভাব প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাণ হয়, শোকরূপ দীপ্ত শিখাও তদ্রূপ ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাণ হইতে থাকে। বিজয়চন্দ্র ভ্রাতার শোক ক্রমে বিস্মৃত হইয়া শরীরের স্বাস্থ্য জন্য পুষ্পোদ্যান প্রভৃতিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজতনয়া বিমলা, তাঁহার বিমল রূপে ও নির্ম্মল গুণে নিতান্ত অনুরক্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু স্ত্রীস্বভাব-সুলভ লজ্জাবশতঃ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। বুদ্ধিমতী মহিষী কন্যার ভাবাবলোকনেই সমস্ত বুঝিয়াছিলেন। এবং তিনি বিজয়চন্দ্রের দর্শনদিনাবধিই অনুজ্ঞাসম্প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই বস্তু পরস্পর অনুরূপ মস্থণ না হইলে যেমন সম্যক্রূপ যোগ হয় না, তদ্রূপ বর কন্যা উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রীতি সঞ্চারিত না হইলে, মিলন সুখকর হয় না। ইত্যাদি বিবেচনায়, বিমলার প্রতি বিজয়চন্দ্রের, ও বিজয়চন্দ্রের প্রতি বিম-

ন্যায়, প্রীতি অপেক্ষা করিতেছিলেন। এক্ষণে উভয়ের অনুরাগাবলোকনে আপ্ত ও আত্মজনদিগের আমন্ত্রণ করিলেন। আমন্ত্রিত অমাত্যগণ নিরূপিত দিবসে সভাস্থ হইলেন। বেশকারিকা রাজবালাকে সুসজ্জিত করিলে, বিমলরূপিণী বিমলা সপ্ত সখী সঙ্গে সপ্তচন্দ্র-বেষ্টিত বৃহস্পতি গ্রহের ন্যায়, সপ্তবর্ণসমবেত ইন্দ্রধনুর ন্যায়, সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া, সজ্জনের মনোরঞ্জন এবং বিষয়বিলাসীর চিত্ত-চকোর হরণ করিলেন। বর কন্যা সভায় উপস্থিত হইলে, পুরোহিত উভয়ের প্রতি উভয়ের কর্তব্য কর্ম্ম সমুদায় বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিলেন। তদনন্তর পাত্র কন্যা প্রতিজ্ঞাসূত্রে বদ্ধ হইলে, রাজ্ঞী বিজয়চন্দ্রকে কন্যারত্ন সম্প্রদান করিলেন। সভ্যগণ উভয়ের সম্মিলনে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বিধাতা এক রত্নেই অন্য রত্ন সম্মিলন করিয়া থাকেন। যেমন ইন্দ্রের অঙ্কে ইন্দ্রাণী ও বিষ্ণুর অঙ্কে কমলা শোভমানা হন, তদ্রূপ বিমলা বিজয়চন্দ্রের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া শোভমানা হইলেন। যদ্রূপ স্বর্ণগুণিকায় নীলকান্তমণি গ্রথিত হইলে, উভয়েরই উজ্জ্বলতা ও গৌরব বৃদ্ধি হয়, বিজয়চন্দ্র ও বিমলার মিলন হওয়ায় তদ্রূপ উজ্জ্বলতা ও গৌরব বৃদ্ধি হইল। এইরূপে বিবাহকার্য্য সম্পাদিত হইলে,বরকন্যা বাসরগৃহে প্রবেশ করিলেন। বাসরমণ্ডপ অপূর্ব্ব মণিমণ্ডিত, হীরক-খচিত ও ইন্দ্রধনুসদৃশ চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত হওয়ায় যথার্থই বাসব-বাসর সদৃশ হইয়াছিল। অন্তঃপুরচারিকাগণ, নানাপ্রকার বাদিত্রবাদনে সুগীতি-কীর্ত্তনে ও সুমধুর বাক্যকৌশলে মহিলামণ্ডপ আমোদিত করিয়া সমস্ত যামিনী জাগরণ করিল। বিজয়চন্দ্র বাদয়িত্রী ও গায়িকার নিপুণতায়, এবং উৎপরীক্ষিকার বাগ্মিতায় পরম পরিতুষ্ট হইলেন। সুখ-বিভাবরী বোধ হয় যেন শীঘ্রই বিভাত হইল।

এইরূপে বিবাহ-ক্রিয়া কলাপ সমুদায় সম্পাদিত হইলে রাজ্ঞী প্রজাগণের অনুমত্যনুসারে বিজয়চন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি রাজা হইয়া বিশেষ পরিশ্রমপূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে যুদ্ধানল একবারেই নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছিল। অতএব তিনি প্রজার হিতার্থেই সমুদয় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যে যে প্রদেশে জলকষ্ট ছিল, তথায় সরোবর খনন ও পয়োনালী প্রস্তুত করিয়া দিলেন; রাজপথ সমুদায় পরিষ্কৃত,বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মালয় ও অতিথিশালা স্থাপন এবং কারালয়ে শিল্পকার্য্য প্রচলিত করিলেন। বিজয়চন্দ্র স্বয়ং কারালয়ে উপস্থিত হইয়া বন্দীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। বিমলা স্ত্রী-কারালয়ে উপস্থিতা হইয়া, শিল্পবিদ্যা শিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে অনুরক্তা হইলেন। যেমন জনশ্রুতি আছে, স্পর্শমণি স্পর্শ করিলে লৌহ স্বর্ণ

হইয়া থাকে, তদ্রূপ দুরন্ত দস্যুদল ধর্ম্মোপদেশ পাইয়া কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎপথের পান্থ হইতে লাগিল। ইহাতে বন্দীগণের সঙ্খ্যা দিন দিন ন্যূন হইয়া কারাগার ক্রমে শূন্যাগার হইয়া উঠিল। সস্ত্রীক বিজয়চন্দ্রের এইরূপ দেশহিতকর কার্য্যে রাজ্যস্থ সমস্ত মনুষ্যই তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দেবতার ন্যায় পূজা করিতে লাগিল।

এইরূপে বিজয়চন্দ্র বিদ্যাবতী প্রিয়তমার সহবাসে একাসনে উপবিষ্ট হইয়াই, এক সময়ে, কখন ইতিহাস আলোচনাপূর্ব্বক দেশ বিদেশের মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা, কখনও ভূবিদ্যা আলোচনা করিয়া দেশবিদেশ-ভ্রমণ, কখন ভূতত্ত্ববিদ্যা পরিশীলন করিয়া অবনীগর্ত্তে গমন, কখন জ্যোতিঃশাস্ত্র আলোচনা করিয়া অন্তরীক্ষে বিচরণ, কখন পদার্থবিদ্যা ও ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঈশ্বরের প্রেমসমুদ্রে নিমজ্জন করিতে লাগিলেন। এতাদৃশ সুখের সন্নিধানে ইতরেন্দ্রিয়-সুখ কত অকিঞ্চিৎকর, যাঁহারা বিদ্যাবদ্ভার্য্য, তাঁহারাই জানিতে পারেন। নতুবা যেমন পতিবিলাসিনী পতিসহবাস-জনিত সুখ কুমারীকে প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না, তদ্রূপ বিদ্বদ্ভার্য্য আপন হৃদয়গত সুখরাশি অবিদ্বদ্ভার্য্যকে প্রকাশ করিয়া বলিতে সমর্থ হন না।

একদিন বিজয়চন্দ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া উদ্যানের তরুরাজির স্বতঃসিদ্ধ শোভা সন্দর্শন করিতেছেন, এমত সময়ে বিমলা নিকটবর্ত্তিনী হইয়া সুমধুর সম্ভাষণে কহিলেন, হৃদয়বল্লভ! বনরাজি, পশু ও দ্বিজজাতির স্বাভাবিক শোভা বিলোকন করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে। যদি আপনার অভিলাষ হয়, তবে চিত্ততোষ বিপিনে আমার পিতার যে প্রমোদ-মণ্ডপ আছে, তথায় কিছুকাল অধিবাস করিয়া স্বভাব-শোভা সন্দর্শন করি। বিজয়চন্দ্র প্রণয়িনীর সৎপ্রবন্ধে তৎক্ষণাৎ অনুমোদন করিলেন; এবং পর দিন উষা-সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া মহিষীর নিকট বিদায় লইয়া অত্যল্প অনুযাত্রীর সহিত সস্ত্রীক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। বিজয়চন্দ্র বীথী-দেশ দিয়া রথারোহণে গমন করিতেছেন, আরণ্যকগণ স্বতঃসিদ্ধ-সংস্কার-বশতঃ তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিমলা অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা কহিতে লাগিলেন, "দেখ নাথ! আপনাকে আগত দেখিয়া বনস্পতি ফল, পুষ্পবতী পুষ্প প্রসব করিয়া, গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চারদ্বারা গন্ধ বহন করিয়া, ময়ূর-ময়ূরী পক্ষপুট বিস্তার দ্বারা নৃত্য করিয়া, এবং হরিণীগণ চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া, উপহার প্রদান করিতেছে। আপনি [illegible] রাজভক্ত প্রজাগণের স্বতঃসিদ্ধোপহার গ্রহণ করুন।" বিজয়চন্দ্র ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! ইহারা কেহই রাজভক্ত নহে, সকলেই চোর ও প্রবঞ্চক। ঐ দেখ,

রম্ভাতরু তদীয় উরু, দাড়িম্ব পয়োধর, হরিণী নয়নযুগল, চামরী কেশজাল, ভুজঙ্গিনী বেণীবন্ধন, ময়ূরী অম্বর, মরালিনী গমন, পিকবর বচন, খঞ্জনী নৃত্য, যূথী জাতী অঙ্গরাগ ও সৌগন্ধ, হরণ করিয়া, আমাকে বঞ্চনা করিতেছে।" বিমলা হাস্য করিয়া কহিলেন, এই জন্যেই আমি আপনাকে প্রিয় সম্বোধন করিয়া থাকি। এবংবিধ মধুরালাপে তাঁহারা প্রমোদ-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

বিজয়চন্দ্র বিপিনবিহারিগণের বিবিধ বিলাস বিলোকন করিতে করিতে নিত্য নূতন সুখানুভব করিতে লাগিলেন। একদা অপরাহ্নে অকস্মাৎ তাঁহার চিত্তবিকার উপস্থিত হওয়ায় তিনি নিতান্ত অসুস্থ হইলেন। কি নিমিত্ত তাঁহার এরূপ দশা হইল, তন্নিবন্ধন নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছেন, এই কালে নিদ্রা তাঁহার নেত্রোপরি আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে একেবারে বিচেতন করিল। পতিপ্রাণা বিমলা পতিকে অসুস্থ দেখিয়া তাঁহার চৈতন্যাপেক্ষায় অঙ্কদেশে পদযুগল স্থাপনপূর্ব্বক শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে নিশীথ সময় উপস্থিত হইল। দিবাচরগণ নিদ্রায় বিচেতন হওয়ায়, রাত্রিচরগণ ভীষণ শব্দ করিতে করিতে বহির্গত হইয়া নিঃশব্দে ইতস্ততঃ আহারান্বেষণ করিতে লাগিল। ভূমণ্ডল ঝিল্লীরবে শব্দায়মান এবং গগনমণ্ডল নিস্তব্ধ ও তারকামালায় খচিত হইল। দীপশিখা ক্রমশঃ স্তিমিতভাব অবলম্বন করিল। এই ঘোর যামিনী-কালে বিজয়চন্দ্র স্বপ্নে অবলোকন করিলেন, যেন বসন্তকুমার তরুতলে পতিত হইয়া জলের জন্য 'ত্রাহি ত্রাহি' করিকরিতেছে। অমনি তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। উত্তাপে বস্তুমাত্রই তরল হইয়া বিস্তৃত হয়; শোকোত্তাপে তাঁহার পূর্ব্ব দুঃখ-সিন্ধু নবীভূত হইয়া একবারে উচ্ছলিত হইল। তিনি অমনি শয্যা হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক ভূতলে পতিত হইলেন এবং 'বসন্ত রে, বসন্ত!' এই শব্দ করিয়া দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক অরণ্যাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পতিপ্রাণা বিমলা পতির তদবস্থা অবলোকন করিয়া প্রথমতঃ চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর কারণজিজ্ঞাসু হইয়া প্রত্যুত্তর না পাওয়ায় অগত্যা অনুগমন করিলেন। দৌবারিক কর্ম্মচারী ও দাসীগণ ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল সুতরাং তাহারা তৎকালে কিছুই জানিতে পারে নাই, এবং রাজতনয়া বিমলাও, কাহাকে আহ্বান করিতে অবকাশ পান নাই।

বিজয়চন্দ্র ক্রমে ক্রমে নিবিড়ারণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। রাজদুহিতা বিমলাও ছায়ার ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহাদিগের সেই সময়ের ভাব নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয়, যেন শান্তি-দেবী ক্রোধ-সিংহের পীড়নে পীড়িতা হইয়া ধর্ম্মের পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন। পুরুষজাতি সবল, বালা-

কুল সহজেই অবলা; তাহাতে আবার কণ্টক কঙ্করে বিমলার পদতল ক্ষত বিক্ষত হওয়ায় রক্তপাত হইতে লাগিল। সুতরাং তাঁহার গতি ক্রমশই মন্থর হইয়া আসিল। এই অবকাশে বিজয়চন্দ্র তির্য্যক পথে গমন করায় প্রিয়তমার অদৃশ্য হইলেন। পতিপ্রাণা বিমলা পতিকে দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বারংবার আহ্বান করিতে করিতে দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। পথশ্রান্তি-যাতনা অপেক্ষা পতির অদর্শন-যাতনা সমধিক বোধ হওয়ায়, ভয়াকুল-কুরঙ্গী-নয়নোপম তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অনর্গল অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল।

বিমলা ক্রমে ক্রমে এইরূপ গমন করিয়া এক ত্রিশির বর্ত্মে উপনীতা হইলেন। বিমলাকে পথ-প্রদর্শন করিতেই যেন এই সময়ে রজনী প্রভাত হইল। মন্দ মন্দ বায়ু-সঞ্চরণে বৃক্ষপত্র হইতে নিশির শিশিরবিন্দু স্খলিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন তরুমণ্ডলী সকল বিমলার দুঃখে দুঃখিত হইয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছে। বৃক্ষবাসী বিহঙ্গ সকল মধুরস্বরে গান করিতে আরম্ভ করিলে বোধ হইল, যেন বনবাসী তরুগণ বিমলার শোকে শোকান্বিত হইয়াই করুণস্বরে রোদন করিতেছে। প্রাতর্ব্বায়ু সেই শব্দ বহন করিয়া বিপিন-বিহারী ধরাশায়ী নিদ্রিত জীবদিগকে মৃদু-মন্দভাবে বলিতেছে—জাগরিত হইয়া বিমলাকে আশ্রয় প্রদান কর; যেন তাহারা সেই শব্দ শ্রবণেই ক্রমে ক্রমে গাত্রোত্থান করিয়া ইতস্ততঃ চঞ্চল দৃষ্টি করিতে লাগিল। বিমলা ত্রিশির বর্ত্মে দণ্ডায়মানা হইয়া যূথভ্রষ্ট চিত্রাঙ্গিণীর ন্যায় ইতস্ততঃ চঞ্চল দৃষ্টিপাত করিয়া পতিগমন-পথ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; এবং ব্যাকুল হইয়া আরণ্যকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে বৃক্ষ-বনস্পতে! হে গুল্ম লতে! হে পশু-পক্ষি! হে বনদেবতে! আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার পতির গমন পথের প্রদর্শক হও।" উষার তুষাররাশি দূর্ব্বাদলে উজ্জ্বল মুক্তার ন্যায় বিকীর্ণ ছিল। তাহার উপর দিয়া গমন করায় বিজয়চন্দ্রের পদাঙ্ক হইয়াছিল। বিমলার দুঃখে দুঃখিত হইয়া সেই পদাঙ্ক বিজয়চন্দ্রের গমন-পথ প্রত্যক্ষবৎ দেখা-ইতে লাগিল। কিন্তু তিনি ভ্রম-বশতঃ বিবেচনা করিতে না পারিয়া বিপরীত পথাবলম্বিনী হইলেন; সুতরাং পতির সহিত তাঁহার সম্মিলনের আর সম্ভাবনা রহিল না। তিনি মণিহারা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় স্খলিতবেণী-বন্ধনে, কুরঙ্গহারা কুরঙ্গিনীর ন্যায় চঞ্চল-নয়নে, মাতঙ্গহারা মাতঙ্গিনীর ন্যায় বিচলিতচরণে, বারং-বার প্রিয়পতি সম্বোধনে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে অপরাহ্ণ সময় উপস্থিত হইল। তখন শোক ও ভয়ে একেবারে জড়ীভূতা হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "হে জগদীশ্বর, তুমি জলে স্থলে শূন্যে সর্ব্বত্র সমানভাবে বিরাজমান

রহিয়াছ, কেবল আমরাই অজ্ঞান-বশতঃ দেখিতে পাই না। এই নিবিড়ারণ্যে তুমি আমার পতির নিকটেও রহিয়াছ এবং আমাকেও রক্ষা করিতেছ। অতএব অনাথিনীর প্রার্থনা—আমার সতীত্ব এবং পতির জীবন রক্ষা কর।" এইরূপ কহিতে কহিতে গমন করিলেন। পরে একটী মণিমণ্ডিত মন্দির দেখিয়া জনবাস বিবেচনায় তদন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জনশূন্য স্থান। উক্ত মন্দিরের প্রান্ত-দেশ দিয়া একটি পর্ব্বত-নির্ঝর বনান্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং মন্দির হইতে নির্ঝরি-নীর পর্য্যন্ত একটী সোপানও নির্ম্মিত আছে। নিতান্ত অবসন্না বিমলা নীর-নিকট-বর্ত্তী অধিরোহণে উপবিষ্টা হইয়া, "হে করুণাময় জগদীশ্বর! রক্ষা কর" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; বোধ হইল, যেন তাঁহার সেই রোদন শ্রবণে মহীধর করুণার্দ্র হইয়া নির্ঝরিণীরূপে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে।

এ দিকে প্রমোদমন্দিরবাসী পরিচারকগণ প্রাতঃকালে বিজয়চন্দ্র ও বিমলাকে দেখিতে না পাইয়া আশ্চর্য্য বিবেচনায়, কতকক্ষণ তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রাজধানীতে দূত প্রেরণ করিল, এবং ইতস্ততঃ অরণ্যাভ্যন্তরে অন্বে-ষণ করিতে লাগিল।

বৎসগণ! মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। এক্ষণে পুনর্ব্বার বসন্তকুমারের কথা আরব্ধ হইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

একদা ভারদ্বাজ মুনি আশ্রম-তরুতলে কুশাসনে উপবেশন করিয়া বনবাসিনী মুনি-মহিলাদিগকে পতিব্রতা ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন, বৃহস্পতিচক্রের নক্ষত্র-চক্র সদৃশ, বসন্তকুমার ও অন্যান্য ঋষিপুত্রেরা মুনিরাজকে পরিবেষ্টন করিয়া, তদীয় বদন-বিগলিত বিমল বাক্যাবলী দ্বারা হৃদয়কোষ পূর্ণ করিতেছেন। অকস্মাৎ একটি মৃগশাবক তথায় উপস্থিত হইয়া, আম্র-বৃক্ষাশ্রিত মাধবীলতাকে বারংবার আকর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহাকে পাতিত করিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া বসন্তকুমার স্বীয় বয়স্যদিগের সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখে! ঐ দেখ, পিতার উপদেশের গুণে আশ্রমবাসিনী লতাও পতিব্রতা হইয়াছে; হরিণশিশু বৃক্ষবাহিনী মাধবীলতাকে বারংবার আকর্ষণ করিয়াও বিচ্ছিন্ন করিতে পারিতেছে না। তচ্ছ্রবণে ভারদ্বাজ মুনিবর ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বসন্ত! মৃগশাবক-

টিকে বন্ধন করিয়া দূরে রাখ, নতুবা ও মাধবীকে আরও উৎপীড়ন করিবে। বসন্তকুমার মৃগশিশুকে বন্ধন করিতে উদ্যত হইলেন; এই কালে আনন্দনগরাধিপতি আনন্দময় নৃপতির দূত আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং মুনিরাজের পদদ্বয়ে প্রণতি পূর্ব্বক, তাঁহার হস্তে একখানি লিপি অর্পণ করিল।

তিনি আগ্রহাতিশয়-সহকারে পাঠ সমাপন করিয়া হর্ষোদ্গত বচনে বসন্তকুমারকে কহিলেন, বৎস! মহারাজ আনন্দময় বিশেষ কোন পরামর্শ জন্য আমাকে লিপি দ্বারা আহ্বান করিয়াছেন। আমি তদীয় সৌজন্যগুণে আবদ্ধ আছি, সুতরাং বিপন্ন পুত্রের আহূত পিতার ন্যায়, তথায় যাইতে ব্যগ্র হইয়াছি। অতএব অদ্য নিশাবসানে নরনাথকে আশীর্ব্বাদ করিতে গমন করিব। আনন্দ নগরী, দেবরাজের অমরাবতীর ন্যায়, ভারতের অলঙ্কার-স্বরূপ; যদি দেখিতে তোমার অভিলাষ থাকে, তবে আমার সহচর হইলে বাসনা পূর্ণ হইবে। মুনিবর এই কথা বলিয়া সায়ংসন্ধ্যা-বন্দনে তটিনীতট-বিহারে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই, প্রবল বায়ুর বিশ্রামকালের ন্যায়, দশ দিক্ নিস্তব্ধ করিয়া ক্রমান্বয়ে শান্তি সুখদায়িনী রজনী উপস্থিতা হইল। বসন্তকুমার রাজপুত্র বটেন, কিন্তু শৈশব-কাল হইতে আশ্রমে প্রতিপালিত হইয়াছেন, সুতরাং লোকালয়ের আচার ব্যবহার কিছুই জানেন না, এক্ষণে শয়নাসন গ্রহণ করিয়া নগরের আকৃতি ও রাজার প্রকৃতি প্রভৃতি নানাপ্রকার নাগরিক ভাব চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রার ক্রোড়শায়ী হইলেন।

রজনী প্রভাতে ভারদ্বাজ মুনি আহ্বান করিলে, বসন্তকুমার পর্য্যটকদিগের দেশ-দর্শনের ন্যায়, আনন্দনগর পরিদর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া মুনি সমভি-ব্যাহারে গমন করিলেন। যাত্রাকালে তাঁহার ভ্রু-নস স্পন্দন হইতে লাগিল। তিনি পরিণয়ের মাঙ্গলিক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আশ্রম-তরুকে উদ্যানলতা আশ্রয় করিবে এ নিতান্ত অসম্ভব; অথবা অঘটন ঘটনই বিধাতার কার্য্য। যথাকালে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজবর্ত্মের দুই পার্শ্বে দৃষ্টি করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন। ধনাঢ্য বণিকদিগের শোভনোত্তম হর্ম্ম্য, প্রাচীনগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, ধর্ম্মমন্দির, দুর্গ প্রভৃতি অলঙ্কারে আনন্দনগর মনোমোহন রূপ ধারণ করিয়াছে। ললনারা শ্রীমতী, সুমতি, লজ্জাবতী ও অতিথিশীলা। অত্রত্য জলবায়ু স্বাস্থ্যকর, ভূমিখণ্ড অত্যুর্ব্বর ও নানাজাতীয় ফল-পুষ্প-শস্যে পরিপূর্ণ। বসন্তকুমার রাজধানীর এইরূপ অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই স্থান আনন্দ-নগর নামে

বিখ্যাত, বাস্তবিক ইহা আনন্দময়ই প্রত্যক্ষ হইতেছে। এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর নগর অতি বিরল।

সারদ্বাজ মুনিবর, ভগবান্ রামচন্দ্রের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের ন্যায় নরেন্দ্র-সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। রাজা, নির্ব্বাসিত জনের অকস্মাৎ প্রিয়সমাগমের ন্যায় আনন্দিত হইয়া মুনিরাজকে প্রণাম প্রদক্ষিণপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিতে কহিলেন। তিনি বসন্তকুমারের সহিত একাসনে উপবেশন করিলেন। রাজা তপোবনের কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি সমস্তমঙ্গল বলিয়া, প্রতিপ্রশ্নে রাজ্যের কুশল অবগত হইলেন। রাজা বসন্তকুমারকে ঋষিবেশধারী এবং স্বাগত ঋষির সহিত একাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া, ইনি ঋষির প্রিয়শিষ্য অথবা কোন তেজস্বী তপস্বীর পুত্র হইবেন, এই বিবেচনায় মহর্ষিকে তদীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বসন্তকুমারের সবল শরীরকান্তি, আজানুলম্বিত কোমল বাহুযুগল, প্রশস্ত ললাটদেশ, ঈষদ্রক্ত বিশাল নেত্রদ্বয়, অসীমসাহস-পূর্ণ মুখশ্রী, গম্ভীরাকৃতি, উদার প্রকৃতি এবং বাক্যবিন্যাসে রসনার পটুতা ও সাহসিকতা দেখিয়া ক্ষত্রিয়-ভ্রমে বারংবার তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গগনমণ্ডলের ভাব পরিদর্শনে বহুদর্শী নাবিকেরা যেমন ঝটিকাব ও বৃষ্টিপাতের নির্ণয় করে, তদ্রূপ সারদ্বাজ মুনি বসন্তকুমারের প্রতি রাজাকে বারংবার দৃষ্টিপতে করিতে দেখিয়া তদীয় মানস বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বসন্তকুমার রাজার নিকট পরিচিত হন, তাঁহার এরূপ ইচ্ছা ছিল না। রাজা পাছে জিজ্ঞাসা করেন, এই ভয়ে তিনি পূর্ব্বেই তাঁহাকে আপন আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভূপতি কহিলেন, ভগবন্! আমার দুহিতা সুকুমারী উদ্বাহযোগ্যা হইয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, তুল্য-গুণ-রূপ সুযোগ্য-ভাজনে সম্প্রদান করিব। কিন্তু অমাত্য তদ্বিষয়ে দোষ কীর্ত্তন করিয়া আমাকে এককালে নিরুৎসাহ করিয়াছেন। বস্তুতঃ সম্প্রদান ও স্বয়ংবর, এ উভয়ের তারতম্য কিছুই স্থির হইতেছে না। তজ্জন্য আমি আপনাকে আহ্বান করিয়াছি, আপনি যাহা স্থির করেন, তাহাই আমার কর্ত্তব্য।

মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! অমাত্য উদ্বাহবিষয়ে যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত বটে; কেননা পরিণয় পরিণামে তাদৃক্ সুখাবহ না হইয়া বরং অশেষ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, পিতা মাতা, কুটিল শাস্ত্রকারদিগের মতাবলম্বী হইয়া, তনয়া কন্যাকাল প্রাপ্ত না হইতেই, আপন মনোমত পাত্রে সম্প্রদান করেন। দুহিতা পরিণেতার প্রতি অনুরক্তা হইলে কোন

কথাই থাকে না; কিন্তু যদি দম্পতীর ভিন্নাভিপ্রায়বশতঃ পরস্পর প্রণয় না হয়, তাহা হইলে যে কি অসুখের কারণ, তাহা অন্যের উপলব্ধি করিবার সাধ্য কি? যাঁহাদের দম্পতীর পরস্পর মানসানৈক্য, তাঁহারাই ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

ধর্ম্ম-শাস্ত্রবেত্তারা লিখিয়াছেন, কন্যা যে পর্য্যন্ত পতিমর্য্যাদা ও পতির সেবা শুশ্রূষা সম্যগবগত না হইবেন, জ্ঞানবান্ পিতা তদবধি আপন দুহিতার বিবাহ দিবেন না। যদি সুকুমারী বিদ্যাবতী এবং পতিমর্য্যাদা জ্ঞাত হইয়া থাকেন, তবে দময়ন্তী ও সাবিত্রী প্রভৃতি রাজতনয়াদিগের ন্যায়, আপন অনুরূপ বরে স্বয়ংবরা হন, সেই ভাল। নতুবা মহারাজ স্বেচ্ছানুসারে যে কোন পাত্রে সম্প্রদান করিলে, পরিণামে অসুখের কারণ হইতে পারে সন্দেহ নাই। কত শত পরিবারের মধ্যে দেখা যাইতেছে, এইরূপ সম্প্রদান হেতু স্বামী স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত, অথবা স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিরক্তা হন, তজ্জন্য কত অনর্থের মূলোৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব মহারাজ! সম্প্রদান বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিয়া স্বয়ংবরোদ্যোগ পাওয়াই যুক্তিসিদ্ধ।

রাজা কহিলেন, আপনার যে অভিপ্রায়, তাহাই আমার প্রামাণ্য ও কর্ত্তব্য। সম্প্রতি প্রার্থনা, সুকুমারীর স্বয়ংবর পর্য্যন্ত আপনি অত্র অবস্থান করুন, তাহা হইলে আমাকে পরমাপ্যায়িত করা হয়। মুনিবর কহিলেন, মহারাজের এই অভ্যর্থনায় আমি সম্মত হইলাম।

অনন্তর রাজা সরোদ্যানে ঋষিরাজকে বাসস্থান প্রদান করিতে অনুচরদিগকে অনুজ্ঞা করিলেন। মহর্ষি বসন্তকুমারের সহিত নিরূপিত বাসস্থানে গমন করিলে, রাজা কহিলেন, অমাত্য! এক্ষণে শুভ দিন নির্ণয় করিয়া দেশদেশান্তরীয় নৃপতি ও বুধগণকে আহ্বানহেতু স্বয়ংবরসূচক নিমন্ত্রণ-পত্রীর সহিত ভট্টদিগকে প্রেরণ কর, এবং দুর্গপ্রান্তরে স্বয়ংবরার্থ সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিতে কর্ম্মকরদিগকে নিয়োজন কর। প্রজেশ এই আদেশ প্রদান করিয়া অবরোধে গমন করিলেন। অমাত্য আনুপূর্ব্বিক সকল কর্ম্মের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ আনন্দময় যে উদ্যানে সারদ্বাজ মুনির বাসস্থান নিরূপিত করিয়া দিলেন, সেই উদ্যানটী রাজান্তঃপুরসংলগ্ন উত্তর ভাগে স্থাপিত। তাহার চতুর্দ্দিক্ ইষ্টক-নির্ম্মিত দৃঢ় প্রাচীরে আবদ্ধ; পূর্ব্ব দিকে একটী প্রবেশদ্বার ও মধ্যস্থলে বৃহৎ পুষ্করিণী। সেই সরোবরের মধ্যদেশস্থ আশ্চর্য্য কৌশলসম্পন্ন ত্রিতল অট্টালিকা অপূর্ব্ব শোভার আকর। তাহা দেখিলে বোধ হইত, একখানি স্ফটিক-ফলকে সৌধশিখর চিত্রিত রহিয়াছে। ঐ সরোবরের নির্ম্মল সলিলে অট্টালিকার প্রতিচ্ছায়া পতিত হইলে, বোধ হইত, নির্ম্মলাকাশে সৌধমালা নির্ম্মিত হইয়াছে; অথবা অভি-

মুগ্ধ-বধে সপ্তরথীর ন্যায়, ব্যূহবদ্ধ হইয়া দেবতারা ব্যোমযান-আরোহণে শূন্যপথে উড্ডীয়মান হইতেছেন। বায়ুপ্রভাবে যখন সেই সরসী-সলিলে তরঙ্গ উঠিত, তখন আবার বোধ হইত যেন সসাগরা সপ্তদ্বীপাধিপতি সগর রাজার অর্ণবপোত গভীর সমুদ্র-কল্লোলে বিচলিত হইতেছে। ঐ অট্টালিকার অধিরোহিণী, চন্দ্রালোক-পতিত নির্ম্মল জল-তরঙ্গতুল্য বিচিত্র শোভান্বিতা ছিল। রাজা এই অট্টালিকায় উপবেশন করিয়া সারদ্বাজ মুনির সহিত রাজ্যসংক্রান্ত মন্ত্রণা ও ধর্ম্মালাপ এবং শুভকার্য্যোপলক্ষে সপরিবারে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। কোন কোন সময় সারদ্বাজ মুনিও ঐ দেবদুর্ল্লভ গৃহেই রাজান্তঃপুরিকাদিগকে পতিব্রতা-ধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্ম উপদেশ দিতেন। বস্তুতঃ ঐ উদ্যানটী রাজার মন্ত্রোদ্যান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। উদ্যানের দক্ষিণ দিকে অন্তঃপুর-সংযুক্ত গুপ্ত দ্বার দিয়া পুরবাসিনিগণ যদৃচ্ছাক্রমে উদ্যান-বিহারে আসিতেন। সুতরাং রাজার অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি উদ্যানে গমন করিতে পারিতেন না। সৌধগর্ভ সরোবরের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থলভাগে, শ্বেত, পীত, নীল, লোহিতাদি নানাবর্ণের পুষ্প পাদপ, এবং অম্ল-মধুরাদি নানা রস-সংযুক্ত ফলবান্ বৃক্ষ যথানিয়মে আরোপিত থাকায়, মন্ত্রোদ্যান যার পর নাই সুরম্য হইয়াছিল। বসন্তকুমার মুনিরাজের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া সরোগর্ভস্থ সৌধ-শোভাবলোকনে চমৎকৃত ও বিমোহিত হইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ সারদ্বাজ, মন্ত্রোদ্যানে রাজার যে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, ক্রমান্বয়ে বসন্তকুমারকে তাহার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়দ্দিন গত হইল।

একদা আনন্দময় নৃপতির কুমারী সুকুমারী, উমা ও চন্দ্রিমা দুই সহচরী সমভিব্যাহারিণী হইয়া, কুমুদ ও কোকনদ পরিবেষ্টিত নলিনীর ন্যায়, যামিনীযোগে শয়নালয়ে নিদ্রিতা আছেন। নিশীথসময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল তিনি ; চন্দ্রিমাকে জাগরিতা করিয়া কহিলেন, সখি চন্দ্রিমে! স্বপ্নে কি আশ্চর্য্য দেখিতেছিলাম আহা! চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তাহার কিছুই দেখিতেছি না, জলবিম্ব-প্রায় কোথায় লুক্কায়িত হইল। চন্দ্রিমা চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, সুকুমারি! কি স্বপ্ন দেখিতেছিলে, যদি গোপন করিবার না হয়, তবে বল শুনি। সুকুমারী কহিলেন, সখি! যে বলে ঈশ্বরকে জানিয়াছি, সে যেমন ঈশ্বর-তত্ত্বের কিছুই জানে না, তদ্রূপ যে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সখিগণের নিকটে মনোগত ভাব প্রকাশ না করে, সে সখ্যভাবের মধুর-রসাস্বাদনে বঞ্চিত আছে। আমি কি কখন তোমাকে কিছু গোপন করিয়াছি? চন্দ্রিমা কহিলেন, না তা নয় ; কোন কোন রমণীরা বলেন, লোকে এরূপ স্বপ্নও দেখিয়া থাকে, তাহা প্রকাশ করিলে তাহার আপ-

নারই অমঙ্গল হয়; তাই তোমায় ভাই 'যদি গোপন করিবার না হয়, তবে বল', এরূপ বলিয়াছি। সুকুমারী কহিলেন, সে সকল অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের বাক্যে বিশ্বাস করিতে নাই। আমি স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছি, অবিকল তাহাই বলি. শ্রবণ কর। সখি! আমি যেন তোমাদের সঙ্গে উপবনে গিয়াছিলাম; তোমরা যেন সহকার-তরুতলে মাধবীলতা-চ্ছায়াতে বিশ্রাম করিতে বসিলে; আমি একাকিনী সরোবর-তটবর্ত্তিনী হইয়া দেখিলাম, একটী পরম সুন্দর পুরুষ ভ্রমণ করিতেছেন। অকস্মাৎ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়ায় বোধ হইল, অনঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাইয়া দেশ-ভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন, অথবা কুমুদবন্ধু প্রণয়িনী কুমুদিনীর প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়া আকাশ ছাড়িয়া ভূতলে প্রকাশ পাইয়াছেন এবং কুমুদিনীকে প্রমোদিনী করিয়া আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন। এই বিষম ভ্রম দূরীকরণ ইচ্ছায় অনিমিষ-চক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিলাম। চন্দ্রিকাতুল্য তাঁহার অঙ্গের অমল কোমল প্রভায় আমার হৃদয়-কুমুদ প্রসন্ন এবং নয়নচকোর সুধা-পিপাসু হইয়া অনিমিষ হইল; কাজেই আমি তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইলাম। সেই পুরুষোত্তম আমাকে দেখিবামাত্র কহিলেন, সুন্দরি! তুমি কে? কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? তাঁহার এই বাক্য শ্রবণে আমি লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা ধরা খনন করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে উত্তর-দানে পরাঙ্মুখী দেখিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরে কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। এইরূপ বাক্য শ্রবণে আমি জিজ্ঞাসু হইলে, তিনি আনুপূর্ব্বিক পুরাবৃত্ত বিস্তার করিয়া বলিতেছিলেন, এই কালে নিদ্রাভঙ্গ হইল। হায় সখি! সেই পূর্ণেন্দু কোথায় লুকাইল? নয়ন-চকোর জাগরিত হইয়া আর দেখিল না। সখি! তোমরা স্বচক্ষেই দেখ, আমার নয়ন তাঁহার দর্শন-বিরহে ব্যাকুল হইয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতেছে। কি আশ্চর্য্য! মনঃষট্পদ মধুমত্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গেই গিয়াছে। এ কি বিপরীত! ভৃঙ্গ-বিরহে হৃদয়-নলিনী বিদীর্ণ হইতেছে! দেখ চন্দ্রিমে! আমি কি আপন ধনে আপনি চোর হইলাম।

চন্দ্রিমা কহিলেন, সুকুমারি! বৃথা স্বপ্ন দেখে কেন ক্ষিপ্ত হইয়াছ? স্বপ্ন কি কখন সত্য হয়? ছি! ছি! লোকে ইহা জানিতে পারিলে, কি না কলঙ্ক-সম্ভাবনা, ও কথার আলোচনা হইতে ক্ষান্ত হও। উমা কহিলেন, চন্দ্রিমে! সুকুমারীর স্বপ্নের মর্ম্ম কিছু বুঝেছ? চন্দ্রিমা কহিলেন, না সখি, আমি ত কিছুই বুঝি নাই, তুমি কি বুঝিয়াছ বল শুনি। উমা কহিলেন, সুকুমারী সর্ব্বক্ষণ উত্তম বর ভাবনা

করে, কাজেই স্বপ্নেও তাহাই দেখেছে। সুকুমারী কহিলেন, উমে! আমি ত স্বপনে দেখিয়াছি, তুমি জাগিয়াই নিত্য নূতন বর দেখ। সে যাহা হউক, সখি! তোরা কলঙ্কের শঙ্কা করিতেছিস্ কেন? স্বপ্ন কখন সত্য নয় বটে, কিন্তু যদি কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে অঘটন ঘটনই হয়, তবে ছি! অভিসারিকার ন্যায় আমি তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইব কেন? স্বয়ংবরা হইলেও আমার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে।

চন্দ্রিমা কহিলেন, সুকুমারি! তুমি যাহা ভাবিয়া এই কয়েকটী কথা কহিলে, আমি সে ভাবের একটী কথাও তোমাকে বলি নাই। তবে কি না ভাই! আমরা কুমারী, কি করিতে শেষে কি হবে, বিবেচনা করিয়াই আমাদের চলা উচিত। দেখ, যে সকল স্ত্রী বিদ্যাবিষয়ে একবারে বিরত, তাহারাও অনায়াসে সতী-ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছে। বিশেষ আমরা বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিতেও সমর্থা হইয়াছি। যদি আমাদেরই কুমতি হয়, তবে কি নারীকুলে আর বিদ্যানুশীলন থাকিবে? অনেকেই বিবেচনা করিবেন, স্ত্রীজাতি বিদ্যা শিক্ষা করিলেই দুশ্চরিত্রা হয়। এমন কি, অনেক দেশে এরূপ প্রথা অদ্যাপি প্রচলিত আছে যে, তাঁহারা স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা অতি গর্হিত বিবেচনা করেন; কিন্তু এ কেবল তাঁহাদিগের বুঝিবার ভ্রান্তি; যে স্ত্রী আপনা-আপনি আপনাকে রক্ষা করে, সেই সুরক্ষিতা; নতুবা মূর্খ করিয়া গৃহে রুদ্ধ করিলে, তাহাতে সুরক্ষিত হওয়া দূরে থাক্, বরং মহানর্থের মূল হইয়া উঠে।

উমা কহিলেন, সখি চন্দ্রিমে! তুমি সুকুমারীকে কি প্রবোধ দিতেছ। যেমন বধিরের নিকট আশুতোষিণী গীতিগান এবং অন্ধের নিকটে চিত্ততোষ নৃত্য করিলে কোন ফলোদয় হয় না, সেইরূপ স্মররাজ-শর-মোহিনীকেও উপদেশ দিলে বিফল হয়; বরং নিবারণ করিলে পতঙ্গের দীপাশ্রয়ের ন্যায়, সে বারংবার মন্মথের মনোমত কার্য্য করিতেই তৎপর হয়! সুকুমারী হাস্য করিয়া কহিলেন, উমে! এ তোমার পক্ষে, অন্যের পক্ষে নয়।

চন্দ্রিমা কহিলেন, সুকুমারি! তুমিও ক্ষেপার কথায় কাণ দিও না। আমাদের আর্য্য আচার্য্য গল্পচ্ছলে অশিক্ষিত ও শিক্ষিত স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণের ভাবগতি যে প্রকার বর্ণন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই শুন। অশিক্ষিতা রমণিগণের অন্তঃকরণ ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশার ন্যায় অন্ধকারময় এবং শিক্ষিত মহিলাগণের অন্তঃকরণ শারদী পূর্ণিমার নিশাসদৃশ শোভমান ও নির্ম্মল দিবসের ন্যায় আলোকিত। অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকেরা কুসংস্কারের বাধ্য হইয়া ভূতপ্রেতাদি নানা প্রকার আশঙ্কায়

প্রতিপদক্ষেপণে ভয়ে অভিভূতা হয় শিক্ষিতা রমণীগণ তাহা দেখিয়া হাস্য করেন। অশিক্ষিতা রমণীগণ, যেমন রসে মীন নষ্ট হয়, তদ্রূপ পরপ্রলোভনে আপনারা নষ্ট হইয়া থাকে; দণ্ড ও ভূত-ভয় দেখাইয়া অনেকে যেমন ইহাদিগকে কলঙ্কিত করে, সেইরূপ আবার অবাস্তবিক ধর্ম্মোপদেশ দিয়াও ঘোর কলুষে নিমজ্জন এবং অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। শিক্ষিতা মহিলাগণ সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ অন্তর্যামী ঈশ্বর ব্যতীত কাহাকেও ভয় করেন না; সুতরাং ইন্দ্রিয়-পরায়ণ অধার্ম্মিকেরা মৃত্যু ও দণ্ড ভয় দেখাইয়া ইহাদিগের নিকট যেমন কৃতকার্য্য হইতে পারে না, সেইরূপ অর্থ কি ধর্ম্ম প্রলোভনেও অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীরামদয়িতা সীতা যদি অশিক্ষিতা হইতেন, তবে কি রাবণের ভয়ানক দণ্ডভয়ে ও অপরিহার্য্য প্রলোভনে তিনি আপন দৃঢ়তা ও পতিভক্তি অচলা রাখিতে পারিতেন? যাঁহারা দময়ন্তী ও সাবিত্রীর চরিত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা শিক্ষিতা মহিলাগণের অন্তঃকরণ কত দূর বলবান্ তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। অশিক্ষিতা রমণীরা সন্তানগণকে পাপ পথে পদার্পণ করিতে দেখিলেও শিক্ষাভাবে ও অবিহিত স্নেহের অনুরোধে বাধা দিতে পারে না; তাহাতে সন্তানগণের মানস-ক্ষেত্রে যে সকল কুসংস্কার ও পাপাঙ্কুর বদ্ধমূল হয়, তাহা জ্ঞানাস্ত্রের সাহায্যেও সম্যক প্রকারে উন্মূলিত হয় না। ত্রিফলা-নির্যাস-মসী-রঞ্জিত বস্ত্র যেমন শত ধৌতেও একবারে অকলঙ্ক হইতে দেখা যায় না, তদ্রূপ মাত্রনুকরণ-দোষও শিক্ষকের সহস্র প্রকার উপদেশেও একেবারে বিদূরিত হয় না। জগজ্জীবন বায়ু দোষাশ্রয় করিলে, যেমন জীবগণের জীবনহন্তা হয়, তদ্রূপ অকপট স্নেহের আধার মাতাও কার্য্য-বিশেষে সন্তানের শত্রু হইয়া থাকেন। শিক্ষিতা রমণীগণ শিশুকাল হইতে সন্তানগণকে নানাপ্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়া নীতি ও ধর্ম্মের আধার করেন। তাঁহাদিগের সন্তানগণের সুকুমার হৃদয়ে শিশুকাল হইতে জননীদত্ত যে ধর্ম্মবীজ বিক্ষিপ্ত হয়, তাহা আচার্য্যের শিক্ষা-সলিলে ক্রমান্বয়ে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে।

চন্দ্রিমার এইরূপ বক্তৃতা শুনিয়া উমা কহিলেন, চন্দ্রিমে। অশিক্ষিতা অবলাগণ পাপ-পঙ্কে পদার্পণ করে, আর শিক্ষিতেরা তাহার নিকট দিয়াও যান না, এ কথা বলিও না। বাস্তবিক যিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া পরকালের ভয় না করেন, (শিক্ষিত অশিক্ষিত নাই) তিনি পাপপঙ্কে পতিত হইয়া ক্রমাগত নিমগ্ন হইতে থাকেন। প্রাণিবধের নিমিত্ত নিষ্কাশিত হইলে, অতীক্ষ্ণাস্ত্র অপেক্ষা শাণিতাস্ত্র যেমন অধিক ভয়ঙ্কর হয়, সেইরূপ পাপোদ্যত অশিক্ষিত ব্যক্তি হইতে শিক্ষিত ব্যক্তি মহাভীষণ হইয়া থাকেন। ঈশ্বর অজ্ঞ পাপীকে যেমন ক্ষমা করেন, জ্ঞানী

পাপিকে তদ্রূপ ক্ষমা করেন না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারিবে, (শিক্ষিত অশিক্ষিত নাই) যিনি পাপ প্রলোভনে একবার পতিত হইয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মের পথে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তিনিই ধন্য!

চন্দ্রিমা কহিলেন, উমে! তা সত্য বটে; কিন্তু অশিক্ষিতেরা যেরূপ সচরাচর প্রতারিত হইয়া পাপ-পথে চলে, শিক্ষিতেরা তদ্রূপ প্রতারিত হন না। বস্তুতঃ অশিক্ষিত শ্রেণীতে যেমন দোষের ভাগ অধিক, শিক্ষিত শ্রেণীতে সেইরূপ গুণের ভাগ অধিক দেখা যায়। তবে যে লোকে শিক্ষিতদিগের গুণাপেক্ষা দোষাংশই অধিক দেখেন, ইহার কারণ এই যে, শুভ্র বস্ত্রে বিন্দু পরিমাণ মসীও অধিকতর উজ্জ্বলতা ধারণ করে। শিক্ষিতেরা লোক-পরিবাদ যেমন কণ্টকস্বরূপ বিবেচনা করেন, অশিক্ষিতেরা তাহাকে সেইরূপ ভূষণ-স্বরূপ ভাবিয়া থাকে। এই নিমিত্ত লোকাপবাদও তাহাদিগের নিকট পরাস্ত হইয়াছে। চন্দ্রিমা এই কথা উমাকে কহিয়া তদনন্তর সুকুমারীকে কহিলেন, সুকুমারি! অশিক্ষিত-স্ত্রীদিগের চরিত্রের কথা কহিলাম, আবার কুসংস্কারবিশিষ্ট জাত্যভিমানী নির্দ্দয় পুরুষদিগের কথা শ্রবণ কর; তাঁহারাই অবলা স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রধান বৈরী। যদি তরুণবয়স্ক সরলহৃদয় কোন যুবা পুরুষ বালিকা-গণের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে কোন প্রস্তাব করেন, তবে তাঁহাদিগের ক্রোধের আর পরিসীমা থাকে না, জ্বলন্তানলে ঘৃতাহুতির ন্যায় অগ্নি-অবতার হইয়া রাম রাম, কেহ মহাভারত ইত্যাদি শব্দ করিয়া কাণে হাত দেন। আবার কেহ কেহ বস্ত্রা-বরণে অনল গোপন করিবার ন্যায় কৌতুক করিয়া কহেন এখন কতই হবে; স্ত্রীলোকে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া রাজসভার সভ্য হইবে; পুরুষেরা তাহাদের পরিচ্ছদ লইয়া অন্তঃপুরে বসিয়া থাকিবে।—এরূপ আপত্তিকারীরা বিদ্যাশিক্ষা যে কি জন্য, তাহার কিছুই জানেন না। কেবল পরের দাসত্ব হেতু বিদ্যাভ্যাস, এই কুসংস্কার-মদে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। বিদ্যা কি কারণ শিক্ষা করা আবশ্যক, যাঁহারা ইহার তাৎপর্য্য না জানিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন, অথবা বিদ্বান নামে বিখ্যাত হন, তাঁহারাও এইরূপ পুস্তকবাহক চতুষ্পদ, বোধ হয় ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যা অমূল্য ধন ও অভেদ্য সুহৃদ্! বিদ্যা শিখিলে হিতাহিত বিবেচনা হয়। আপনার ও অন্যের শুভসাধন করা যায়। ঈশ্বরের মঙ্গলদায়ক নিয়ম জ্ঞাত হইয়া শারীরিক ও মানসিক সুখ সাধন করিতে পারা যায়। বিশ্বস্রষ্টার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হওয়া যায়। ইহা সেই মূঢ় মনুষ্যেরা না জানিয়া বিপরীতভাবাবলম্বন করিয়াছে।

এইরূপ কথোপকথনে রজনী প্রভাত হইল। দিননাথ পূর্ব্বদিক্ হইতে উদিত হইয়া অন্ধকারকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বায়সকুল ব্যাকুল হইয়া সভয়ে কা কা ধ্বনি করিতে লাগিল। বসন্তকুমার প্রাতঃসময়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম (ঈশ্বরোপাসনা) সম্পন্ন করিয়া কুসুমবনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন, এই কালে সুকুমারী সহচরিগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া পুষ্পচয়নার্থ বৃক্ষবাটিকার দ্বারে উপনীতা হইলেন। চন্দ্রিমা দূর হইতে বসন্তকুমারকে দেখিতে পাইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা সুকুমারীকে কহিলেন, সখি! ঐ দেখ, তোমার স্বপ্ন বুঝি প্রত্যক্ষ হইল। সুকুমারী মুখ উন্নত করিয়া দৃষ্টি করিলেই যেন লজ্জিত হইয়া উভয়েই উভয়ের নেত্র-পুত্তলিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু পক্ষপুটদ্বয় নিমিষ পরিগ্রহ করাতে তাঁহাদিগের সেই অভিসন্ধি বিফল হইল। এই সময় স্বপ্নদর্শিত সমুদায় ভাব মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করিয়া সুকুমারীর হৃদয়-মন্দির অধিকার করিল, সুতরাং তিনি ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া বসন্তকুমারের পরিচয় গ্রহণ নিমিত্ত পদে পদে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন। তখন উমা সুকুমারীর গাত্রে অঙ্গুলি স্পর্শ দ্বারা কহিলেন, অয়ি অভিসারিকে! আত্মগুণ সকলি বিস্মৃত হইলে। সুকুমারী লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া আর অগ্রবর্ত্তিনী হইতে পারিলেন না, সেই মনোমোহন রূপ মনোমধ্যে ভাবিতে ভাবিতে গৃহে প্রতিগমন করিলেন। বসন্তকুমার সুকুমারীর অদর্শনে, চিরপ্রণয়িনীর অদর্শনের ন্যায়, জর্জ্জরীভূত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কে এই অপরিচিত প্রতীপদর্শিনীকে দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণ চিরবিরহীর ন্যায় ব্যাকুল হইতেছে। আহা! মনের কি আশ্চর্য্য বিকার!

সুকুমারী নৃত্যমণ্ডপে প্রিয়সখীগণকে ডাকিয়া কহিলেন, সখি চন্দ্রিমে! স্বপ্ন যেন প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু তদ্দর্শিত সমস্ত ভাব বাস্তবিক কি অলৌকিক, তাহা জানিতে মন একান্ত ব্যাকুল হইতেছে। উমা কহিলেন, সুকুমারি! সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনাশ হইয়া থাকে, এবং কমল বিকসিত হইলেই অবশ্যই তাহার সৌরভ বিস্তীর্ণ হয়, তজ্জন্য গৌণ কাল অপেক্ষা করিতে হইবে না। ইহা শুনিয়া সুকুমারী স্থির হইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে বসন্তকুমারের সেই মনোহর লাবণ্য সর্ব্বক্ষণ প্রত্যক্ষ রহিল। কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে তাঁহাকে দেখা পাইবেন, অহর্নিশ এই ধ্যান, এই জ্ঞান, ক্রমে শরীর শীর্ণ, বিবর্ণ ও দুর্ব্বল করিতে লাগিল।

চন্দ্রিমা সুকুমারীর এইরূপ পূর্ব্বরাগ-সঞ্চার দেখিয়া উমাকে কহিলেন, সখি! আমাদের প্রিয়সখী সুকুমারী পতি-চিন্তা করিয়া দিন দিন শীর্ণা বিবর্ণা হইতেছেন।

দেখ পূর্ব্বমত আমাদের সঙ্গে আর আলাপ করেন না ;যদি আমরা কিছু কহি, তবে বিরক্তি বোধ করেন। চল দেখি, আজি প্রিয়সখীকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করি, তিনি স র্ব্বক্ষণ মৌনাবলম্বনে কি চিন্তা করেন। এই বলিয়া উভয়ে সুকুমারীর নিকট গমন করিয়া অন্তরাল হইতে দেখিতে ও শুনিতে লাগিলেন। সুকুমারী একখানি পুস্তক হস্তে করিয়া পাঠ করিতে করিতে কহিতেছেন, নিষধজে! আপনি বিহঙ্গ কর্তৃক প্রতারিত হইয়া নানাপ্রকার যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব নহে। কেননা, পরে পরকে ক্লেশ দিয়াই থাকে। কিন্তু আমি আপনি আপনার ক্লেশের কারণ হইয়াছি। মরালমুখে নল-রাজার গুণ ও যশোবর্ণন শুনিয়া, আপনি অধৈর্য্য হইয়াছিলেন, আমি মনোমোহনের মনোহর মূর্ত্তি স্বচক্ষে দেখিয়া ব্যাকুল হইয়াছি। অতএব উৎপত্তির প্রভেদ থাকিলেও আপনার অবস্থা যে প্রকার পাঠ করিতেছি, আমারও অবস্থা অবিকল সেইরূপ হইয়াছে। অনন্তর তিনি—এখন ত আর পাঠ করিতে ভাল লাগে না,—এই বলিয়া নৈষধ ত্যাগ করিলেন। যোগিনিগণের যোগচিন্তার ন্যায় কিয়ৎক্ষণ মৌনীবতী থাকিয়া, লেখনী গ্রহণ করিলেন। মনের ভাব কি, এবং তিনি কি নিমিত্তই বা লেখনী সঞ্চালন করিতেছেন, তাহার নিশ্চয় নাই। সুতরাং ঈশ্বরের নাম এবং এ, ও, তা, লিখিয়া বিরক্ত হইয়া লেখনী পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর বর্ণাধার আনিয়া তূলিকা দ্বারা চিত্র করিতে লাগিলেন। কি চিত্র করিতেছেন, প্রথমে তাহার সিদ্ধান্ত না করিলেও, মন্ত্রোদ্যান ও তন্মধ্যস্থ সরোবর প্রভৃতি যেন আপনিই চিত্রিত হইল। তিনি লিখিতে লিখিতে তাহার পর বসন্তকুমারের সেই মুনিবেশযুক্ত মনোহর প্রতিমা লিখিয়া মনো-নিবেশপূর্ব্বক দেখিতে দেখিতে কিঞ্চিৎ অন্তরে নিক্ষেপ করিলেন এবং মানিনীর ন্যায় বিমুখী হইয়া বসিয়া থাকিলেন। আর দেখিব না ভাবিয়া দুটী নয়নও মুদ্রিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ খণ্ডিতার ন্যায় বিলাপ করিয়া চিত্রপটখানি পুনর্ব্বার নিকটে আনিয়া কহিতে লাগিলেন, আপনি কি তাপস? না রাজপুত্র? যদি তাপস হন, তবে কেন তপোবনের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন? লৌহই আপনি দগ্ধ হইয়া অপরকে দগ্ধ করে, কিন্তু তপস্বীরা স্বয়ং যন্ত্রণা পাইলেও অন্যকে যন্ত্রণা প্রদান করেন না, বরং সুখী করিতে যত্ন করিয়া থাকেন। অন্ধ মুনির পুত্র সিন্ধু শব্দভেদী শরে বিদ্ধ হইয়াও রাজা দশরথকে অভিসম্পাত করেন নাই, বরং তাঁহাকে নানা-প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। হে পুণ্ডরীকাক্ষ মুনিবেশধারিন্! আপনি নিরপরাধে কেন কুলকুমারীকে যন্ত্রণা দিতেছেন? এই কি তাপসশ্রেষ্ঠ সারদ্বাজ মুনির উপদেশের, বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নের, ও তপোবনস্থ সাধুসঙ্গের ফল?

মৃগয়াসক্ত নৃপতিগণ ভয়বিহ্বলা হরিণীর চঞ্চল নেত্র দেখিয়াও যেমন নির্দ্দয় হইয়া তাহার বক্ষে শর নিক্ষেপ করেন, আপনার ব্যবহারও তদ্রূপ দেখিতেছি। ইহাতেই বোধ হয়, আপনি তাপসপুত্র নহেন, রাজপুত্র হইবেন। কিন্তু আপনার পরিধেয় বল্কল ও করস্থ অক্ষমালা প্রভৃতি মুনিসামগ্রী প্রতিবাদ করিয়া আমার এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতেছে। আপনি কি অনুগ্রহ করিয়া আত্মপরিচয়-প্রদানে সন্দেহ-দুঃখ-সাগর হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিবেন?

সুকুমারী ক্ষিপ্তপ্রায় এইরূপ নানা প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন, এমন সময় চন্দ্রিমা অন্তরাল হইতে কহিয়া উঠিলেন, সুকুমারি! ভাই তোমার সিদ্ধান্তই অকাট্য এই কথা শুনিবামাত্র সুকুমারী লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া বস্ত্রাঞ্চলে চিত্রপটখানি আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেন। উমা, চন্দ্রিমা গৃহপ্রবেশ করিয়া নানাপ্রকার প্রবোধ প্রদানের পর, চন্দ্রিমা সুকুমারীকে কহিলেন, সখি সুকুমারি! তুমি কি অনুশোচনে দিনযামিনী মৌনবতী থাক এবং সময়ে সময়ে উন্মত্তার ন্যায় চিত্তবিকার প্রকাশ কর; তোমার মনের কথা কি? আমরা তোমার সখী আমাদের কাছে মনের ব্যথা ব্যক্ত করিতে ভয় কি? দীর্ঘকাল গত হইয়াছে, অল্পকাল বাকী; মনোমত বরে স্বয়ংবরা হইলেই মনোরথ পূর্ণ হইবে, তজ্জন্য অনর্থক চিন্তার প্রয়োজন কি?

উমা কহিলেন, চন্দ্রিমে! তুমি আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ, যার মনের জ্বালা সেই জানে। দাবানলে বন দগ্ধ হয়, বাড়বানল জল দহে; চিতানলে শবদাহ হয়, ইহাই সকলে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে; কিন্তু অনিবার্য্য বিরহানল অহরহঃ দেহ দাহ করে, তাহা কেহই দেখিতে পায় না, অথচ করি-ভক্ষিত কপিত্থের ন্যায় শরীর পদার্থশূন্য হয়; পূর্ব্বরাগ সঞ্চার হওয়ায়, সুকুমারীও করি-ভক্ষিত কপিত্থের ন্যায় হইয়াছেন। সুকুমারী সহাস্যমুখে কহিলেন, উমে! আমার পূর্ব্বরাগ হইয়াছে বটে, কিন্তু তোমার দশম দশা।

অনন্তর সুকুমারী চন্দ্রিমাকে কহিলেন, সখি! আমার মন যাহার জন্য এত ব্যাকুল, তাঁহাকে সহজেই পাইতে পারি। কিন্তু তিনি তাপস-পুত্র, কি রাজকুলোদ্ভব, অথবা সাধারণ মনুষ্য, তাহার কিছু জানিতে না পারিয়া, পরে আমার দশা কি হইবে, এই অনুশোচনায় চিন্তাকুল হইতেছি। চন্দ্রিমা কহিলেন, সখি সে জন্য চিন্তা কি? তুমি আপন অনুরূপ বরেই অনুরাগিণী হইয়াছ। আমি একদিন পুষ্পচয়নচ্ছলে মন্ত্রোদ্যানে গমন করিয়া ভারদ্বাজ মুনিকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি সবিশেষ কহিলেন; তোমার প্রাণেশ্বর জয়পুরাধিপতি

জীসেন রাজার পুত্র। সুকুমারী এই শুভ সংবাদ শ্রবণে আনন্দিতা হইলেন।

স্বয়ংবর-বাটি প্রস্তুত হইলে, নিরূপিত দিবসে চতুর্দ্দিক্ হইতে শকট বাজী গজে নৃপতিগণ, পদব্রজে বুধগণ, আগমন করিয়া, সমুচিত সম্মানানন্তর যথাযোগ্য আসনে সকলে উপবেশন করিলেন। সুকুমারী পরিণয়-সূচক বেশে সহচরীগণে পরি-বেষ্টিতা হইয়া স্বয়ংবরসমাজে গমন করিলেন। ভূপালগণ সভা-মেঘ-মণ্ডলীতে জ্যোতির্ম্ময়ী তারকামালার সহিত বিদ্যুল্লতা উদিত দেখিয়া, নিমেষশূন্য-লোচনে সুকুমারীর সেই সুরম্য মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সুকুমারী কোন রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না, যথাবিধানে বসন্তকুমারকে বরমাল্য প্রদান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রজেশবর্গ বসন্তকুমারের পরিচয় অবগত ছিলেন না; সুতরাং সামান্য লোক বিবেচনায় আনন্দময় নৃপতিকে উপহাস করিতে লাগিলেন। সারদ্বাজ মুনিবর সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া নৃপতিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে নরেশবর্গ! জগদীশ্বর আপনাদিগের হস্তে অসংখ্য লোকের ধন, মান, ও প্রাণ রক্ষার ভারার্পণ করিয়াছেন। আপনারা ধর্ম্মাধিকরণের উজ্জ্বল নক্ষত্র; ন্যায় ও অন্যায় বিবেচনা করিয়া অপরাধীর দণ্ডবিধান ও শিষ্ট জনকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া যদি নির্দ্দোষীকে দণ্ড প্রদান করেন, তবে তাহা বজ্রপাতের ন্যায় ভয়ঙ্কর হয়। বৃক্ষমূলস্থ তরুলতা যেমন যাহাকে আশ্রয় করে, তাহারই রসে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং সূর্য্যালোক রুদ্ধ করিয়া কেবল নিকটবর্ত্তী গুল্মলতার অপকার করে না, পরিশেষে আশ্রয় বৃক্ষকেও নষ্ট করে; সেইরূপ সন্দেহ মনুষ্যের অন্তঃকরণকে আশ্রয় করিয়া নানাপ্রকার আন্দোলনে পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং লক্ষিত ব্যক্তির অপকার-সাধন করিয়া, পরিশেষে আশ্রয়কেও নষ্ট করে। অতএব সন্দেহ উপস্থিত হইলে, তদুৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। সন্দেহ কি নিমিত্ত হৃদয়স্থান অধিকার করিয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, তাহাতে আপনার ও অপরের অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। পেচক যেমন সূর্য্যালোক অপেক্ষা অন্ধকারময় কোটরে বসিয়া সকল বিষয় স্পষ্ট দেখিতে পায়, সেইরূপ সন্দেহ মনুষ্যের মনে থাকিয়াই নানাপ্রকার বিষয় স্পষ্ট সৃষ্টি করে। কিন্তু পেচক কোটর পরিত্যাগ করিয়া সূর্য্যালোকে যেমন কিছুই দেখিতে পায় না, তদ্রূপ সন্দেহ মনুষ্যের অন্তঃকরণ হইতে বহির্গত হইলে অন্ধ হয়। এই নিমিত্ত বলিতেছি, সন্দেহকে অন্তঃকরণে না রাখিয়া বহির্গত করিবে। হে

সদাশয় নরেন্দ্রগণ! আপনারা বসন্তকুমারের বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়াছেন; হইতে পারেন; কিন্তু সেই সন্দেহকে মনোমধ্যে না রাখিয়া, স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসু হইলেই, মহারথ আনন্দময় নৃপতিকে শ্লেষ করিতেন না। বাস্তবিক আপনারা সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া, প্রফুল্ল কমল শৈবালাবৃত দেখিয়া সৌরভশূন্য বিবেচনা করিতেছেন। মৃণ্ময়পাত্রে হীরকখণ্ড রাখিলে কখন কি তাহার ঔজ্জ্বল্য হ্রাস হইয়া থাকে? পৃথিবীমণ্ডলের ছায়াতে মনুষ্যগণ যেমন চন্দ্রের কিরণ খর্ব্ব দেখিয়া থাকেন, বাস্তবিক কি তাহার জ্যোতি ধ্বংস হইয়া থাকে। অতএব আপনারা গুণ না জানিয়া কেবল বাহ্যশোভানুরোধে পিকবরকে অবমাননা করিতেছেন। উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিলেই যদি সদ্বিদ্যাশালী ও সৎকুলোদ্ভব হয়, তাহা হইলে কি এ পৃথিবীতে অভদ্র ও মূর্খ থাকিত? অতএব আপনারা সবিশেষ না জানিয়া আনন্দময় ভূপতিকে কেন অনাদর-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন? সুমতী সুকুমারী আপন অনুরূপ বরেই স্বয়ংবরা হইয়াছেন। যেহেতু বসন্তকুমার জয়পুরাধীশ্বর জয়সেন নৃপতির কুমার; দৈবদুর্ব্বিপাকে এই দুঃখের দশায় পতিত হইয়াছেন। অগ্রে পরিচয় না লইয়া কোন ব্যক্তিকে ভর্ৎসনা ও শ্লেষ করা কি ভদ্রের উচিত হয়? নৃপতিগণ মুনিবরের ঈদৃশ-বাক্য-শ্রবণে নীরব হইয়া ক্রমে ক্রমে স্বস্থানে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। আনন্দময় ভূপতি বিষাদ সাগরে পতিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আনন্দনীরে ভাসমান হইলেন, কেননা বসন্তকুমারের পরিচয়াভাব যৎপরোনাস্তি বিমর্ষের কারণ হইয়াছিল, এক্ষণে পরিচয় পাইয়া তাঁহার অন্তরে সুখসিন্ধু উদ্বেল হইল।

অনন্তর পৈতৃক-রীত্যনুসারে বিবাহ সম্পন্ন হইলে, সারদ্বাজ মুনিবর কহিলেন, মহারাজ! আমি বসন্তকুমারকে শিশুকালাবধি পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছি। অতএব পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত আশ্রমে যাইতে নিতান্ত অভিলাষী হইতেছি। রাজা প্রসন্নান্তঃকরণে গমনোদ্যোগ পাইতে লাগিলেন।

সুকুমারী গমন-সময় উপস্থিত দেখিয়া মাতার অঞ্চল ধরিয়া চঞ্চলনয়নে অব্যক্তস্বরে রোদন করিয়া জননীর অকপট স্নেহময় হৃদয়-সাগর বিচ্ছেদ তরঙ্গমালায় বিচলিত করিলেন। কুমুদিনী যেমন পতিকে মেঘাচ্ছন্ন দেখিয়া ম্লানভাবে মৃণালোপরি আকাশমুখী হইয়া থাকে, সখীরা তদ্রূপ সুকুমারীর বিরহ-বিকারাচ্ছন্ন মুখচন্দ্রমা অনিমিষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। মহিষী আপনি হস্ত ধরিয়া কন্যাকে কর্ণিকা-রথে উঠাইয়া দিলেন। বসন্তকুমার রাজা ও রাজমহিষীকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলে, মুনিবর তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা যথাসময়ে তপোবনের সন্নিহিত হইলে, এই শুভ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র মুনিপত্নী সকলে অগ্রগামিনী হইয়া কল্যাণসূচক-বাক্য-প্রয়োগে মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। সারদ্বাজ মুনির পত্নী সুদক্ষিণা আহ্লাদে, এস আমার মা এস, বলিয়া সুকুমারীকে ক্রোড়ে করিয়া কুটীরে গমন করিলেন এবং তাঁহার সেই অকলঙ্ক মুখশশী দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, আঃ! পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া আমার চিরসাধ পরিপূর্ণ ও তাপিত প্রাণ শীতল হইল। হায়! ইহা কি কাহারও মনে ছিল, রাজলক্ষ্মী এই দীন দুঃখিনী ব্রাহ্মণীর পর্ণকুটীরে উদয় হইবেন। মুনিপত্নী এইপ্রকারে মনঃসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

বসন্তকুমার সুকুমারীর সমভিব্যাহারে তপোবনে কিয়দ্দিন অধিবাস করিয়া আনন্দনগরে প্রতিযাত্রা করিলেন। রাজা আনন্দময় রাজধর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া প্রশান্তচিত্তে ঈশ্বরে মনোভিনিবেশ করিতে একান্ত অভিলাষী হইলেন এবং জামাতাকে নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! সাম্রাজ্যেশ্বর হইয়া ন্যায়পরতায় দৃষ্টি রাখিয়া রাজ্যোপভোগ কর। আমার তৃতীয়কাল গত হইয়াছে, চরমকাল উপস্থিত। এখন আর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া পরকালের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিস্মৃত হওয়া আমার পক্ষে উচিত হয় না। মনুষ্যের জীবন নলিনীদলস্থিত জল-স্বরূপ। না জানি কখন্ কোন্ দিক্ হইতে মৃত্যু-রূপ বায়ু প্রবাহিত হইয়া অমনি বিচলিত করিবে। অতএব তোমাকে রাজ্যাস্পদে অভিষিক্ত করিয়া অবশিষ্ট কাল নিরালয়ে অবস্থিতিপূর্ব্বক মনুষ্যের কর্ত্তব্য সাধনে অনুরক্ত থাকি, আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

বসন্তকুমার কহিলেন, মহারাজ! রাজকীয় ও সংসারীয় ভারভার গ্রহণে আমি অঙ্গীকৃত হইলাম, তজ্জন্য মহারাজের অনেুদ্বেগ কিছুই থাকিবে না, কিন্তু আপনি নিরালয়াপেক্ষা লোকালয়ে অবস্থিতিপূর্ব্বক অভীষ্টসিদ্ধি করিলে, বোধ করি আপনার উদ্দেশ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হইবে না। নৃপতি কহিলেন না বৎস! তাহাতে বিশেষ কোন হানি দর্শে না বটে, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা ঋষিরা কহিয়াছেন, লোকালয় অনেকপ্রকার কৃত্রিম ব্যবহারপ্রণালীর বশবর্ত্তী, কারণ সর্ব্বসাকল্যের একরূপ অভিপ্রায় কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং বাধ্য হইয়া কৃত্রিমতা ও কপটতার অনুবর্ত্তী হইতে হয়। অতএব ঋষি সকল নির্ঝরসমীপবর্ত্তী পর্ব্বতকন্দরে অথবা স্রোতস্বতী তীরস্থ নির্জ্জন কাননে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া নিরুৎকণ্ঠে ঈশ্বরোপাসনা করেন। আমরা দম্পতিও কুলাচার্য্যের আশ্রমে গমন করিয়া নিরুদ্বেগে কাল অতিবাহিত করিব। বসন্তকুমার অগত্যা রাজ্যাস্পদ-গ্রহণেচ্ছা প্রকাশ

করিলেন। রাজা বসন্তকুমারকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া, আত্মীয় জনগণ-স্থানে চির-বিদায় লইয়া সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে আচার্য্যাশ্রমে যাত্রা করিলেন।

রাজা যথাসময়ে তপোবনে উপস্থিত হইয়া তদ্দর্শনে কহিলেন, আহা! তপো-বনের কি আশ্চর্য্য মহিমা! কি অনৃশংস অমায়িক ভাব! পতঙ্গগণ নির্ভয়ে বিহঙ্গের কুলায়-কোটরে অবস্থিতি করিতেছে। কিঞ্চুলুক বর্ষাভূর পদতলে লুণ্ঠিত হইতেছে। ভুজঙ্গ শিখিপুচ্ছোপরি বিস্তৃত-ফণ হইয়া আতপতাপ নিবারণ করি-তেছে। হরিণ শিশু নিঃশঙ্কে কেশরিণীর স্তন্যপায়ী হইয়াছে। আম্রপাদপমণ্ডলী ফলে মুকুলে অবনত শাখা হইয়া বায়ু-হিল্লোলে ইতস্ততঃ দোলিত হইতেছে দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাহারা পরমার্থ-রসে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছে। বিহঙ্গকুল সচ্ছন্দমনে সজাতীয় স্বরে জগদীশ্বরের গুণগান করিতেছে। এইরূপে তপোবনবাসী সকলে একতান হইয়া অনাদি অনন্ত পুরুষের পবিত্র নাম, মহতী কীর্ত্তি, অকলঙ্ক মহিমা, বিচিত্র শক্তি, অপার করুণা ও অকপট প্রেমের চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া বিমলানন্দনীরে নিমগ্ন হইয়াছেন। রাজা এইরূপ দেখিতে দেখিতে আচার্য্যাশ্রমে উপস্থিত হইলেন।

বসন্তকুমার রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া, অন্তরে সংকল্প-বর্জ্জিত ও বাহিরে কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। প্রশস্তচিত্ত শিষ্ট জনগণের প্রতি শিষ্টাচারে, পরদ্রোহী পাপপরায়ণ কলহকারিদিগকে দণ্ডবিধানে, রাজ্যশাসনে ব্যাপৃত থাকিলেন। একদা তিনি রাজকার্য্য হইতে অবসরানন্তর নির্জ্জন নিকেতনে বসিয়া, ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ করিতেছেন, এমন সময় সুকুমারী তথায় উপস্থিতা হইয়া কহিলেন, প্রিয়তম! আপনি পতিরূপে বৃত হইয়া পতির ধর্ম্ম কি করিলেন? আমি আর্য্যা আচার্য্যা-নীর নিকট শুনিয়াছি, স্বামী আপন পত্নীকে যত্নের সহিত উপদেশ প্রদান করিবেন। স্বয়ং যে ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নির্ম্মল আনন্দ ও নিত্য সুখ সম্ভোগ করেন, আপন স্ত্রীকেও সেই পথের অধিকারিণী করিবেন। সহধর্ম্মিণীর অন্তঃকরণে যদি কোন-প্রকার কুসংস্কাররূপ কণ্টকিলতা বদ্ধমূল হইয়া থাকে, তবে স্বীয় জ্ঞানাস্ত্রে তন্মূলোন্মূলন করিবেন। স্ত্রী যদি বিদ্যাবিষয়ে একেবার বিরতা ও উদাসীনা থাকে, অনুক্রমে উপদেশ প্রদান করিয়া তদ্বিষয়ের পরিহার করিবেন। যিনি স্ত্রীকে এই-রূপে উপদেশ প্রদান করেন, তিনি যথার্থ পতির ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন। নচেৎ যে স্বামী ইতরেন্দ্রিয়-সুখ-লালসায় অথবা পরিচর্য্যাহেতু পাণিগ্রহণ করেন, তিনি কদাচ স্বামীর ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন না। তজ্জন্য ধর্ম্ম সন্নিধানে অবশ্য দণ্ডনীয় হইবেন সন্দেহ নাই।

বসন্তকুমার প্রেয়সীর এরূপ সুকুমার বাক্য শ্রবণে অতিশয় প্রীত হয়া কহিলেন, প্রিয়ংবদে! তোমার এই প্রশ্নসূচক মধুর-বাক্য-প্রভাবে আমার হৃদয়পুণ্ডরক প্রফুল্ল হইল। স্বামী স্ত্রীকে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ দিতে যত্নবান্ হইলে, অন্যান্য স্ত্রী তাহাতে যত্নবতী হওয়া দূরে থাকুক, বরং বিরক্তিবোধ করিয়া থাকেন। প্রিয়ে! তুমি যে আপনি এ বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিতা হইয়াছ, ইহা অপেক্ষা সুখকর বিষয় আর কি আছে? প্রথমে কোন্ বিষয় শুনিতে অভিলাষ হয়, বল, আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি। সুকুমারী কহিলেন, প্রিয়ংবদ! স্ত্রীদিগকে প্রথমতঃ পতিব্রতা-ধর্ম্ম জ্ঞাত করান পতির পক্ষে কর্ত্তব্য কি না? বসন্তকুমার সুকুমারীর করগ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি গুণভূষিতে! তোমার সুচারু-বাক্য-বিন্যাসে আমার মন ক্রমেই দ্রব হইতেছে। অতএব প্রাচীন ঋষিগণ পতিব্রতা-ধর্ম্ম যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, সঙ্ক্ষেপে তাহার কিঞ্চিদ্বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

স্বামী স্ত্রীর পরমারাধ্য ও পরমগুরু। এই ভূমণ্ডলে স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর আর অন্য গুরু নাই। স্ত্রী স্বামী ভিন্ন অন্য গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্টা হইলে, সকল ধর্ম্ম হইতে পতিতা হন। স্ত্রী ছায়া তুল্য স্বামীর অনুগতা ও সখী তুল্য তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনে যত্নবতী হইবেন। সদা প্রিয়বাদিনী ও সদাচারা এবং সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহে যত্নযুক্তা হইবেন। কখন প্রলাপবিলাপিনী বা ধর্ম্মকর্ম্মে বিরোধিনী হইবেন না। ভ্রমেও অন্য পুরুষকে মনে স্থান দিবেন না। পতি ভিন্ন অন্যের উপদেশ অবহেলা করিবেন। কেননা, এদেশীয় ছদ্মবেশী অনেক ধার্ম্মিক উপদেশের ছলনায় অনেক অবলার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। সতী স্ত্রী, যে স্থলে পতিনিন্দা অথবা অসৎবিষয়ের আলোচনা হইবে তথায়, কি সখীর আলয়, কি গুরুজনগৃহ, এমন স্থানে তিলার্দ্ধকালও থাকিবেন না। আপনার অন্তঃকরণে যে সকল ভাবের উদয় হইবে, পতির নিকটে তৎসমুদায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করিবেন, কদাচ গোপন রাখিবেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে পতি যদি জড়, রোগী, অধন অথবা মূর্খ হন, তথাপি পরিত্যাগ করিবেন না। পতি ব্যভিচারাক্রান্ত হইলেও উগ্রবাদিনী না হইয়া সহজ কৌশলে নিবারণ করিতে যত্নবতী হইবেন; নতুবা পুরুষ যেমন ব্যভিচারিণী পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, স্ত্রীও ব্যভিচারাক্রান্ত পুরুষকে ত্যাগ করিলে শাস্ত্র বা ধর্ম্মবিরুদ্ধ অপরাধিনী হন না। সর্ব্বদা পতি-জ্ঞান, পতি ধ্যান, পতি প্রাণ, পতি পরম গুরু, পতিসেবাই পরম ধর্ম্ম, পতিসন্তোষই পরম সন্তোষ। সাধ্বী স্ত্রী দেবতাদিগের আদরণীয়া। ইনি ইহলোকে পরম সুখ সম্ভোগ করেন এবং পরকালে স্বর্গবাসিনী হন। ইহা ভিন্ন সকল স্ত্রীই পরকালে নরকগামিনী হয় সন্দেহ নাই।

বসন্তকুমার এইরূপ গুণবতী ও বিদ্যাবতী সতী প্রণয়িনীর সহবাসে, আমোদ প্রমোদ ও কাব্যরস প্রসঙ্গে নানারঙ্গে নিত্য নূতন অনুপম সুখে দিন-যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৎস সকল! পূর্ব্বে কতবার কহিয়াছি, সুখ দুঃখের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না। বসন্তকুমার রাজ্যপদ পাইয়া নিরুদ্বেগে বিরাজ করিতেছেন, অকস্মাৎ রাজ্যমধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ও উল্কাপাত হইয়া দাবদাহ স্বরূপ গ্রাম নগর দগ্ধ হইতে লাগিল। মনুষ্য সকল উৎকটব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অকালে কালের করাল কবলে পতিত হওয়ায়, নগর জনশূন্য অরণ্য হইয়া উঠিল। গৃধিনী ও শিবা-রব জীবিত মনুষ্যের জীবনে সংশয় জন্মাইতে লাগিল। কুলায়-কোটর-বিশিষ্ট অশ্বত্থ বৃক্ষের উচ্চতর শাখা, স্মরণচিহ্নের অত্যুচ্চ চূড়া, কীর্ত্তিস্তম্ভের ধ্বজা, দুর্গোপরিস্থ জয়পতাকা, প্রাসাদের শিরঃস্থ চন্দ্রশালা, এককালে বিশীর্ণ হইয়া ভূতল-শায়ী হইল। বিহগকুলের আর্ত্তস্বরে কুক্কুরের ক্রন্দনে, মনুষ্যের হাহারবে, গ্রাম নগর অমঙ্গল ধ্বনিতে পূর্ণ হইতে লাগিল।

এই সাংঘাতিক বিপত্তি উপস্থিত দেখিয়া রাজ্যের ভদ্র ও সাধারণ সমাজের প্রজা সমুদায় একত্রিত হইয়া গোপনে সভা করিলেন। তৎকালে এই নিয়ম অতি প্রচলিত ছিল, রাজ্যমধ্যে কোন দৈব-দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইলে, রাজ্যাধিকারীকে দেশান্তর হইতে হইত। উক্ত সভাতেও এই প্রস্তাব হইল যে, রাজা আনন্দময় নিজ জামাতাকে রাজ্যাধিকার প্রদানকরাণাবধি রাজ্যমধ্যে এই দৈব-দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে কিছুদিনের নিমিত্ত রাজ-জামাতাকে স্থানান্তর করা কর্ত্তব্য।

সাধারণ সমাজের এই প্রস্তাব বসন্তকুমারের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র তিনি রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া বনযাত্রা করিতে স্বীকৃত হইলেন। এবং নগরস্থ আর্য্যানার্য্য সমুদয় প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া সরলহৃদয়ে ও স্নেহ পরিপূর্ণবদনে কহিতে লাগিলেন, হে রাজ্যপ্রাণ প্রজাবর্গ! তোমরা রাজ্যের কল্যাণার্থ আমার নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছ, তাহা ন্যায়ানুমোদিত না হইলেও লোকরঞ্জন, সন্দেহ নাই। অতএব আমি সন্তুষ্টচিত্তে তৎপ্রতিপালনে যত্নবান্ হইব। কিন্তু প্রস্থানের পূর্ব্বে তোমাদিগকে যে কয়েকটী উপদেশ প্রদান করিতেছি, ভরসা করি, তোমরা

তাহা প্রতিপালন করিয়া রাজ্যের কল্যাণ-বর্দ্ধনে আমাকে কৃতার্থ করিবে। রাজ্য দৈব দুর্ব্বিপাকে উচ্ছিন্ন হইলে, রাজার অদৃষ্ট-দোষে সেই ঘটনা সংঘটিত হয়, প্রমাদ দূষিত এই বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, বিজ্ঞ লোকেরা প্রাকৃতিক নিয়মানুসন্ধানে দেশের হিতসাধন করেন। কি নিমিত্ত শস্যক্ষেত্র সকল অনুর্ব্বর ও শস্যহীন হইতেছে, কি নিমিত্ত উৎকট ব্যাধি চিকিৎসকের অসাধ্য হইয়া অকালে প্রলয় কালের ন্যায় লোকসংহার করিতেছে, কি নিমিত্ত প্রবল বায়ু উপর্য্যুপরি প্রবাহিত ও বজ্রলেপ নির্ঘাতিত হইয়া রাজ্য-শ্রী ধ্বংস করিতেছে, তোমরা ইহার যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবে, রাজার অদৃষ্ট তাহার কারণ নহে। প্রাচীন নগর সমুদায় বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া এইরূপেই অবস্থান্তর গ্রহণ করে। রাজ্যাধিকারী রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়াছেন, এখন আর রাজ্যমধ্যে দৈব-দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইবে না, তোমরা এই ভ্রমান্ধ হইয়া কদাচ নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া দেখিবে, কোথায় জল, কোথায় স্থল, কোথায় গৃহ, কোথায় উদ্যান, বিকৃত হইয়া, জীবের জীবনস্বরূপ বায়ুকে গরলবৎ দুষ্ট করিয়া তুলিয়াছে; তন্নিবন্ধন এই দৈব-দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইয়াছে! অতএব ঐ সমুদয় জল ও স্থলাদি সংস্কৃত হইয়া যাহাতে বায়ু সংশোধিত হয়, তাহার উপায় করিবে। তাহা হইলে অবিলম্বে দেশের দুরবস্থা বিদূরিত হইবে। বসন্তকুমার এইরূপ সদুপদেশ-পূর্ণ বক্তৃতা করিয়া প্রজাবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রকৃতি-বর্গও নানাপ্রকার শিষ্টাচারে রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। বসন্তকুমার বনগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সুকুমারী এই অমঙ্গল সংবাদ শ্রবণে পতিসন্নিহিতা হইয়া সজলনেত্রে কহিলেন, আয়ুষ্মন্! প্রজার হিতের নিমিত্ত আপনি বনযাত্রা করিতে সম্মত হইয়াছেন, আমিও আপনার অনুগামিনী হইব। বসন্তকুমার কহিলেন, কুলপালিকে! তুমি রাজার দুহিতা, অতি যত্নের ধন, সুখ বিনা কখন দুঃখের যাতনা জান না, অতএব সবিনয়ে নিবারণ করিতেছি, বনগমনে বাসনা করিও না। তোমার সুকোমল অঙ্গ কখন বনপর্য্যটনের অসহ্য যাতনা সহিতে পারিবে না। সুকুমারী কহিলেন, হৃদয়নাথ! পতিই কেবল সতীর একমাত্র গতি ও জীবন-সর্ব্বস্ব, অতএব জীবন-পতি বনে বিদায় দিয়া শূন্য দেহ গৃহে রাখিয়া ফল কি? দেখুন মহারাজ সত্যবানের জায়া সাবিত্রী, ভগবান্ রামচন্দ্রের সীমন্তিনী সীতা, শ্রীবৎসের দয়িতা চিন্তা, নলের ললনা দময়ন্তী পতিসঙ্গে বনচারিণী হইয়া, পতির পদসেবা করিয়া, ইহলোকে ও

পরলোকে যশস্বিনী হইয়াছিলেন; অতএব আমিও তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পতি-ধর্ম্মের পথবর্ত্তিনী হইব, আপনি তাহার অন্তরায় হইয়া আমাকে অনুগামিনী হইতে নিষেধ করিবেন না। গৃহস্থ ব্যক্তি অতুল-ঐশ্বর্য্য-স্বামী হইয়া স্ত্রীবিহীন হইলে, তিনি যেমন গৃহস্থ বলিয়া গণ্য হন না এবং পদে পদে বিপদাপন্ন হন, সেইরূপ, লোকে যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক বনবাসী হইলেও গৃহস্থাখ্যা পরিত্যাগ ও বিপদাশ্রয় করেন না। আমি কি সুখে গৃহে থাকিব? আপনার পদসেবার্থ আপনার সহিত বনবাসিনী হইব। যদি নির্দ্দয় হইয়া আপনি আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করেন, তবে আমি দুঃখভারাক্রান্ত দেহ উদ্বন্ধনে ত্যাগ করিব।

বসন্তকুমার নিরুত্তর হইয়া সারথিকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, সারথে! প্রজাগণের হিতার্থ অদ্য রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া আমি বনযাত্রা করিব, ত্বরায় রথ প্রস্তুত কর। সারথি সত্বর প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, মহারাজ! রথ প্রস্তুত, আরোহণ করুন। তিনি সভাসদগণের নিকটে বিদায় লইয়া সুকুমারীর আগমনাপেক্ষায় দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিলেন।

সুকুমারী গমন-সময় উপস্থিত দেখিয়া পুরবাসিনিগণের স্থানে একে একে বিদায় লইয়া ছলছলচক্ষে সখীদিগকে কহিতে লাগিলেন, সখি চন্দ্রিমে! সখি উমে! আমি পতির সঙ্গে বনে যাইতেছি, তোমরা আমাকে বিদায় দাও। সখীরা অকস্মাৎ এই নিদারুণ কথা শুনিয়া সরোদন বদনে কহিলেন, সখি! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে বল। আমরা তোমার বিচ্ছেদ কখন সহিতে পারিব না, আমাদিগকেও সঙ্গে লইয়া চল। সুকুমারী কহিলেন, সখি! আমি দৈব-দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছি, না জানি কত কষ্টই বা ভোগ করিব; যদি জীবিতা থাকি, তবে কোন না কোন সময় তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুখী হইব; নতুবা জন্মের মত বিদায় হইলাম। সখি! তোমাদিগের আত্মীয় সহচর ও প্রজারঞ্জন ভূপতি আমার অপেক্ষায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, তোমরা আমাকে বিদায় দাও। এইরূপ কহিতে কহিতে তাঁহার দুটী চক্ষু অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল। সখীরাও তাঁহাকে সজলচক্ষে বিদায় করিলেন।

দম্পতী রথারোহণ করিলে, সারথি রথ চালাইতে লাগিল। চন্দ্রিমা আর উমা, বরাহ যে প্রকার হতজ্ঞান হইয়া অগ্নি দর্শন করে, কুরঙ্গ যে প্রকার ব্যাধগণের বংশীধ্বনি শ্রবণ করে, তাহার ন্যায় রথপানে অনিমিষনেত্রে চাহিয়া থাকিলেন। যখন তাহার ধ্বজা পর্য্যন্ত অদর্শন হইল, তখন উভয়ে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সরোদন-বদনে গৃহে আগমন করিলেন। রথ রাজধানী, নগর, গ্রাম

পশ্চাৎ করিয়া এক বনের সন্নিহিত হইল। বসন্তকুমার কহিলেন, সুত! আমরা এই স্থান হইতে পদব্রজে গমন করিব, তুমি সংবাদ লইয়া রাজধানীতে প্রতিগমন কর। এই বলিয়া তাঁহারা পতি পত্নী রথ হইতে অবরোহণ করিলেন।

আহা! সেই সময়ের কি আশ্চর্য্য ভাব! ধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া অধর্ম্মের ভয়ে নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জন বনে গমন করিতেছেন, এবং রাজলক্ষ্মী যেন রাজান্তঃপুর হইতে অন্তর্হিতা হইয়া ধর্ম্মের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছেন! এইরূপে, পতিব্রতা সুকুমারী পতির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। বন্ধুর-ভূমি-প্রযুক্ত বারংবার পদস্খলন হইয়া কঙ্কর ও কণ্টকাদিতে তাঁহার সুকুমার কুসুম-দল-সদৃশ পদতল ক্ষতবিক্ষত হওয়ায়, শোণিতের ধারা কণ্টকচিহ্নের লাবণ্য বৃদ্ধি করিল; মন্থর গমন দেখিয়া পতি পাছে বিরক্ত বোধ করেন, এই ভয়ে তিনি সেই অসহ্য যাতনাও সহ্য করিয়া অশ্রুজল অম্বরে সংবরণ করিতে করিতে পতির অনুগামিনী হইলেন। কিন্তু কিছু দূর গমন করিলে পর কোমলাঙ্গী রাজবালার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদয় ক্রমশঃ অবশপ্রায় হইয়া আসিল; সুতরাং তখন তিনি বিপরীত-বায়ুতাড়িত রথপতাকার ন্যায় তরঙ্গিনী হইয়া অগ্রবর্ত্তী পতিকে কাতরস্বরে কহিলেন, প্রিয়তম! ধীরে চল, আমি দ্রুতগমনে ক্রমেই অক্ষম হইতেছি। বসন্তকুমার অনুব্রজে তাঁহাকে হস্তে ধরিয়া গমন করিতে করিতে কহিলেন, প্রিয়ে! অগ্রেই বলিয়াছি, তুমি দুস্তর বনপথে চলিতে পারিবে না। তখন আমার বারণ শুনিলে না, এখন অতি অল্পক্ষণ চলিয়াই সূর্য্যকর-ম্লান লতিকার ন্যায় ক্লান্ত হইলে; হায়! ইহার পর দুর্গম পথে তোমার কি দশা হইবে, তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

এই অবস্থায় কতক দূর গমন করিয়া বসন্তকুমার কহিলেন, প্রিয়ে! এই দেখ তমোময়ী যামিনী চারি দিক্ অন্ধকার করিয়া আক্রমণ করায় দিনপতি ক্রোধে আরক্ত হইয়াছেন। দিবাবসানের অধিক বিলম্ব নাই, চল এই সময়ে দ্রুত গমন করিয়া আমরা কোন মুনির আশ্রমে উপস্থিত হই। নতুবা এই বিজন বনে রজনী হইলে বনবিহারী হিংস্র পশুর তীব্র নখরে শরীর বিদীর্ণ হইয়া, আমাদিগের শোণিত পৃথিবী বা বৃকোদরে স্থিতি করিবে। সুকুমারী সভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে তাঁহারা প্রদোষসময়ে এক মুনির আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর তথায় অতিথিসৎকার গ্রহণানন্তর যামিনীযাপন করিলেন, পর দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া পুনর্ব্বার বনপথে চলিলেন।

বৎস সকল! বিপদে পতিত হইলে, বিদ্বান্ ব্যক্তিও বিবেচনাশূন্য হন, এবং

বৃহস্পতিসদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিও হতবুদ্ধি হইয়া, বিপরীত ভাব অবলম্বন করেন; নতুবা ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র কেন স্বর্ণমৃগানুসারণে গমন করিয়া, সহধর্ম্মিণী সীতাকে দুর্জ্জয়-রাবণ-হস্তে সমর্পণ করিবেন? বসন্তকুমার সপত্নীক হইয়া বন ভ্রমণ করিতেছেন, এক দিন অকস্মাৎ যেন "অরে প্রাণের ভাই বসন্ত।" এই বাক্যটী তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল, তখন বিজয়চন্দ্রের কথা আদ্যোপান্ত যত স্মরণ হইতে লাগিল, তিনি ততই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, কিন্তু কোন্ দিকে ঐ শব্দ হইল কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; হতবুদ্ধি ও ছিন্নমতি হইয়া, প্রিয়তমা সহচরীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে মনে মনে স্থির করিলেন। অনন্তর দম্পতী এক দিবস প্রাতঃকাল অবধি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত বনভ্রমণ করায় অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া, এক অশ্বত্থ বৃক্ষের বিস্তীর্ণ ছায়ায় বসিলেন। অসূর্য্যম্পশ্যরূপিণী সুকুমারী অনলতাপিত বন-পল্লবিনী তুল্য বিশীর্ণা হইয়া, পতির অঙ্কদেশে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন, এবং জলশূন্য সরোবরের নলিনীর ন্যায় আকাশমুখী হইয়া, পতির আতপ তাপিত মুখ দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, নাথ! যে মুখেন্দু দেখিয়া আমার সুখ-সিন্ধু উচ্ছলিত হয়, আজি তাহাতে বিচ্ছেদতরঙ্গ উঠিতেছে কেন? অন্য দিন ত এমন হয় না। আজি অভাগিনীর মন কেন অকথা কহিতেছে? প্রাণ কেন এমন ব্যাকুল হইতেছে? হৃদয় কেন দহিতেছে? অন্তঃকরণ নিমেষকালও স্থির নয়, আমার এ কি হইল? কেন দক্ষিণ চক্ষু নাচিতেছে? প্রাণনাথ! আজি কেন ছলছল চক্ষে বারে বারেই দাসীর মুখ পানে চাহিতেছ? দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছ? কথা কহিতে কহিতে আর কহিতে পারিতেছ না? প্রিয়া বলিতেই দুটী নয়ন জলে ভাসিতেছে; ভাবে বোধ হয় বুঝি আমার সর্ব্বনাশ করিবে। এইরূপ কহিতে কহিতে তিনি শ্রান্তিতে মৃতপ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

বসন্তকুমার সুকুমারীকে অতি নিদ্রিত দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহাকে পরিত্যাগ করিবার এই এক সময় উপস্থিত। এইরূপ চিন্তা করত জানুদেশ হইতে প্রেয়সীর মস্তক নামাইয়া অতি ধীরে ধীরে ভূমিতে রাখিয়া, কতকদূর চলিয়া গেলেন। আহা! প্রণয়ের কি আশ্চর্য্য আকর্ষণ, প্রদোষ-কালে চক্রবাক যেমন চক্রবাকীকে সস্নেহ-নয়নে নিরীক্ষণ করে, তিনি প্রত্যাগমন করিয়া প্রেয়সীকে তদ্রূপ সস্নেহনয়নে দেখিতে লাগিলেন। তখন মনে মনে কহিতে লাগিলেন, বিনা দোষে কুলকামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অতি নিষ্ঠুরের কর্ম্ম। আমার অভাবে ইহার দশা কি হইবে; এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এই কালে দুর্মতি

আসিয়া তাঁহাকে কহিল, 'তুমি কি চিন্তা করিতেছ? তোমার অগ্রজ বড় ব্যাকুল হইয়াছেন। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে কখন তাঁহার অন্বেষণ হইবে না, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র চল।" তখন তিনি এককালে হতজ্ঞান হইয়া প্রণয়িনীর নিগূঢ় প্রণয়-পাশ বিমোহাস্ত্রে ছেদন করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সুকুমারী অনাথিনী হইয়া একাকিনী বিজন বনে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। দেখিলে বোধ হয় যেন সৌদামিনী স্থিরমূর্ত্তি হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনে ধরণীপৃষ্ঠে নিদ্রা যাইতেছেন। পতির গমনের পর অৰ্দ্ধপ্রহরান্তে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চকিতা হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিলেন পতি নিকটে নাই। সেই সময় তাঁহার অন্তঃকরণে কত অমঙ্গল ভাবের উদয় হইল। একবার মনে করিলেন, বুঝি অন্তরালে থাকিয়া নাথ আমার মন পরীক্ষা করিতেছেন। আবার মনে করিলেন, আমি ঘোর নিদ্রিত হইয়াছিলাম, নররক্ত-লোলুপ ব্যাঘ্র তাঁহাকে বধ করিয়াছে। ইহাও মনে করিলেন বুঝি ভারাক্রান্ত বোধ করিয়া নাথ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া আর্য্যপুত্রসম্বোধনে বারংবার ডাকিতে লাগিলেন, কোন উত্তর পাইলেন না। তখন একবারে হতাশ হইয়া হাহা শব্দে ধরাতলে পতিত ও বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন,এবং আপনার নয়নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,রে অভাগিনীর নয়ন! আমি তোকে পতির প্রহরী রাখিয়াছিলাম, তুইও কি কাল-নিদ্রা আনিয়াছিলি? রে পরদর্শনচতুর! তুই চির-পরিচিত অঙ্গবস্ত হইয়াও বিশ্বাসঘাতক হইলি? তোর দোষেই আমি তেজোময় পুত্তলি হারাইলাম সুতরাং চারি দিক্ অন্ধকারময় দেখিতেছি; হায়! আজন্ম তোকে সযত্নে রক্ষা করিলাম, তাহার ফল কি শেষে এই হইল! আমি ত ইহা কখন জানি না, আমার অঞ্চল হইতে অমূল্যনিধি অরণ্য-পাথারে খসিয়া পড়িবে। শয়নে স্বপনে কখন কাহার মন্দ করি নাই তবে কে আজি আমার শিরোমণি হরণ করিয়া, মণিহারা ফণিনীর দশা করিল। ওরে নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ! আমি তোর ভয়ে রাজ্যপাট পরিত্যাগ করিয়া পতির সঙ্গে বনচারিণী হইলাম, এই বিজন বনেও তুই উপস্থিত হইয়া আমাকে আপন-অধীনী করিলি! হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল, এখন আমার গতি কি হইবে। আমি কাহার আশ্রয়ে দাঁড়াইব? কে আমায় রক্ষা করিবে? হা মাতঃ! হা পিতঃ! হা প্রিয়সখি চন্দ্রিমে! হা উমে! তোমরা কোথায়? আমি অনাথিনী হইয়া, একাকিনী এই বিজন বন-পাথারে পড়িয়াছি, তোমরা আসিয়া এ দুঃখিনীকে আশ্রয় দাও। হে বনদেবতে! আশ্রয় ও সহায়হীনা দুঃখিনী অবলার প্রতি সদয় হও, মূর্ত্তিমান হইয়া পতির

প্রবেশপথ-প্রদর্শক হও, আমি আর পতির বিরহ সহিতে পারি না। হা বিধে! এ বিজন বনে ত আমার কেহই নাই, কেবল তুমিই জাজ্জল্যমান রহিয়াছ। তবে আর কে? তুমিই আমার পতিকে চুরি করিয়াছ। কেননা তোমার এই ব্যবসায়, তুমি কাহাকে কাঁদাও, আবার কাহাকেও হাসাও। যদি বল; ব্যাঘ্র তোমার পতিকে নষ্ট করিয়াছে, তবে তুমিই ব্যাঘ্ররূপ ধরিয়া আমার প্রাণপতিকে নষ্ট করিয়াছ; যদি বল, তিনি দুর্ম্মতি হইয়া তোমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা হইলেও তোমাকেই বলি, তুমিই পতিকে দুর্ম্মতি দিয়াছ। যেরূপে হউক, তুমিই আমার পতিকে লইয়াছ। অতএব তোমাকেই বলি, আমার প্রাণ গেল তাহাতে ক্ষতি নাই, তাঁহাকে নষ্ট করিও না, তিনি যে অতি যত্নের ধন, তাঁহাকে অযত্ন করিও না, বিপদে আশ্রয় দিও, ক্লান্ত হইলে তৎক্ষণাৎ কোলে করিও। এইরূপ রোদন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্য্যাস্তকাল উপস্থিত হইল। তখন তিনি শোকে ও ভয়ে জড়ীভূত হইয়া দুটী হস্ত তুলিয়া, ঊর্দ্ধদৃষ্টে কহিলেন, হে পরমেশ্বর! তুমি অনাথবন্ধু, এ অনাথিনী বিপত্তিতে পড়িয়া তোমার শরণ লইতেছে, তুমি ধর্ম্ম রক্ষা কর।

এই অবস্থায় কতক দূর চলিয়া গিয়া দেখিতে পাইলেন, পর্ব্বত-নির্ঝর নিকটে পরিষ্কৃত-পাষাণ-নির্ম্মিত একটী মনোহর মন্দির শোভা পাইতেছে, এবং অলঙ্কৃতা একটী দিব্যাঙ্গনা, সোপানাসনে বসিয়া হা নাথ! হা নাথ! শব্দে রোদন করিতেছেন। তাঁহার অশ্রুজল অবিশ্রান্ত পতিত হইয়া তরঙ্গিণীর তরঙ্গ-তুল্য নির্ঝর-নীরে মিশ্রিত হইতেছে। দেখিলে বোধ হয়, ভাগীরথী যেন শান্তনু রাজেন্দ্রের বিরহে ব্যাকুলা হইয়া রোদন করিতেছেন। এই চমৎকার ব্যাপার দেখিবামাত্র, সুকুমারীর পতিবিরহানল কতক নির্ব্বাণ হইল। কেননা আত্মসদৃশ দুঃখিত জনকে দেখিলে, আপনার দুঃখের অনেক লাঘব হইয়া আইসে এবং অন্যের দুঃখের কারণ জানিতে মন একান্ত ব্যগ্র হইতে থাকে।

সুকুমারী মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমার যে দশা, বোধ করি, ইঁহারও সেই দশা হইয়া থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; ইনিও আমার মত, হা নাথ! হা নাথ! বলিয়া রোদন করিতেছেন। পরে তাঁহার নিকটবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়সখি, তুমি রোদন কর কেন? রোদনশীলা রমণী কহিলেন, প্রিয়ভাষিণি! কেন আমাকে সখী বলিয়া

ডাকিতেছ ? আহা ! তোমার মধুর সম্ভাষণে আমার প্রাণ শীতল হইল। সুকুমারী কহিলেন, না আমি আপনাকে সখী বলিয়া ডাকি নাই, আমার দশা আপনার দশাকে সখী বলিতেছে ; কেননা আমি যেমন হা নাথ ! হা নাথ ! বলিয়া বনে বনে রোদন করিতেছি, আপনিও তদ্রূপ হা নাথ ! হা নাথ ! বলিয়া রোদন করিতেছেন। রোদনশীলা রমণী, সুকুমারীকে নিকটে বসাইয়া কহিলেন, ভদ্রে ! তোমার মুখপানে চাহিয়া আমার দুঃখের অনেক লাঘব হইতেছে, বোধ হয় তুমি জন্মান্তরে আমার ব্যথার ব্যথিতা ছিলে, সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কেন বনে আসিয়া এই দুঃখের দশায় পড়িয়াছ ? আপনার সখী কিংবা জননীর নিকটে দুঃখের কথা কহিলে যেমন অনর্গল অশ্রুজল নির্গত হয়, সুকুমারী সোপান-বাসিনীকে আপনার দুঃখের কথা কহিয়া সেইরূপ রোদন করিতে লাগিলেন। সোপানবাসিনী, সুকুমারীর দুঃখের কথা শুনিয়া আপনার দুঃখ হইতেও অধিক বোধ করিয়া রোদন-বদনে আপনার বসনাঞ্চলে সুকুমারীর দুটী চক্ষের জল মুছাইতে লাগিলেন, এবং সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ভাল, বল দেখি, তোমার প্রতি আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ হইতেছে কেন ? যেন তোমার সঙ্গে দীর্ঘকাল একত্র ছিলাম, অতি অল্প দিনের জন্য বিচ্ছেদ হইয়াছে। যাহা হউক, আমি তোমাকে ভগিনী সম্বোধন করিব। সুকুমারী কহিলেন, আপনাকে দেখিবামাত্র আমার মনে ভক্তি-রসের উদয় হইয়াছে। এবং ভগিনীর নিকটে দুঃখের কথা বলায় সেইরূপ আমার দুঃখের অনেক লাঘব বোধ হইতেছে। অতএব আপনি আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী। উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতে লাগিল।

অনন্তর সুকুমারী কহিলেন, দিদি ! আপনি কিরূপে এই দুঃখের দশায় পড়িয়াছেন, তাহা শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। মন্দিরবাসিনী পতিবিরহিণী কহিলেন, ভগিনি ! আমার দুঃখের কথা সামান্য নয় যে সংক্ষেপে বলিব। তুমি পতি-বিরহে বনে বনে রোদন করিয়া ব্যাকুল হইয়াছ এবং আমিও অনেকক্ষণ রোদন করিয়া কাতর হইয়াছি। এস আমরা নির্ঝর জলে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া মন্দিরে গমন করি। যত দিন পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ না হয়, ততদিন এই নির্জ্জন স্থানেই থাকিব। তুমিও আমাকে কত কথা কহিবে এবং আমিও তোমাকে কত দুঃখের কথা কহিব। এই বলিয়া দুজনেই নির্ঝর নীরে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। মন্দিরবাসিনী কহিলেন, ভগিনি ! আমার দুঃখের কথা শুন।

বিজয়পুরাধিপতি রমণীমোহন নামে অতি পুণ্যশীল রাজা ছিলেন। আমি তাঁহার একমাত্র কন্যা, আমার নাম বিমলা। আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন পিতা সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। মাতা কেবল আমাকে অবলম্বন করিয়া পতি-বিরহ বিস্মৃত হইলেন; প্রধান মন্ত্রী রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। আমার কন্যাকাল গত হইলে, মাতা বর-জামাতার জন্য অনেক যত্ন পাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই তাহা সংঘটন করিতে পারিলেন না। পরে দৈব নির্ব্বন্ধ দৈবেই সম্পন্ন করিলেন।

আমার পিতা মৃগয়ায় গিয়া কয়েকটী হস্তী ধৃত করেন, তাহার মধ্যে একটী হস্তী তাঁহার অতিশয় প্রিয় হইয়াছিল। তিনি যখন যেখানে যাইতেন, হস্তীটী প্রায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিত। বিশেষতঃ সে পিতার স্নানকালে দন্তে সিংহাসন ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিত। পিতা প্রায় প্রত্যহই তাহাতে উঠিয়া স্নান করিতে যাইতেন, এবং স্বহস্তে তাহার গাত্র মার্জ্জন করিয়া দিতেন। এই হেতু হস্তী তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিল। পিতার মৃত্যু হইলে হস্তী অত্যন্ত শোকান্বিত হইয়া উন্মত্তের প্রায় বনে গমন করে। অমাত্য তাহাকে নিবারণ করিতে অনেক যত্ন পাইলেন, সে বারণ কোনরূপেই বারণ মানিল না। পরে কয়েক বৎসর গত হইলে হস্তী দৈবাৎ একটী সুন্দর-কান্তিযুক্ত একটী পুরুষকে করবেষ্টন করিয়া সভায় উপস্থিত হইল। দেখিয়া সকল লোক একেবারে বিস্ময়াপন্ন। ভগিনি! তুমি যে বলিলে; তোমার পতি বসন্তকুমারের অগ্রজ বিজয়চন্দ্র জল আনিতে গিয়া ফিরিয়া আসেন নাই, বোধ হয় ইনিই তোমার পতির অগ্রজ হইবেন।

তাহার পর হস্তী করবেষ্টিত পুরুষকে পিতার সিংহাসনে স্থাপিত করিল। সভাস্থ সমস্ত লোক ব্যস্ত হইয়া অনেক শুশ্রূষা করায়, তিনি চৈতন্য পাইলেন। পরে পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে, তোমার পতি যেমন জয়পুরাধিপতি জয়সেন রাজার পুত্র বলিয়া পরিচয় দেন, ইনিও সেইরূপ পরিচয় দিলেন এবং যে যে দুরবস্থা হইয়াছিল তাহাও বিশেষ করিয়া কহিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ বসন্তকুমার পিপাসায় কাতর হইয়া মৃতবৎ হইলে, তিনি তাঁহাকে একাকী বিজনবনে রাখিয়া জলান্বেষণে গমন করিয়াছিলেন, হঠাৎ মত্ত-মাতঙ্গ তাঁহাকে করবেষ্টন করিয়া সভায় উপস্থিত করিয়াছে। বসন্তকুমার বিজনবনে একাকী পতিত রহিয়াছেন—এইমাত্র কহিতেই তিনি ভ্রাতৃ-শোকে মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রুধারা নির্গত হইতে লাগিল। অমাত্য এই পরিচয় পাইয়া বসন্তকুমারের

অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে তূর্ণগতি তুরঙ্গারোহীদিগকে প্রেরণ করিলেন। ভগিনি সুকুমারি! তোমার বাক্যানুসারে বোধ হইতেছে. সারদ্বাজ মুনি বসন্তকুমারকে পূর্ব্বেই আপন আশ্রমে লইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং প্রেরিত অশ্বারোহী দূতগণ নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই সংবাদ শ্রবণে আমার পতি বিজয়চন্দ্র এককালে হতজ্ঞান হইলেন। ক্রমে তাঁহার আরোগ্যের সহিত শোকাপনোদন হইতে লাগিল। মাতা তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও রূপে সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় করে, শুভদিনে আমাকে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি প্রজাবর্গের সম্মতিক্রমে রাজা হইয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

আমি একদিন ইচ্ছাবতী হইয়া কহিলাম, প্রাণপতে! চিত্ততোষ-বিপিনে আমার পিতার এক প্রমোদমণ্ডপ আছে, যদি ইচ্ছা হয় তবে চলুন, তথায় কিছু কাল বাস করিয়া বনচরগণের স্বাভাবিক অবস্থা দর্শন করি। তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া আমার সঙ্গে তথায় গমন করিলেন। নানারূপ কৌতুকে কিছুকাল গত হইল, পরে এক নিশি তিনি অকস্মাৎ শয্যা হইতে উঠিয়া "প্রাণের ভাই রে বসন্ত!" এইমাত্র কহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আমি অনেকবার জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার কথায় উত্তর না দিয়া উন্মত্তের ন্যায় বনাভিমুখে চলিলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। অনন্তর তিনি দ্রুতবেগে কোন্ দিকে চলিয়া গেলেন, কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া আমি বনে বনে রোদন করিতে করিতে চলিলাম। কিছুদিন পরে এই স্থান পাইয়া, পতির বিরহ-বাসরে বাস করিতেছি।

বিমলা আপনার দুঃখের কথা সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, ভগিনি! তোমাকে যথার্থই ভগিনী সম্বোধন করা হইয়াছে। কেননা দুজনের পরিচয়ে বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, তোমার পতি আমার পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এরূপ কহিয়া দুজনেই রোদন করিতে লাগিলেন। রজনীও প্রভাতা হইল।

প্রত্যূষে বনমধ্যে কল কল শব্দ হইতে লাগিল, ক্রমে ঐ শব্দ নিকটবর্ত্তী হওয়াতে, বিমলা শুনিতে পাইলেন, "হায় কি হ'ল রে! এত পর্য্যটন করিলাম, কোন স্থানে ইঁহাদের অন্বেষণ পাইলাম না, ইঁহারা কোথায় গেলেন!" কেহ কহিতেছে "এই নিদারুণ কথা শুনিলে মহিষীর কি দশা হইবে, তাহা মনে করিতেই বুক বিদীর্ণ হইতেছে, তাঁহার সবে মাত্র এক কন্যারত্ন অবলম্বন। তিনি কন্যা-জামাতাকে তিলার্দ্ধ কাল না দেখিলে বৎস-হারা গাভীর ন্যায়, ব্যাকুলা হন। ভাল 'অগাত্য মহাশয়'! এই যে মন্দিরটা দেখা যাইতেছে, ঐ খানে একবার গমন করুন দেখি কোন তত্ত্ব পাওয়া যায় কিনা?"

এই বলিয়া সকলেই মন্দিরাভিমুখে আগমন করিল। বিমলা কহিলেন, ভগিনি সুকুমারি! আর ভয় নাই, আমাদের অন্বেষণে সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া অমাত্য আসিয়াছেন। এই বলিয়া মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইলেন। অমাত্য দূর হইতে দেখিয়া দ্রুতবেগে নিকটে আসিয়া কহিলেন, "হাঁ মা! আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা পতি পত্নী উভয়ে কি জন্য হিংস্র-জন্তুর আবাস বন পর্য্যটন করিতে আসিয়াছিলেন? যদি এই মন্দির দেখিতে আসিয়া থাকেন, তবে কেন পরিচারিকাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। এক্ষণে মহারাজ কোথায়?" বিমলা যে ঘটনা হইয়াছিল, সমস্ত কহিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অমাত্য সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, বৎসে! আর রোদন করিও না, আমি সত্বরেই তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া আনিতেছি। অনন্তর, সুকুমারীর দিকে বারংবার দৃষ্টি করায়, বিমলা অমাত্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া, সুকুমারীর সহিত যেরূপে তাঁহার পরিচয় হয়, সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইল। অমাত্য কহিলেন, বিমলে আকার প্রকারে বোধ হইতেছে, ইনি আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী। যাহা হউক, মহিষী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, চলুন শীঘ্র শীঘ্র রাজধানীতে গমন করা যাউক। পরে এক সঙ্গে সকলেই গমন করিলেন।

যথাসময়ে সকলে রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, মহিষী বিশেষ সংবাদ পাইয়া জামাতৃ-শোকে অতিশয় কাতরা হইলেন। অনন্তর বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারের অন্বেষণে দেশ-দেশান্তরে লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। পরে অনেকের সম্মতিতে নিরূপিত হইল, বিমলা ও সুকুমারীর পুনর্ব্বার বিবাহ ঘোষণা, পত্র দ্বারা, সর্ব্বত্র প্রকাশ করা যাউক। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার যদি জীবিত থাকেন, তবে ঘোষণা শ্রবণমাত্র, অবশ্যই বিজয়পুরে উপস্থিত হইবেন। দূতগণ ঘোষণাপত্র গ্রহণ করিয়া নানা দেশ-দেশান্তরে গমন করিতে লাগিল।

নৃপতিগণ পতঙ্গপালের ন্যায় চারি দিক্ হইতে আসিয়া সমাগত হইলেন। ভারদ্বাজ মুনি ও রাজা আনন্দময়, সস্ত্রীক বসন্তকুমারের বন-যাত্রার সংবাদ পাইয়া নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়াছিলেন, অতএব স্নেহ-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহারাও সস্ত্রীক বিজয়পুরে উপস্থিত হইলেন। অধিক কি, এই কৌতুক দেখিতে রাজা জয়সেনও বিজয়পুরে উপস্থিত হন। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার, বিমলা ও সুকুমারীর পুনঃ পরিণয় হইবে, পরস্পর বিভিন্ন দেশে এই সংবাদ শ্রবণে যারপরনাই উদ্বিগ্ন হইয়া, বিজয়পুরে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সহসা সভাপ্রবেশ না করিয়া দুইজনেই বহির্দ্বারে

দাঁড়াইয়া থাকিলেন। কেননা তৎকালীন সেই দুঃখের দশা দেখিয়া সভা-প্রবেশ কালে দ্বারী পাছে অপমান করে, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে এই আশঙ্কা হইয়াছিল। চিনিবার সাধ্য নাই, তথাচ দুজনে পরস্পর পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া থাকিলেন, এবং অপরিচিত সম্ভাষণে প্রণয়ের ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বসন্তকুমার কহিলেন, মহাশয়! ইতস্ততঃ বিবেচনা করিতেছেন কেন? বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া আর কি ফল আছে, আসুন সভামণ্ডপে প্রবেশ করি। বিজয়-চন্দ্র কহিলেন, ভাই! সমাজের নিয়ম অবগত না হইয়া, তাহাতে হঠাৎ গমন করা উচিত হয় না। বসন্তকুমার আব বিলম্ব না করিয়া অগ্রেই সভাপ্রবেশ করিলেন। দৌবারিক বিজয়চন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সেই দীন বেশ এবং শ্মশ্রুশ্রেণী দেখিয়া সন্দিহান হইয়া কহিল, আপনিও সভায় যাইতে পারেন, বারণ নাই। বিজয়চন্দ্র দৌবারিকের কথা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন, এ আমাকে চিনিয়া থাকিবে, ভয়ে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, এই চিন্তা করিয়া সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক অপরিচিত বিদেশীয় লোকের পশ্চাদ্ভাগে বসিলেন।

বিমলা কর্ণীগৃহ হইতে পতিকে চিনিতে পারিয়া সুকুমারীকে অঙ্গুলী-সঙ্কেত দ্বারা দেখাইয়া কহিলেন, ভগিনি! আমার পতি সভায় উপস্থিত। কিন্তু তোমার পতি আসিয়াছেন কি না, জানিতে না পারিয়া আমার হৃদয় বড় ব্যাকুল হইতেছে। সুকুমারী কহিলেন, দিদি! তিনিও আসিয়াছেন, এই বলিয়া যবনিকার অন্তরাল হইতে দুজনেই দুজনের স্বামীকে দেখাইতে লাগিলেন।

নৃপতিগণ সভারূঢ় হইলে, কি প্রবন্ধে তাঁহাদিগকে বিদায় করা যাইবে, তদুপায় পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। বিমলা ও সুকুমারী আপন আপন পতির নিকটে তাঁহাদের পূর্ব্বাবস্থা যেরূপ শুনিয়াছিলেন, তদনুসারে রাজা জয়সেনের পূর্ব্ববৃত্তান্ত অবধি এই সভা পর্য্যন্ত সমুদয় সঙ্কলন করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। এক্ষণে বিমলা তালবৃন্ত ব্যজনিকার করে সেই পত্রিকা প্রদান করিয়া কহিলেন, বৃন্ত-ব্যজনিকে! অমাত্যকে সভামধ্যে এই পত্রিকা পাঠ করিতে বল। বৃন্ত-ব্যজনিকা পত্র প্রদান করিলে, অমাত্য উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে লাগিলেন।

বৎসগণ! তোমরা নিদ্রালস্যে নিতান্ত কাতর হইয়া ক্রমেই অন্যমনস্ক হইতেছ; বর্ণনীয় প্রস্তাব আর অধিক নাই, জাগরিত থাকিয়া কিয়ৎকাল মনোনিবেশ কর। আমি অবিলম্বেই প্রবন্ধটী উপসংহার করিতেছি। বিমলা ও সুকুমারী যাহা রচনা করিয়া প্রবন্ধাকারে পরিণত করেন, তাহা পুনরুল্লেখ করিলে, বিজয়-বসন্তের জন্মবৃত্তান্ত হইতে এই সভা পর্য্যন্ত সমুদয় বর্ণন করিতে হয়। অতএব

তাহা কেবল দ্বিরুক্তি মাত্র। তোমরা মনে মনে স্মরণ করিয়া অনুভব কর। এ ক্ষণে পত্রপাঠে যে ফল ফলিত হইল, বিস্তারপূর্ব্বক আমি তাহাই বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ কর।

পত্রিকার কিয়দংশ পাঠ হইলে প্রথমতঃ নৃপতি জয়সেন রোদন করিতে লাগিলেন, পরে বিজয়চন্দ্র, তদন্তে বসন্তকুমার। অমাত্য সুকুমারীর দুঃখবিষয়িণী প্রবন্ধ করুণ স্বরে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা আনন্দময় নৃপতি সংসার-বাসনা পরিত্যাগ করিয়াও অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না। সারদ্বাজ মুনি তাঁহাকে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই ক্রন্দনই তাঁহাদিগের পরস্পর সকলেরই পরিচয় প্রদান করিল। বিজয়চন্দ্র বাহুযুগল দ্বারা বসন্তকুমারের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ঘনীভূত শোক-সাগর অন্তস্তাপে নবীভূত হইয়া উঠিল। বসন্তকুমারও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে অগ্রজকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সভ্যগণ অকস্মাৎ কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে রোদন করিতে দেখিয়া প্রথমতঃ আশ্চর্য্য বোধ করিলেন; পরে পত্রিকার শেষাংশ পঠিত হইলে, সকলেই রাজা জয়সেনকে ভর্ৎসনা করিয়া গৃহে গমন করিলেন। সভাভঙ্গ হইলে নৃপতি জয়সেন, বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারকে নিকটে বসাইয়া সরোদন-বদনে কহিলেন, পিতা মাতা অশেষ দোষী হইলেও পুত্রের পরিত্যাজ্য নয়। সহোদরদ্বয় পিতাকে বন্দনাতে সান্ত্বনা করিয়া মুনির সহিত রাজা আনন্দময়কে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমারের অনুরোধে আপন আপন সহধর্ম্মিণীর সহিত রাজা রমণীমোহনের অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। অকস্মাৎ জনক জননী ও সারদ্বাজ মুনিকে সমাগত দেখিয়া সুকুমারীর আনন্দধারা বহিতে লাগিল। এইরূপ পরস্পর সম্ভাষণে ও পরিচয়-গ্রহণে দিনমণি অস্তমিত হইল। যামিনীযোগে বিমলা ও সুকুমারীর পতি সমাগমে দুঃখের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠিল। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার পরস্পর আপন আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনায় স্বস্বসহধর্ম্মিণীকে সান্ত্বনা করিলেন। অনন্তর সারদ্বাজ মুনি ও রাজা আনন্দময় বিজয়পুরে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার শান্তাকে দেখিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া সহধর্ম্মিণী সহিত জয়পুরে গমন করিলেন।

শান্তা তাঁহাদিগের আগমনসংবাদ পাইয়া দরিদ্রের স্বর্ণলাভ ও অন্ধের নয়নপ্রাপ্তির ন্যায়, আহ্লাদিতা হইল। তৎকালে তাহার জরাবস্থা, চলৎশক্তি ছিল না, তথাচ যষ্টিতে নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। দম্পতীদ্বয় রথ হইতে

অবরোহণ করিয়া শাস্তাকে প্রণাম ও সম্ভাষণপূর্ব্বক অন্তঃপুরে বিমাতার সম্ভাষণে চলিলেন। রাজ্ঞী প্রণত পুত্রদিগকে সলজ্জবদনে "আয়ুষ্মান্ হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, এবং বধূদ্বয়কে সাদরে নিকটে বসাইয়া সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিজয়চন্দ্র ও বসন্তকুমার এইরূপে দুঃখের তরঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল জয়পুরে অবস্থিতির পর, স্বস্ব শ্বশুর-রাজ্যে' প্রতিগমন করিলেন। জয়সেন রাজার পরলোক হইলে, স্বস্বশ্বশুরদত্ত রাজ্য পৈতৃক রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া কিছুকাল মর্ত্ত্যলোকে সুখ-সম্ভোগ-পূর্ব্বক, শাপান্তে স্বস্থানে গমন করিলেন।

মহর্ষি এইরূপে উপন্যাস সমাপ্ত করিয়া কহিলেন, বৎস সকল! শুনিলে ত, এই এক দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত হেতু গন্ধর্ব্বপতিরা পতি পত্নী কত দুর্গতি ভোগ করিয়াছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণ অথবা যে কোন জাতি হউক না কেন, মনে ক্লেশ পাইয়া কোন অভিসম্পাত করিলে তাহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। রজনী প্রায় শেষ হইয়াছে, তোমরা গিয়া শয়ন কর, এই বলিয়া তিনি আপনিও শয়ন করিলেন।

সমাপ্ত

কবিকল্প।

দক্ষযজ্ঞ।

সতী।

দক্ষযজ্ঞের অনুষ্ঠান।

"ভক্তিভাবে ডাক কুতূহলে।"

দরশনে কৃত্তিবাস, চলিলেন পীতবাস,
কৃত্তিবাস নিবাস কৈলাসে।
ইন্দ্র, চন্দ্র, করি-যান, আরোহণ করি যান,
দক্ষ, যক্ষ, দেবতা উল্লাসে।
পীতাম্বর পদ্মাসনে, যথাবিধি সম্ভাষণে,
রত্নাসনে বসালেন হর।
অন্য দেব পরিকর, পান স্বর্ণ পরিকর,
শোভাকর সভা-মনোহর॥
একে একে দেবচয়, সম্বোধিয়া পরিচয়,
শিব জিজ্ঞাসেন শিব কথা।
শস্ত্র, শাস্ত্র, বেদ দক্ষ, সভায় ছিলেন দক্ষ,
বিরূপাক্ষ নাহি যান তথা॥
শ্বশুর বলিয়া হর, না করেন সমাদর,
দণ্ডবৎ করা থাকুক দূরে।
ক্রোধে দক্ষ কম্পবান, সভা ত্যজি গৃহে যান,
অভিমানে দুটী চক্ষু ঝুরে॥

নারদের উপদেশ, যোগেশ্বরে করি দ্বেষ,
প্রজাপতি যজ্ঞ আরম্ভিল।
ধ্রুব, চন্দ্র, সূর্য্য লোক, সুর ব্রহ্ম শ্রীগোলক,
দেবঋষি সব নিমন্ত্রিল॥
ঘটাইয়া ঘোর দ্বন্দ্ব, করিতে পরের মন্দ,
বিধিপুত্র পটু অতিশয়।
যজ্ঞ অনুষ্ঠান সাতে, দক্ষ যায় অধঃপাতে,
সেই যুক্তি করেন নির্ণয়॥
দক্ষসুতা বরদারে, যজ্ঞবার্ত্তা দিতে তাঁরে,
কৈলাসে উল্লাসে যান চ'লে।
যেতে যেতে বীণাধর, বলিছেন বীণে! ধর,
উপদেশ দেই তোরে বলে॥
মনে ভক্তি ভাব নাই, উক্তি বলে মুক্তি চাই,
সে সাধনা, সাধ না পূরায়।
যার নাই তত্ত্ব জ্ঞান, নয়ন মুদিয়া ধ্যান,
করা তার কেবল বৃথায়॥
নয়নে না চিন্তে পারি, মননে যে চিন্তে তারি,
স্বভাবে মুদিত দুটী আঁখি।
প্রেমশূন্য আঁখি মুদে, অন্ধকারে টাকা সুদে,
গুণে থাকে আঁখি বোজা ফাঁকি॥
মন থাকে ঘন দুধে, কিবা ফল আঁখি মুদে,
জোর কোরে মুদিলে কি হয়।
মিট মিট করে পাতা, তুলিয়া তুলসী পাতা,
হাত পাতা সন্ধান করয়॥
ওদলে কি বিল্বদলে, দলাদলি সব দলে,
দেখ যেন মন নাহি দলে।
তুমি বীণে! সযতনে, তানে গানে সনাতনে,
"ভক্তিভাবে ডাক কুতুহলে॥"

প্রথমসংগীত।

গৌরী রাগিণী, তাল আড়া।

নারদোক্তি।

ভাব রে বীণে তাঁর, মহিমা অসীমা যাঁর;
নির্গুণ ত্রিগুণাতীত, ভব সারাৎসার॥
দিয়া তব প্রতিগুণ, বাঁধ মম প্রীতিগুণ;
প্রীতি বিনা গুণ গান, সকলই অসার॥
জ্ঞান গুণ হীন হরি, বলে বীণায় বিনয় করি,
গুণে বাঁধ ভব তরি, তরি এ সংসার॥

"সকল দেবের চূড়া, দেব মহেশ্বর"
সকল পক্ষীর চূড়া, বিনতা-নন্দন।
সকল হস্তীর চূড়া, দিগ্‌গজ বারণ॥
সকল ফুলের চূড়া, পদ্ম মনোহর।
সকল দৈত্যের চূড়া, প্রহ্লাদ সুন্দর॥
সকল বনের চূড়া, নন্দন-কানন।
সকল রাক্ষস-চূড়া, লঙ্কার রাবণ॥
সকল জলের চূড়া, গঙ্গার সলিল।
সকল বায়ুর চূড়া, মলয়া অনিল॥
সকল পশুর চূড়া, সিংহ বলবান্।
সকল বাণের চূড়া, পাশুপত বাণ॥
সকল গানের চূড়া, সাম্-বেদ গান।
সকল দানের চূড়া, ব্রহ্ম-বিদ্যা দান॥
সকল রাজার চূড়া, রঘুবংশে রাম।
সকল দেশের চূড়া, হিন্দুস্থান নাম॥
সকল ধাতুর চূড়া, লোকে বলে স্বর্ণ।
সকল বর্ণের চূড়া, শ্যাম, শুভবর্ণ॥
সকল পাথর চূড়া, হীরা কহিনুর।
সকল পুরের চূড়া, পুরন্দর-পুর॥

সকল বলের চূড়া, বুদ্ধি যার ঘটে।
সকল গন্ধের চূড়া, মৃগনাভি বটে॥
সকল ভূষণ চূড়া, বিনয় ভূষণ।
সকল রসের চূড়া, মধুর বচন॥
সকল ধর্ম্মের চূড়া, সত্য আচরণ।
সকল বর্ণের চূড়া, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ॥
সকল পুচ্ছের চূড়া, ময়ূরের পুচ্ছ।
সকল বৈরাগী চূড়া, অর্থ যাঁর তুচ্ছ॥
সকল সুখের চূড়া, স্বাস্থ্য সুখ অতি।
সকল গমন-চূড়া মানসের গতি॥
সকল পারের চূড়া, পার ভব-বারি।
সকল নারীর চূড়া, পতিব্রতা নারী॥
সকল গিরির চূড়া, হিমগিরিবর।
হিমালয় গিরি চূড়া, কৈলাস শেখর॥
কৈলাস শেখর চূড়া, শুভ্র কলেবর।
"সকল দেবের চূড়া, দেব মহেশ্বর॥"

অন্য স্তবে দেবঋষি, প্রণমি শঙ্করে।
অন্তঃপুরে চলিলেন, প্রফুল্ল অন্তরে॥
বরদার পদদ্বয়, করিয়া বন্দন।
দক্ষ-যজ্ঞ বার্ত্তা তাঁরে, করে নিবেদন॥

দ্বিতীয় সংগীত।

রাগিণী বাহার, তাল কয়ালি।

নারদোক্তি।

মা দাক্ষায়ণি! শুন নিবেদন।
তব পিতা যজ্ঞ করে, হর অপমান তরে
ত্রিলোকেরে নিমন্ত্রিল,

যথা যোগ্য সম্ভাষণে সবে যজ্ঞে যায় ;
অবজ্ঞা করিয়া পত্র দিল না মা তোমায় ;
জনক সন্তোষে ভাসে, আনন্দ-উল্লাসে হাসে ;
তব সহোদরা তারা ! তারা তারাগণ ॥
চন্দ্রচূড়-শিরে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা পায়,
বিশদ শরদ-চন্দ্র পদ-নখে লুকায় ;
চন্দ্রনাথে তুচ্ছ কোরে, গগন-চন্দ্রে সমাদরে ,
তব পিতা দক্ষ, বক্ষ করে বিদারণ ॥

"সাতাশ নক্ষত্র যায় যজ্ঞে এক-যোগে"
দক্ষযজ্ঞ বার্ত্তা ঋষি চন্দ্রলোকে বলে।
চন্দ্রলোক শুদ্ধ চন্দ্র, সাজে কুতূহলে ॥
চন্দ্রভার্য্যা তারা তারা, দক্ষের নন্দিনী
হস্তা, ভদ্রা, মঘা আদি, রোহিণী অশ্বিনী ॥
দু সতীনে দ্বন্দ্ব ক'রে, ঘটায় প্রলয়।
সাতাশ সতিনী বোন, চন্দ্রের আলয় ॥
ছোট বড় নাই দ্বন্দ্ব করে, বোনে বোনে।
কুকুরের মত নাহি, এক তিল বনে ॥
যাত্রা-কালে চিত্রা আসি, ব্যঙ্গ করি বলে।
অশ্বিনী, রোহিণী, পুষ্যা, যাবে কোন্ স্থলে ॥
উত্তর ফল্গুনী, হস্তা, জ্যেষ্ঠা, ভাদ্রপদ ॥
শ্রবণা, এ অষ্ট তারা, লোকের আপদ ॥
চারি দিকে দিক্শূল, চক্ষুঃশূল অতি।
তোরা গেলে যজ্ঞে বল, কে করিবে গতি ?
নিবারণ করি তাই, সবে কথা রাখ।
যজ্ঞ দেখা কাজ নাই, ঘরে বসে থাক ॥
পূর্ব্বভাদ্রপদ, মঘা, কৃত্তিকা, রোহিণী।
উত্তরাষাঢ়া লোকের, আপদকারিণী ॥
মৃত্যুযোগ হোস্ তোরা, তিথির সংযোগে।
এই যোগে পা নাড়িলে, মৃত্যু ভোগ ভোগে ॥

ভৃগু সোমে কুজে ভদ্রা, হও পাপযোগ।
তুই যজ্ঞে গেলে পিতা, ভুগিবেন ভোগ॥
অনুরাধা, মৃগশিরা, জানিও নিশ্চয়।
তোদের কারণ বারযোগে মৃত্যু হয়॥
যজ্ঞস্থলে গিয়া তোরা, সবে দিলে যোগ।
পিতার নিশ্চয় হবে, জীবন-বিয়োগ॥
একটী নক্ষত্র দোষে, লোকে ভোগে ভোগে
"সাতাশ নক্ষত্র যায়, যজ্ঞে এক-যোগে॥"

অনন্তর

শশী আসি বুঝাইয়া, মহিষী সকলে।
রথে উঠি চলিলেন, দক্ষযজ্ঞ স্থলে॥
কৈলাস শেখর দেখি, চন্দ্রভার্য্যাগণ।
সতীকে দেখিতে যান, যোগেন্দ্র-ভবন॥

তৃতীয় সংগীত।

রাগিনী আড়ানা বাহার, তাল কয়ালি।

পদকর্ত্তার উক্তি।

চলে গজেন্দ্র-গমনে।
উল্লাসে, চন্দ্র-মহিষীগণে, যোগেন্দ্র দরশনে॥
বিচিত্র শোভা ধরে, মুনি মন হরে বসনে,
মণি সুবর্ণ ভূষণে,
ভাবে অঙ্গ ঢর ঢর, অনঙ্গ জর জর, অপাঙ্গ খরশর,
আকর্ণ নয়নে॥
শিরে বেণী শোভা পায়, ভুজঙ্গিনী যেন ধায়,
বিবরে, করিকর নাভি সরোবরে;
মৃগেন্দ্র মধ্যদেশে, খগেন্দ্র নাসা দ্বেষে, করীন্দ্র বনবাসে,
স্থিতি হেরি জঘনে॥

"সঘনে শঙ্কর, শিঙ্গা ডম্বুর বাজান"

হিমালয় ধরাধর, দেখিতে সুন্দর।
ধবল কাঞ্চন যাঁর, মাথার টোপর ॥
কৈলাস শেখর শোভে, চূড়া অন্তর।
শিখণ্ডীর শিরে যেন, শিখা মনোহর ॥
তমাল পিয়াল শাল, বিল্ব অগণন।
এই সব বৃক্ষে শোভে, শিব উপবন ॥
সে বনে নির্জ্জনে বসি, যোগী দিগম্বর।
সাধন করেন ধ্যানে, যোগ নিরন্তর ॥
নীলগিরি দিব্যাসনে, গিরিশ সুন্দর।
কৃষ্ণবর্ণ মেঘে যেন, সাজে নিশাকর ॥
করপদে নিশাকর, শিরে আধ আছে।
একবিংশ নিশাকরে, নিশাকর সাজে ॥
একচন্দ্র আলো করে, গগনমণ্ডল।
উথলিয়া উঠে তাতে, সাগরের জল ॥
চন্দ্রচূড়ে একবিংশ, চন্দ্র আলো করে।
ইহাতে সে সুরধুনী, কিসে ধৈর্য্য ধরে ॥
উল্লাসে উথলে গঙ্গা, শিবের জটায়।
ডুবিল পিঙ্গল জটা, ধবল প্রভায় ॥
কুল কুল ধ্বনি গঙ্গা, করে ঘোরতর।
রাগে রাগে ফণা ধরে, শিরে ফণাধর ॥
দেখিয়া গঙ্গার প্রভা, পিঙ্গল জটায়।
গণেশ-জননী পাছে, বারতা সুধায় ॥
উপায় করেন ভব, ভবী যাতে ভুলে।
ঢাকেন গঙ্গার প্রভা ধুতুরার ফুলে ॥
সুরধুনী-ধ্বনি দুর্গা, শুনিতে না পান।
"সঘনে শঙ্কর শিঙ্গা, ডম্বুর বাজান ॥"

"তথা যেতে করি নিবারণ"

যথা পতি পশুপতি, তথা সতী করি গতি,
বিনতি প্রণতি করি কন।
শুন ওহে কৃত্তিবাস, যাব আমি পিতৃবাস,
শ্রীচরণে এই নিবেদন ॥
যজ্ঞ কি হে যোগেশ্বর, কি যোগে তা করে নর,
কখন না করি দরশন।
দেখিতে একান্ত আশা, সে জন্যে হে কান্ত, আসা,
আশা পূর্ণ কর ত্রিলোচন ॥
বিনা পতি-অনুমতি, যদি নারী করে গতি,
ভবে গতি নাহি হয় তার।
আশুতোষ নাম ধর, আশু তোষ হে শঙ্কর,
অনুমতি কর একবার ॥
ভবানীর শুনি বাণী, কহিছেন শূলপাণি,
আমি জানি যজ্ঞ বিবরণ।
মম অপমান তরে, দক্ষরাজা যজ্ঞ করে,
"তথা যেতে করি নিবারণ ॥"

চতুর্থ সংগীত।

রাগিণী ভৈরবী, তাল একতালা।

শিবোক্তি।

হবে কুলক্ষণ তথায় বিলক্ষণ;
সতী যেওনা প্রজাপতির যজ্ঞে,
শিব অপমান, হবে যজ্ঞ-স্থান, শ্রবণে মর্ম্ম-বেদনে,
ওহে নারিবে জীবনে করিতে রক্ষে ॥
আমি শ্মশান-বাসী, শ্মশান ভালবাসি,
দেবের যজ্ঞ-ভাগে নহি অভিলাষী;
ত্যজে সোণার কাশী, চিতাভস্মরাশি,
মাখি, দিশি নিশি করি হে ভিক্ষে ॥

অসহ্য ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য ব্যবহার,
মান অপমান সমান আমার ;
যে যা বলে বলে, হরি দিল ভার ;
ঐ যোগে যোগী, কর হে দীক্ষে ॥

"দেখিতে মা বাপের চরণ"

সতী কন কৃত্তিবাসে, কন্যা যাবে পিতৃ-বাসে,
নিমন্ত্রণ কিবা প্রয়োজন।
জামাই পরের ছেলে, নিমন্ত্রণ নাহি পেলে,
কেন যাবে শশুর-ভবন ॥
শুন ওহে শূলপাণি, রয়েছে প্রবাদ বাণী,
জামাতা কি ভাগিনেয়গণ।
কখন আপন নয়, অনুগত নাহি হয়,
যত দাও তত আকিঞ্চন ॥
কিছু ত্রুটী পেলে পরে, ধড়ে নাহি রাগ ধরে,
দ্বন্দ্ব করি মন্দ বলে কত।
জামাই ভগিনী-পুত্র, আপন না হয় কুত্র,
শত্রুমধ্যে গণে বুধ যত॥
তব অপমান তরে, পিতা মম যজ্ঞ করে,
অসম্ভব, সম্ভব কি হয় ?
বহু কার্য্য আছে যার, ভুল হয়ে থাকে তার,
তাহাতে রাগে না সদাশয় ॥
জঠর-কোঠরে স্থান, দশ মাস করি দান,
সন্তান প্রসব করে মাতা।
লালন পালনে তাঁর, যে যাতনা অনিবার,
সহ্য গুণে মাতা বসুমাতা ॥
মার মায়া কিমদ্ভুত, এক অঙ্গে ধরে সুত,
মল মূত্র আর অঙ্গ ভরা।
অতি শীতে জড়সর, তথাচ না বলে সর,
মায়ের তুলনা নাই ধরা॥

খেতে ভাল লাগে যাহা, জননী না খান তাহা,
তুলে দেন সন্তানের মুখে।
কাতর পীড়ার দায়, শিশু যদি নাহি খায়,
বড় ব্যথা লাগে মার বুকে ॥
মা যখন খান ভাত, শিশু পাতে দুটী হাত,
জননী চিবায়ে দেন হাতে।
কি মধুর তার তার, যে খেয়েছে একবার,
সেই জানে কত মধু তাতে ॥
কার সাধ্য আছে আর, জননীর এক ধার
দুগ্ধ ধার শুধিবারে পারে।
সন্তান-কুশল তরে, হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে,
রক্ত দেন মাতা দেবতারে ॥
মাতৃহীন যেই জন, সে জেনেছে মা কেমন,
স্নেহের রতন এ সংসারে।
স্বয়ম্ভু হে শম্ভু তুমি, নাই তব জন্ম-ভূমি,
জান না মা বাপ বলে কারে ॥
তুচ্ছ মান তরে হর, তাই হে নিষেধ কর,
যেতে পিতা মাতার ভবন।
ইথে নাই অপমান, কন্যা যাবে পিতৃ-স্থান,
"দেখিতে মা-বাপের চরণ ॥"

পঞ্চম সংগীত।

রাগিণী সুরট, তাল তেতালা।

সতী উক্তি।

হর, অনুমতি কর একবার।
করি বিনতি ধরি চরণে তোমার;
শঙ্কর করুণা কর দাসীরে এবার;
হয়ে আশু সন্তোষ, ওহে আশুতোষ তোষ;
ক্ষম দোষ পিতার আমার ॥

বিনা তব অনুমতি যেতে নারি,
নিতান্ত অধীনী নারী ;
নিদয় ভাব পরিহর, সদয় হও হে কাশীশ্বর,
অনাথের নাথ হর, করুণা আধার ॥
গুরু দোষ করে যদি গুরুজন,
কর্তে হয় তা সংবরণ ;
কবি বলে যদি অজ্ঞে, মন্দ বলে, তবে বিজ্ঞে,
না ধরে করে অবজ্ঞে, এই ত ব্যবহার ॥

"যক্ষপতি কুবেরের প্রতি।"

বিনাইয়া কাঁদে সতী, পশুপতি অনুমতি,
করিলেন দক্ষ-যজ্ঞে যেতে।
ভবের চরণ বন্দি, আনন্দে চলিল নন্দী
আনন্দময়ী মার সঙ্গেতে ॥
কুবের আসিয়া বলে, শিবের ঘরণী স্থলে,
পদ-শতদলে শত নতি।
যেওনা বিনা সজ্জায়, সাজিয়ে দি মা তোমায়,
মা আমায় কর অনুমতি ॥
সজ্জা বিনা পিতৃভূমি, মা, যদি যাইবে তুমি,
তব স্বামী লজ্জা পাবে অতি।
যাঁরে পূজা করে ধাতা, কন সেই জগন্মাতা,
"যক্ষপতি কুবেরের প্রতি ॥"

"সতীর ভূষণ পতি।"

বৃক্ষের ভূষণ ফল, ফলের ভূষণ মধু ॥
নদীর ভূষণ জল, ঘরের ভূষণ বধূ।
দেশের ভূষণ নর, নরের ভূষণ যশ।
গানের ভূষণ স্বর, কথায় ভূষণ রস ॥

দেহের ভূষণ বিদ্যা, বিদ্যার ভূষণ জ্ঞান।
ধর্ম্মের ভূষণ সত্য, যোগীর ভূষণ ধ্যান॥
আঁখির ভূষণ তারা, পদ্মের ভূষণ যতি।
নিশির ভূষণ তারা, "সতীর ভূষণ পতি॥'

ষষ্ঠ সংগীত।

রাগিণী বেহাগ, তাল ধামাল।

সতী উক্তি।

কুবের, ভূষণে কি কাজ রে আমার।
নিত্য ভিক্ষা ভবন বসন নাহি আসন যার॥
নিস্ব আমার বিশ্বনাথ ভস্ম মাখেন গায়,
আভরণ প্রয়োজন কি আছে রে আর॥
সবাই বলে সতীর পতি ক্ষেপা মহেশ্বর,
শ্মশানে মশানে ফিরে কেহ না মানে তাঁর॥
হরি কহে সবিনয়ে সতীর ব্যবহার,
পতি কেবল সতীর গতি পতি অলঙ্কার॥

"চলিলেন দক্ষসুতা, দক্ষের ভবন"
শুনি ভবানীর বাণী, যক্ষপতি বলে।
শিবে আমি নিবেদি মা! তব পদতলে॥
নিস্ব নয় বিশ্বনাথ, বিশ্বপিতা তিনি।
বিশ্বমাতা তুমি তারা, ভব নিস্তারিণী॥
যোগী জাগে যোগাসনে, ভোগ ভোগে ভোগী।
তাই শিব সর্ব্বত্যাগী, হয়েছেন যোগী॥
ভাবের সূতায় গাঁথি, যত্নে কলি হার।
কাব্যছলে বলি নব্য, সভ্য ব্যবহার॥
ভূলোকে রয়েছে এই, লোক ব্যবহার।
বৈভব সম্ভব তুমি, যত আছে যার॥

পুরাতন বড় লোক, কথায় কথায়।
বৈভবের পরিচয়, না দেন কোথায়॥
আধুনিক লোক যদি, দেয় কোটাঘর।
দণ্ডে উঠে সাতবার, তাঁহার উপর॥
দোতালা তেতালা হলে, রক্ষা নাই আর।
পড়শী দুঃখী লোকের, জাত থাকা ভার॥
সদা বসি থাকে মুখ, দিয়া জানালায়।
তাতে কত অবলার, মাথা মুণ্ড খায়॥
পণ্ডিতের পুত্র যদি, বিদ্যা পায় ধড়ে।
ফলিত ডালের মত, নত হয়ে পড়ে॥
মূর্খের সন্তান যদি, পড়ে বর্ণমালা।
তার কাছে জ্যেঠা মূর্খ, বাপ দাদা শালা॥
পুরাতন রাজা গজা, আছে যথা তথা।
তাঁদের মুখেতে নাই, জমীদারী কথা॥
আধুনিক লোক যদি, জমীদারী করে।
সাতবার বার দেয়, কাছারির ঘরে॥
ওরে মার এরে ধর, বিচার সদাই।
বুদ্ধিমান ব'লে ডাকে, জগাই মাধাই॥
বাঁশগাড়ি না করিতে, কেন গাড়ি পোত।
বাজে আপ্ত ক'রে লয়, দেবোত্তর জোত॥
পুরাতন লোক যদি, পট্টবস্ত্র পরে।
বাহিরেতে না বেরয়, বসে থাকে ঘরে॥
গরদের ধুতি পোরে, নারদের বাবা।
মনে করে ভদ্রলোক, সব বেটা হাবা॥
ছক্কা ধরা ফুল কোঁচা, লক্কা অবতার।
কেমন হোয়েছে চেয়ে, দেখে সাতবার॥
পুরাতন লোক যদি, পরে মণি হীরে।
ভ্রমেও তাহার দিকে, নাহি চান ফিরে॥
আধুনিক লোক যদি, অঙ্গুরীয় পরে।
আঙুল নাড়িয়া তাহা, দেখায় নগরে॥

ঘুরাতে জাতার ডাণ্ডা, হাত গেছে ক্ষয়।
কোন কালে তার যদি, ভাগ্যে লক্ষ্মী হয়॥
তার নারী যদি পরে, স্বর্ণ অলঙ্কার।
তৃণের সমান দেখে, এ তিন সংসার॥
পুরাতন সনাতন, তব স্বামী ভব।
লোকের দেখাতে ইচ্ছা, না করে বৈভব॥
সুখের স্বরূপ তিনি, সুখ ইচ্ছা নাই।
ত্যজিয়া সোণার কাশী, গায় মাথে ছাই॥
কুবের শিবের ভৃত্য, সকলেই জানে।
রত্নাসন ত্যজে হর, থাকেন শ্মশানে॥
পট্টবাস তুচ্ছ করি, কৃত্তি বাস পরে।
অগুরু চন্দন ফেলে, ভস্ম অঙ্গে ধরে॥
কিরীটি কুণ্ডল তুচ্ছ, করি মহাকাল।
কপাল উপরে পরে, নরের কপাল॥
এত বলি যক্ষপতি আনন্দ অন্তরে।
আনন্দময়ীরে সজ্জা করে নিজ করে॥
চন্দনে মাখিয়া, পদে দিল জবাফুল।
তাহাতে মায়ের রূপ, হইল অতুল॥
ভক্তিভাবে শক্তি রূপ, করে দরশন।
"চলিলেন দক্ষসুতা দক্ষের ভবন॥"

সপ্তম সঙ্গীত।

রাগিণী বাহার, তাল আড়া।

পদকর্ত্তার উক্তি।

ভুবনমোহিনী রূপে ভুবন ভুলায় হায়!
রক্ত জবা কিবা শোভা, মায়ের রাঙ্গা পায় পায়॥
সিন্ধুপুত্র ইন্দু আসি, হ'ল পদ-নখ বাসী;
তরুণ অরুণ হাসি হাসি, চরণ তলে লুকায় কায়॥

বিশালাক্ষী লক্ষী রূপা বিশ্বমাতা বিশ্বরূপা,
দীন তারিণী কর কৃপা, দীনের দিন যায় যায় ॥

"ভাবিতে ভাবিতে তাঁর স্থির নয় মতি"
তারা চন্দ্র ভার্য্যা যত চন্দ্রের সহিত।
তারা, দক্ষালয়ে গিয়া, হয় উপস্থিত।
তারা, হরদারা যজ্ঞে, না দেখে প্রসূতি।
তারা, বেয়ে পড়ে ধারা, আকুলিতা অতি ॥
নিবেদন, করিছেন ইষ্টদেব স্থানে।
নিবেদন, কর প্রভু হরদারা দানে ॥
দেবতারে কন রাণী পূজা উপহার।
দেবতারে, এনে দাও নিকটে আমার ॥
এক মন, হয়ে রাণী দেবতার স্থানে।
এক মণ, দুগ্ধ চিনি মানসিক মানে।
অন্তরে, দেখিলে দোলা বাহকের ঘাড়ে।
অন্তরে, আনন্দ তাঁর অতিশয় বাড়ে ॥
যান, যদি দেখে রাণী, ঘেরা বস্ত্র দিয়া।
যান, দ্রুতগতি সতী আসিল ভাবিয়া ॥
ভাবিতে, কি হবে তাহা না জানে প্রসূতি।
"ভাবিতে ভাবিতে তাঁর স্থির নয় মতি ॥"

"আশাপথ নিরখিয়া বলেন কাঁদিয়া"
বৎসহারা গাভী আর, জলহারা মীন।
নিশাকালে চক্রবাকী, শব্দ করে দীন ॥
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, ডাকে চাতকিনী।
দাবানলে বেড়া যেন, বনের হরিণী ॥
পার অভিলাষী লোকে, তরণীর তরে।
সন্ধ্যাকালে নদীতীরে বসি চিন্তা করে ॥
বিদেশী পুত্রের মাতা, অশুভ সংবাদে।
এর ওর কাছে যায়, ধৈর্য্য নাহি বাঁধে ॥

পরীক্ষা প্রদান করি, বালক সকল।
ব্যস্ত হয় যেই রূপ, জান্তে তার ফল॥
থোড় ধান্য দেখে মাঠে, কৃষক যেমন।
আকাশে চাহিয়া থাকে, বৃষ্টির কারণ॥
সেরূপ প্রসূতি সতী, সতী না দেখিয়া।
"আশাপথ নিরখিয়া বলেন কাঁদিয়া॥"

অষ্টম সংগীত।

রাগিণী ঝিঝিট, তাল মধ্যমান।

প্রসূতি উক্তি।

সতী কেন যজ্ঞে এল না।
না দেখে ও বিধুবদন, জীবন ধৈর্য্য ধরে না॥
জানি সতীর মতিগতি, বিনা পতি অনুমতি,
কোথায় করে না গতি, বুঝি অনুমতি পেল না॥
মম কন্যা যত তারা, যজ্ঞেতে এসেছে তারা;
তারা বিনা নয়ন তারা, জলধারা ধরে না।

"নিমন্ত্রণ নাহি দিলে ভিখারিণী বলে।"
বৃষে চড়ি এল সতী, বিশাল-নয়নী।
শুনিয়া ধাইয়া চলে, দক্ষের রমণী॥
দেখিয়া সতীর মুখ, প্রসূতি তখন।
আনন্দে আনন্দ-অশ্রু, করে বরিষণ॥
বামন পাইল হাতে, গগণের চাঁদ।
ধরিল সোণার মৃগী, ব্যাধ পেতে ফাঁদ॥
তারা হারা অন্ধ যেন, আঁখি-তারা পায়।
বিদেশী সন্তান আসি, প্রণমিল মায়॥
বন্ধ্যা নারী অকস্মাৎ গর্ভবতী হয়।
নিম পাতা খেয়ে হ'ল, মহাব্যাধি ক্ষয়॥

পিপাসু পথিক পেল, সুশীতল জল।
রাজ্যহারা রাজা পান, লক্ষ সৈন্য বল॥
আদল বাদল ঘুচে, বাতাস দক্ষিণা।
দরিদ্র পাইল স্বর্ণ, ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা॥
পার অভিলাষী পায়, শীঘ্রগতি তরি।
সিদ্ধি হয় যোগী ঋষি, যোগ সিদ্ধি করি॥
গাঁজিয়াল পেল হাতে, জটিয়াল গাঁজা।
প্লীহাজ্বরা রোগী পায়, ছোলা চাল ভাজা॥
ফণি যেন মণি পায়, মণি হয়ে হারা।
সেইরূপ তুষ্ট রাণী, কোলে পেয়ে তারা॥
সতীকে করিয়া কোলে, প্রসূতি রমণী।
অন্তঃপুরে চলিলেন, আনন্দ অমনি॥
শত শত চুম্ব দিয়া, ও চন্দ্র বদনে।
বলেন, মা ব'লে কি মা! ছিল তোর মনে॥
হরদারা তারা কন, তারা ভাসে জলে।
"নিমন্ত্রণ নাহি দিলে, ভিখারিণী বলে॥"

নবম সংগীত।

রাগিণী বেহাগ, তাল যৎ।

সতী উক্তি।

জানি মা তোর দয়া মায়া, পিতার বিবেচনা।
ভিখারির নারী বলে, মাগো নিমন্ত্রণ দিলে না॥
পিতা আমার যজ্ঞ করেন, বার্ত্তা পেয়ে নারদ মুখে,
আপনি এসেছি যজ্ঞে, মাগো দেখিতে তোমাকে,
সম্ভাষণে দিয়া পত্রী, আন্‌লে যত স্নেহপাত্রী,
আমি কি মা তোর কথার পাত্রী, দুখিনী বলে হলেম না।

যজ্ঞ প্রাঙ্গন।

"স্বর্গে গেলে নাই সুখোদয়।"

শোণা বদ্ধ মনোহর, স্বর্ণ রৌপ্য পরিকর,
চারি দিকে বসিবার স্থান।
যজ্ঞ বেদী মধ্য স্থলে, হোম কুণ্ডে অগ্নি জ্বলে,
দ্বিজ করে সামবেদ গান॥
স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত, তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র যত,
বিবিধ সমিধ কাষ্ঠ রাশি!
কোশা কুশী গঙ্গাজল, কুশ পুষ্প বিল্বদল,
সংখ্যা শূন্য ঘৃত সদ্য বাসি॥
হোতা শ্রোতা কুশাসনে, শুদ্ধচিত্ত এক মনে,
দ্বিজগণ নিজ কার্য্যে রত।
শ্রবণে শ্রবণ স্তব্ধ, অসংখ্য শঙ্খের শব্দ,
ঘন ঘন ঘণ্টা-নাদ কত॥
যোগ্যাসনে কি সুন্দর, চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর,
ধুরন্ধর সুর নর গণ।
নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, গণ্য মান্য ধরা ধন্য,
সভা শোভা করে বুধ জন॥
মহিলা-মণ্ডপোপরে, মহিলা বিরাজ করে,
শোভা করে অতি চমৎকার।
বর্ণনাতে নাই বর্ণ, শ্বেত পীত নীল বর্ণ,
বস্ত্র পরা স্বর্ণ অলঙ্কার॥
সভার শোভার রীত, বোধ হয় বিপরীত,
ছবি দেখে কবিগণ হাসে।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা, গগণ ছাড়িয়া তারা,
সভা ধরা-তলে সুপ্রকাশে॥
কোকনদ কুমুদিনী, সঙ্গে করি কমলিনী,
আকাশে প্রকাশে মেঘ জলে।
করিণী চমরীগণ, ছাড়িয়া নিবাস বন,
যেন তথা গেল কুতূহলে॥

ক্ষত্রপুত্র রাজগণে, নিরখিয়া সভাসনে,
বনের হরিণী পায় ত্রাস।
আকাশে কামিনী বন, করি মৃগী দরশন,
সেই স্থানে গিয়া করে বাস॥
উর্দ্ধ দৃষ্টে রাজগণ, চেয়ে দেখে অনুক্ষণ,
ভয়ে মৃগী সচকিতা হয়।
অঙ্গে হানে দৃষ্টি বাণ, দুরদৃষ্ট সঙ্গে যান,
"স্বর্গে গেলে নাই সুখোদয়॥"

"শিব-শূন্য দক্ষযজ্ঞ সেইরূপ দেখি।"
বীর মূর্ত্তি ধীর মন শিবভক্ত শৈবগণ,
উপস্থিত হন সভা স্থলে।
সভা শোভা অনুক্ষণ, করি সবে দরশন,
পরস্পর কাণ-কথা বলে॥
দক্ষ বেটা বড় গোঁড়া, আগেতে কাটিয়া গোড়া,
গাছের আগায় ঢালে জল।
যজ্ঞে নাই শিব-স্থান, শৈবগণে হত-মান,
করে বেটা এত ধরে বল॥
অর্থ শূন্য চণ্ডী পাঠ, পক্ষ শূন্য পাখী।
জল শূন্য সরোবর, শাখা শূন্য শাখী॥
জ্ঞান শূন্য উপাচার্য্য, লোক শূন্য গ্রাম।
বর্ণমালা পড়ে হয়, শ্রীপণ্ডিত নাম॥
সার শূন্য ধান্য আর, যশ শূন্য মান।
তাল নাই মান নাই, কলয়াতি গান॥
গঙ্গা শূন্য দেশ আর, রস শূন্য কথা।
মূল শূন্য শাস্ত্র পাঠ, নাম কথকতা॥
ভাব নাই ভক্তি নাই, মোটা মালা গলে।
লাফিয়া কীর্ত্তন দলে, গোলে হরি বলে॥
পুত্র শূন্য গৃহী লোক, দীপ শূন্য ঘর।
সত্য শূন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম, বিদ্যা শূন্য নর॥

চন্দ্র শূন্য নিশি আর, তারা শূন্য আঁখি।
"শিব শূন্য দক্ষযজ্ঞ, সেইরূপ দেখি॥"

দশম সংগীত।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা।

শৈবোক্তি।

এ যজ্ঞ হবে না পূর্ণ, প্রজাপতি অতি মতিচ্ছন্ন।
যজ্ঞে না দেয় স্থান (মরিরে) হরে হরের মান,
সত্বরে এ বেটা যাবে উচ্ছিন্ন॥
এ যজ্ঞে সুযোগ্য নহে তারা গণ;
তারা সবে গ্রহণ করে তারাসন;
চন্দ্র উচ্চাসনে, (মরিরে) ঈশানচন্দ্র বিনে,
ঈশান কোণ হেরি শূন্য॥
চল চল যজ্ঞ হতে সব শৈব,
শৈব হয়ে শিবনিন্দা কত সৈব;
শিব ভিন্নোৎসব, (মরিরে) অশিব অমুৎসব;
করে হরির হৃদয় বিদীর্ণ॥

ব্রাহ্মণ ফলার।

"উঠিতে পারি না বাবা, শীঘ্র ধোরে তোল"
অনাহূত রবাহূত, আহূত ব্রাহ্মণ।
যজ্ঞ স্থলে উপস্থিত, হয় অগণন॥
খুঙ্গি পুথি ঘটি হাতে, পৈতা পরিপাটি।
কপালেতে দীর্ঘ ফোটা, জাহ্নবীর মাটি॥
বর্ণশ্রেষ্ঠ বর্ণভেদে, বিভিন্ন হইল।
অঙ্গনে প্রাঙ্গনে গিয়া, ফলারে বসিল॥
এক দ্বিজ তথা, কবিতা শক্তিতে।
ফলারের রূপ গুণ, লাগিল বর্ণিতে॥

পাত পলে ফলারের, সান্নিপাত ঘুচে।
উৎপাত শান্তি জল, দিয়া পাত মুছে॥
লবণ আসিলে আর, বিলম্ব না হয়।
পেটার্ত্তে সাক্ষাৎ দেন, লুচি মহাশয়॥
পুরি পাতে প'লে হাতে, পাই স্বর্গ-পুরি।
কোচুরি ছকুড়ি দিয়া, আগে পেট পুরি।
আদা কুচি তরকারি, দরকারি বটে।
চেটে জিভে রস আনি, চাটনি যদি পটে॥
চিনি, চিনি মহাশয়, কাঁচায় পাকায়।
খাসা দধি নিরবধি, তার গুণ গায়॥
ঝুড়ি ঝুড়ি ঝুরি খাই, মতিচুর সাতে।
জিলাপির এক বিন্দু, নাহি রাখি পাতে॥
রসভরা রসগোল্লা, রসময় নাম।
পানিতোয়া পাতে প'লে, না করি বিশ্রাম॥
পক্কান্ন অনেকরূপ, দেখে ভাসি সুখে।
গণ্ডায় গণ্ডায় মণ্ডা, তুলে দেই মুখে॥
অবাক পাইলে আমি, অবাক্ না হই!
দম মিশ্রি কম নয়, ডেকে হেঁকে লই॥
মনোহরা খাসা মোয়া, মনোহরা ধন।
বিয়ড় পাকির জন্য, ফাঁফর জীবন॥
বর্ণনায় বর্ণহীন, সন্দেশ মিঠাই।
আমি অতি মূঢ়মতি, কিসে গুণ গাই॥
ক্ষীর ছাঁচ ক্ষীর খাই, ক্ষীরে গোল নাই।
গোল্লাই আমাকে ভাই, দিয়াছে গোল্লাই॥
কাঁচা দেখে বাঁচা ভার, যাই ছুটে ছুটে।
খাসাতে পূরেনা আশা, মুখে জল উঠে॥
এইরূপ দ্বিজ কবি, বর্ণিল ফলারে।
ছিল এক দ্বিজ শিশু, বসিয়া আহারে॥
উদরে না ধরে তবু, বলে বলে খায়।
উঠিতে না পারে শেষে, লোভে প্রাণ যায়॥

জল নাহি ধরে স্থল, সকল পূরণ।
পিতাকে নিকটে ডেকে, বলিছে তখন ॥
যোড়া যোড়া মণ্ডা খাই, হবে গণ্ডা যোল।
"উঠিতে না পারি বাবা ; শীঘ্র ধ'রে তোল ॥"

একাদশ সংগীত।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল খেমটা।

বিপ্রবালকোক্তি।

লুচি মণ্ডা খেয়ে মনটা তুষ্ট কিন্তু প্রাণটা গেল।
কুঁচ্‌কি কণ্ঠা এক হয়েছে (বাবা) বুঝি দফা ঠাণ্ডা হ'ল ॥
জল রাখিবার স্থল রাখি নাই, উপায় কি বল।
উঠ্‌তে উদর ফাটে, (ও বাবা) শীঘ্র আমায় ধ'রে তোল ॥
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু, তাই আমার ঘটিল।
পুরি দিয়া উদর পূরি, (ও বাবা) যমের পুরি দেখ্‌তে হ'ল ॥

"সতীকে বলেন বুঝি ভাঙ্গিল অদৃষ্ট"

গান পুথি, হোম, যাগ, উৎসব গরিষ্ঠ।
ঘাট, পথ, রথ, তীর্থ স্ত্রীলোক বিশিষ্ট ॥
এই সব স্থানে বহুলোক উপবিষ্ট।
সব একরূপ নয়, আছে শিষ্টাশিষ্ট ॥
শিষ্ট লোকে ব'সে থাকে, হয়ে অধোদৃষ্ট।
এদিক্ ওদিক্ ঊর্দ্ধ দৃষ্টে চায় ধৃষ্ট ॥
গান পুথি শোনা নয়, আছে কিছু ইষ্ট।
কুদৃষ্টি কুল-বালায়, এমনি পাপিষ্ঠ ॥
দক্ষ যজ্ঞ স্থলে দেখি, এরূপ অশিষ্ট।
ইষ্টনিষ্ঠ দ্বিজ এক, স্পষ্ট বলে মিষ্ট ॥
এ কি চমৎকার ভাই, বিধাতার সৃষ্টি।
আগুণেতে পড়ে কেন, পতঙ্গের দৃষ্টি ॥

মনে খেলে মন-কলা, মনে মনে কষ্ট।
শাস্ত্র যদি সত্য হয়, পরকাল নষ্ট॥
শুনিয়া দ্বিজের বাক্য, অনেকেই তুষ্ট।
কেহ কেহ উঠে যান, মনে হয়ে রুষ্ট॥
হেথা সতী যজ্ঞস্থলে, হইতে প্রবিষ্ট।
প্রণাম করেন মায়, হইয়া ভূমিষ্ঠ॥
স্বপনের কথা ভেবে, প্রসূতি আড়ষ্ট।
"সতীকে বলেন বুঝি, ভাঙ্গিল অদৃষ্ট"॥

দ্বাদশ সংগীত।

রাগিণী বিভাস, তাল একতালা।

প্রসূতি উক্তি।

অতি কুলক্ষণ দেখি কুস্বপন,
যেন আমার নয়ন, হারায় নয়ন-তারা
তুমি যেন তারা, মুদিত করলে তারা,
গগনের তারা খসি প'ল ধরা॥
সুবর্ণ জিনিয়া মা তোমার সুবর্ণ,
অকস্মাৎ যেন হইল বিবর্ণ; অঞ্চলের স্বর্ণ পড়িল অরণ্য;
সতী মা গো, রক্তবর্ণ মেঘ বর্ষে রক্তবর্ণ ধারা॥
দক্ষ অতিরুক্ষ তাইতে নিষেধ করি,
মায়ের কথা রাখ ভব শুভঙ্করী;
এলে দয়া করে, থাক অন্তঃপুরে, হরি বলে;
যজ্ঞস্থলে যেওনা গো যোগেশ্বরদারা॥

"শুন পিতা মম নিবেদন"

জননীর চক্ষে নীর, হেরে হর-ভাবিনীর,
বক্ষঃস্থল ভাসে চক্ষু-জলে।

নানা বাক্যে ধীরে ধীরে, প্রবোধিয়া জননীরে,
উপস্থিতা হন যজ্ঞস্থলে ॥
সতীকে দেখিয়া দক্ষ, ক্রোধে কাঁপে ওষ্ঠ বক্ষ,
লক্ষ্য করি লক্ষ লক্ষ লোকে।
বাক্য কহে অতি রুক্ষ, মর্ম্মে দিয়া মর্ম্ম-দুঃখ,
যজ্ঞে সতী কে আনিল তোকে ॥
শুনেছি অজন্মা শিব, কোন্ গুণে নিমন্ত্রিব,
নির্গুণ বিশেষ আমি জানি।
এক গুণ লোকে বলে, কপালে আগুণ জ্বলে,
ভস্মে ঢেকে রাখে তনুখানি ॥
বিষ খায় শুন্তে পাই, মম বিষ হ'ল তাই,
লাজে হাঁটি বিশ ক্রোশ দূরে।
শুনে আর এক কথা, অন্তরে পেয়েছি ব্যথা,
গঙ্গা রাখে জটা-মাঝে পুরে ॥
সুখ দুঃখ নাই জ্ঞান, বাঘ ছাল পরিধান,
সিদ্ধি খান ঋদ্ধি দূরে ফেলে।
একরূপ বার মাস, শ্মশানেতে বস বাস,
উপবাস বেল পাতা পেলে ॥
মানে যত দেবতায়, বুঝাইয়া দেব তায়,
দেবতায় এনেছি সভায়।
বিনা নিমন্ত্রণে আসি, কার্য্য নষ্ট করে কাশী,
যুক্তি করি সতীকে পাঠায় ॥
আমি করি অপমান, যেচে কাশী চায় মান,
এমন আপদ দেখি নাই।
ভেবে বুদ্ধি স্থির নয়, দুঃখ প্রাণে নাহি সয়,
যজ্ঞে এসে যুটিল বালাই ॥
জনকের বাক্য শূল, ভেদ করে হৃদি-মূল,
দিক্ ভুল হইল সতীর।
মর্ম্ম দহে দুঃখানলে, বস্ত্র তিতে ঘর্ম্ম-জলে,
যেতে ইচ্ছা গর্ভে পৃথিবীর ॥

বিদরিয়া যায় বুক, তুলিতে নারেন মুখ,
অধো মুখে ধরা দরশন।
জলে ভাসে আঁখি তারা, দক্ষকে বলেন তারা,
"শুন পিতা মম নিবেদন॥"

ত্রয়োদশ সংগীত।

রাগিণী বেহাগ, তাল একতালা।

সতী-উক্তি।

হে পিতা আমি আপনি এলেম যজ্ঞ দেখ্‌তে,
ইথে শিবের দোষ নাই।
নিন্দ কেনে সদানন্দে; সে তো যজ্ঞে এসে নাই॥
সংসারে নয় মনোযোগী, যোগেশ্বর পরম যোগী;
যোগে আছেন সর্ব্বদাই॥
সদা শিব সর্ব্বত্যাগী, সংসার বৈরাগী,
তত্ত্বজ্ঞান অনুরাগী, যজ্ঞ ভাগে ইচ্ছা নাই;
শঙ্কর শ্মশান-বাসী, ত্যজ্য করে সোণার কাশী;
কাশীনাথ মাখেন ছাই॥

"দিগম্বর প্রভু মোর অম্বরে কি কাজ।"
দক্ষকে গোপনে ডেকে, দেবঋষি কন।
দেখিতেছি কুলক্ষণ, যজ্ঞে বিলক্ষণ॥
আমি ত কৈলাসে নাহি, যাই দক্ষ দাদা।
সতীকে সংবাদ দিল, কোন্ বেটা গাধা॥
যা বল তা বল কিন্তু, সত্য কথা ভাই।
সতী সত্বে যজ্ঞ করে, সাধ্য কার নাই॥
শিবপূজা নাহি করি, সতীর সাক্ষাতে।
কার সাধ্য পূর্ণাহুতি, দিবে হে যজ্ঞেতে॥
অসাক্ষাতে সব কর্ম্ম, সকলেই করে।
সাক্ষাতে করিতে গেলে, মুণ্ড চেপে ধরে॥

তাই বলি বলাবলি, অধিক কি কাজ।
কৌশলেতে কার্য্য সিদ্ধি, কর মহারাজ॥
(কার্য্য কালে পেয়ে এই, সুযোগ প্রবল।
কবিকল্প প্রকাশিছে, কলির কৌশল॥)
হাত-পাতা নামে দেবী, আছে সংগোপনে।
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি হয়, তাঁর আরাধনে॥
তন্ত্র মতে আছে তিন, নিয়ম পূজার।
অর্থ, ডালা, অনুরোধ, কামনা আচার॥
দুই গণ্ডা তামা হ'তে, ঊর্দ্ধ রূপা যত।
দেবী-পূজা হয়ে থাকে, অর্থ-তন্ত্রমত॥
শাক, মূল, ফল, শস্য, মিঠাই প্রধান।
ডালা তন্ত্রে আছে পাঁঠা, পাখী বলিদান॥
কস্য মতে মৎস্য বটে, শস্য না মিলিলে।
শুদ্ধমত পূজা হয়, লাল জল দিলে।
অনুরোধ তন্ত্র মতে, পূজা চমৎকার।
কত মেকি ঢেকি তরে, লেখা নাই তার॥
লিখন কথন এই, দুই আয়োজন।
ইহাতেই হয়ে থাকে, কার্য্যের সাধন॥
দেবী তুষ্টা হ'লে তুষ্ট, হন দেবগণ।
কটাক্ষে করিয়া দেন, অভীষ্ট সাধন॥
হাতপাতা দেবী পূজা, দিয়া কিছু ঘুষ।
সকল আপদ যাবে, হয়ে ফাস ফুস॥
নন্দী বেটা লোভী বড়, ফন্দী জানে কত।
শিবের প্রধান ভৃত্য, ঘুষে বড় রত॥
ঘুষ খেয়ে অনুরোধ, করে নিরন্তর।
তাই শুনে বর দেন, প্রভু দিগম্বর॥
ফন্দী তুলে নন্দী বেটা, সতী লয়ে সাতে।
এসেছে যজ্ঞেতে কিছু, ঘুষ দাও হাতে॥
সতী লয়ে যাবে বেটা, সে কৈলাস ভূমি।
নিরাপদে যজ্ঞে দাও, পূর্ণাহুতি তুমি॥

বড় ভাল বাসে বাসে, বাস লয়ে যাও।
বসনে নন্দীর আগে, বাসনা পূরাও ॥
নারদের উপদেশ, পেয়ে প্রজাপতি।
নন্দীকে ডাকিয়া আনি, কন শীঘ্রগতি ॥
নন্দী আমি তোরে বড় ভালবাসি ভাই।
বারাণসী খাশা বস্ত্র, তাই দিতে চাই ॥
ভাণ্ডারেতে আছে মম, অনেক বসন।
যত পার তত লও, যাহা প্রয়োজন ॥
কিন্তু ভাই কার্য্য এই, কর দয়া ক'রে।
সতীকে লইয়া যাও, কৈলাস-শেখরে ॥
শুনি নন্দী হাসি বলে, শুন মহারাজ।
"দিগম্বর প্রভু মোর, অম্বরে কি কাজ ॥"

চতুর্দ্দশ সংগীত।

রাগিণী পরজ, তাল আড়া।

নন্দী উক্তি।

কি করিব বাস।
শিব জগৎ-গুরু, কাশী কল্পতরু, মূলে নিবাস
চতুর্ব্বর্গ ফল ফলে, মহেশে সাধিলে ;
পরিত্রাণ পায় ভব-জলধি জলে ;
নাহি সামান্য ফলে, মম অভিলাস ॥
নাহি মম আকিঞ্চন, রজত কাঞ্চন,
তুচ্ছ করি চন্দন, করি ভস্ম ভূষণ ;
চন্দ্রচূড় প্রভু হরিচন্দ্রনাথের দাস ॥

"সুখে সতী পতিগুণ গান"।

এক দ্বিজ সভাস্থলে, শিবনিন্দা শুনি বলে,
একি দেখি অভদ্র আচার।

যজ্ঞে নাই সদানন্দ, সদা তাঁরে বল মন্দ,
সদানন্দ হৃদয়ে যাঁহার ॥
যদি কা'র দোষ থাকে, ডাকিয়া সাক্ষাতে তাকে,
বল হিত হইবে তাহার।
মন্দ বল অসাক্ষাতে, গরল তুলিয়া হাতে,
কেন ভাই করিছ আহার ॥
'অসাক্ষাতে নাম ধরে, যে বা দোষ ব্যাখ্যা করে,
নিন্দুকপ্রধান সেই হয়'।
নিন্দুক পাপিষ্ঠ অতি, দুরাচার নীচমতি,
অধোগতি পাইবে নিশ্চয় ॥
নিন্দুকের কু রসন, সদা করে আস্বাদন,
পর কুচ্ছা ক্ষত পূজ রক্ত।
ব্রণ মক্ষিকার মত, নিন্দা-রসে সদা রত,
নরাধম অতি পাপাসক্ত ॥
বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, আর, কোন গুণ নাই যার,
তার কার্য্য পরনিন্দা গান।
কোন স্থানে নাই মান, যথাতথা গালি খান,
অন্তে পান নরকেতে স্থান ॥
নিন্দুকের মুখে ছাই, দুরাশয় আর নাই,
তার মত এ তিন সংসারে।
বিষময়ী জিহ্বা তার, হেন কার্য্য নাই আর,
যাহা সেই নিন্দুক না পারে ॥
যে পাতে বসিয়া খায়, সেই পাতে বাহ্যে যায়,
নিন্দুকের চমৎকার রীতি।
পর-পরিবাদ পেলে, সাধে সাধে অঙ্গ ঢেলে,
বগল বাজিয়া গায় গীতি ॥
দ্বিজের নিন্দায় তাপ, দেবের নিন্দায় পাপ,
গুরুর নিন্দায় কুল ক্ষয়।
শিবের নিন্দায় গতি, নাহি পায় সুরপতি,
অধোগতি অবশ্যই হয় ॥

দ্বিজ-বাক্য মধু-ধারা, শ্রবণ করিয়া তারা,
দুঃখ-ভরা মুখ তুলি চান।
শুনাইয়া সুর নরে, ধীরে ধীরে সুধা-স্বরে,
"সুখে সতী পতি-গুণ গান॥"

"জীব শিব মম পতি"

বিশ্বনাথ বিষ খান, বাঁচিল বিশ্বের প্রাণ, যশ তাতে অতি।
জীব শিব মম পতি॥
মৃতদেহ তত্ত্ব করে, অমৃত প্রদান করে; শ্মশানে বসতি।
জীব শিব মম পতি॥
নিদান অবস্থা যার, নিদান ব্যবস্থা তার, দেন পশুপতি।
জীব শিব মম পতি॥
অসহ্য ব্যাধির দায়, যে জন যাতনা পায়; হর তার গতি।
জীব শিব মম পতি॥
বর্ণমালা তন্ত্রসার, সকলি সৃজন তাঁর; লোকে পায় মতি।
জীব শিব মম পতি॥
বীণা যন্ত্র ষড় রাগ, সৃজিলেন মহাভাগ, গীতছন্দে যতি।
জীব শিব মম পতি॥
দেবতার দৈববাণী, মহাদেব শূলপাণি; ত্রিলোকের পতি।
জীব শিব মম পতি॥
কেন পিতা নিন্দা কর, অনাথবৎসল হর, অগতির গতি।
জীব শিব মম পতি॥

পঞ্চদশ সংগীত।

রাগিণী আলিয়া, তাল একতালা।

সতী উক্তি।

শিব চরণ কৈবল্য ধাম।
ঐ যে সংসার বন্ধন, মুক্তির কারণ, অজস্র সাধে সহস্রলোচন;
সহস্রকিরণ শশী আসি করে শশীশেখরে প্রণাম॥

তন্ত্র মন্ত্র বেদ বিধি যন্ত্র গান, নিদানে শিবের নিদান বিধান ;
ত্রিজগৎ শিব-মন্ত্রে পায় জ্ঞান, তাইতে জগৎগুরু নাম।।
এমন কৃপানিধি কে আছে আর ভবে,
অসম্ভব সব ভবেতে সম্ভবে, গরলখেয়ে জীর্ণ কে করেছে কবে,
ফণী ধরে অবিশ্রাম ॥

"কবাতের ধারে আজ পড়িয়াছে সতী"

পুর-নিবাসিনী এক, রমণী যতনে।
সতীকে প্রবোধ দেন, প্রবোধ বচনে ॥
তব পিতা দক্ষ রুক্ষ জ্ঞানশূন্য অতি।
তুমি তাঁরে কোন কথা, বলনা সংপ্রতি ॥
এখানে দক্ষের বল, প্রবল সকল।
ক্ষান্ত দে মা ক্ষেমঙ্করী, যজ্ঞ হ'তে চল ॥
রাগে লোকে নাহি পাবে, হেন কার্য্য নাই।
শুভঙ্করী তোরে আমি, নিষেধি মা তাই ॥
নিজে দগ্ধ হয় লৌহ, অনল ভিতরে।
যে জন পরশে তারে, তারে দগ্ধ করে ॥
সেরূপ দুর্জ্জয় ক্রোধ, বিবোধ ঘটায়।
নিজে দগ্ধ হয় আর, অপরে জ্বালায় ॥
অতি উষ্ণ ঘৃতে জল, করিলে সেচন।
উদ্দীপন হয় বহ্নি, না নিভে কখন ॥
সেইরূপ ক্রোধ ঘৃতে দিলে বাক্য-জল।
শীতল না হয় আরো, প্রকাশে অনল ॥
তাই বলি আয় সতী, ত্যজে যজ্ঞস্থল।
উদ্দীপন কোর না মা, দক্ষ-ক্রোধানল ॥
সতী কন পতিনিন্দা শুনি বারে বার।
যে রমণী নাহি করে, তার প্রতীকার ॥
সেই নারী বৃথা করে, জীবন ধারণ।
পতিব্রতা হলে তার, উচিত মরণ ॥

পতিনিন্দা কালকূটে, যার হৃদি জরা।
সতী হয়ে সাধ্য নয়, তার প্রাণ ধরা॥
দেবতার দেব শিব, অগতির গতি।
যারে সদা পূজা করে, দেব, দেবপতি॥
জীবের কুশল হেতু, শিব নাম তাঁর।
সকল গুণের তিনি, হন একাধার॥
নিন্দা করিছেন পিতা, হেন মহেশ্বরে।
পতিনিন্দা বাক্য বজ্র, হৃদি ভেদ করে॥
পিতা নিন্দিছেন পতি, দুই গুরু অতি।
"করাতের ধারে আজ, পড়িয়াছে সতী॥

শিবোদ্দেশে সতীর খেদ।

"না যাবে তথায় সতি! না যাবে তথায়।"
যথা নারীগণ, বসি অকারণ, সময় কাটায়;
না যাবে তথায় সতি! না যাবে তথায়॥
যথা পুর জন, আছে অনুক্ষণ, পরের নিন্দায়;
না যাবে তথায় সতি! না যাবে তথায়॥
যথা প্রতিবেশী, রয়েছে নিবেশী, অধর্ম্ম সেবায়;
না যাবে তথায় সতি! না যাবে তথায়॥
যথা মূঢ়গণ, গঞ্জে গুরু জন, অকথ্য কথায়,
না যাবে তথায় সতি! না যাবে তথায়॥
যথা অহঙ্কার, অহিত আচার, অশুভ ঘটায়;
না যাবে তথায় সতি! না যাবে তথায়॥
যথা পতিধন, ত্যজে নারীগণ, পরের কথায়;
না যাবে তথায় সতি! না যাবে তথায়;
যথা প্রলাপিনী, অপ্রিয়বাদিনী, বিরোধ ঘটায়;
না যাবে তথায় সতি! না যাবে তথায়॥
যথা কলঙ্কিনী, পতি বিরোধিনী, গৃহ উজড়ায়;
না যাবে তথায় সতি! না যাবে তথায়॥

যথা বসি দূতী, করিয়া কাকুতি, প্রলোভ দেখায় ;
না যাবে তথায় সতি ! না যাবে তথায় ॥
যথা ছদ্মবেশ, দিয়া উপদেশ, অবলা ভুলায় ;
না যাবে তথায় সতি ! না যাবে তথায় ॥
যথা মূঢ় জন, মত্ত অনুক্ষণ, ইন্দ্রিয় সেবায় ;
না যাবে তথায় সতি ! না যাবে তথায় ॥
যথা নাই সতী, রত কুলবতী, কাব্য কবিতায় ;
না যাবে তথায় সতি ! না যাবে তথায় ॥
যথা পাপীগণে, ধর্ম্ম আলাপনে, কুলজা মজায় ;
না যাবে তথায় সতি ! না যাবে তথায় ॥
যথা গুরু জন, রত অনুক্ষণ, পতির নিন্দায় ;
না যাবে তথায় সতি ! না যাবে তথায় ॥
এই উপদেশ, দিয়া ব্যোমকেশ,
বুঝালে আমায় ; কত বুঝালে আমায়।
না শুনিয়া কাণে, আসি যজ্ঞ স্থানে,
মাতার মায়ায়, পিতা মাতার মায়ায় ॥
তব নিন্দা শূল, হানে হৃদি-মূল,
সহনে না যায়, আর সহনে না যায়।
আমার জীবন, করে যে কেমন,
বলিব কাহায়, আমি বলিব কাহায় ॥
ওহে প্রাণপতি, অনাথের গতি,
রহিলে কোথায়, তুমি রহিলে কোথায়।
জুড়াই এ প্রাণ, শ্রীচরণে স্থান,
দাও হে আমায়, পতি দাওহে আমায় ॥

ষোড়শ সঙ্গীত।

রাগিণী ললিত বিভাস ; তাল একতালা,
সতী উক্তি।

শ্রীচরণে স্থান দাও হে, প্রাণ যায় প্রাণ কান্ত।
পিতা দক্ষ, হয়ে রুক্ষ, দহে বক্ষ, আজ নিতান্ত ॥

তব আজ্ঞে, আজ অবজ্ঞে, আসি যজ্ঞে, হ'ল মানান্ত।
ক্ষমা কর, হে শঙ্কর, সে পাপ হব, ত্রিপাপান্ত ॥
নিষেধিলে সদানন্দ, তাইতে আমি করি দ্বন্দ্ব,
বলিলাম তোমায় কত মন্দ, হয়ে ভ্রান্ত;
তার প্রতিফল, হ'ল সফল; পতি অযশ-গরল,
হয়ে নারী, সইতে নারি, পতিনিন্দা অবিশ্রান্ত ॥

"অলঙ্কার দূরে থাক, নাহিক বসন"

সতীমুখে শিবযশঃ, শুনি দক্ষরাজ।
গর্জ্জিয়া উঠেন যেন, ভূমে পড়ে বাজ ॥
সতীকে উদ্দেশ করি, কহে পাপমতি।
কেন বিনা নিমন্ত্রণে, যজ্ঞে এলি সতি? ॥
তোর পতি পশুপতি, পশু সঙ্গ যার।
কোন বর্ণ জ্ঞান নাই, সম ব্যবহার ॥
সংস্কার তার নাই, থাকে সব স্থানে।
দেব-কুলে তার মত, কেহ নাহি মানে ॥
সিদ্ধিতে নিপুণ তোর, পতিত মহেশ।
কোন গুণ নাই তার, নির্গুণের শেষ ॥
শুনিয়াছি আমি তার, অর্থ কিছু নাই।
অনর্থের মূল সেই, গায় মাখে ছাই ॥
আগে যদি জানিতাম, শিব-গতি এই।
তবে কি তাহারে আমি, স্বর্ণ-সতী দেই ॥
কৃত্তিকা রোহিণী কন্যা, করিয়াছি দান।
সে জামাই ধনী মানী, রূপ গুণবান্ ॥
এসেছে তাহার দারা, তারা চমৎকার।
পট্টশাটী পরিধান, স্বর্ণ অলঙ্কার ॥
সতীর কপালে ঘটে, অঘট ঘটন।
"অলঙ্কার দূরে থাক, নাহিক বসন ॥"

"মুদিত নয়ন-তারা, হারান জীবন"
পতিনিন্দা শুনি সতী, ভাসে অশ্রুজলে।
বিদরিয়া যায় বুক, দক্ষে ডেকে বলে॥
আপনি এসেছি পিতা, নিমন্ত্রণ নাই।
দুখিনী বলিয়া কর, অপমান তাই॥
ভিকারীর নারী ব'লে, ঘৃণা কর কত।
নিঃস্ব নয় বিশ্বনাথ বিশ্ব অনুগত॥
কুবের ভাণ্ডারী তাঁর, সুখ ইচ্ছা নাই।
ত্যজিয়া সোণার কাশী, গায় মাখে ছাই॥
পতি যার ত্রিলোচন, ত্রিদেব লোচন।
তার কিবা প্রয়োজন, সামান্য ভূষণ॥
পতি যার চন্দ্রনাথ, চন্দ্র শোভে শিরে।
তার ভার্য্যা কি করিবে, তুচ্ছ মণি হীরে॥
পতি যার পশুপতি, দেবতার পতি।
পট্ট বাসে তুষ্ট নয়, তার ভার্য্যা সতী॥
নারীর ভূষণ পতি, কহেন বিদ্বান্।
সতীর ভূষণ পতি, দয়ার নিধান॥
সহ্য করা যায় পিতা, অহির দংশন।
সহ্য করা যায় পিতা, সতিনী-গঞ্জন॥
সহ্য করা যায় পিতা, অনলের তাপ।
সহ্য করা যায় পিতা, গুরুজন-শাপ॥
বজ্রাঘাত হ'লে বুকে, সহিবারে পারি।
নারী হয়ে পতি-নিন্দা, সহিবারে নারি॥
এত বলি মহামায়া, করেন ক্রন্দন।
"মুদিত নয়ন-তারা, হারান জীবন"॥

সপ্তদশ সঙ্গীত।

রাগিণী রামকেলী ; তাল একতালা,

পদকর্তার উক্তি।

পতিনিন্দা শুনি সতী সকাতরা।
পতিত ধরণীঃ পতিত পাবনী,
চৈতন্য রূপিণী, হন চৈতন্য হারা॥
পতিনিন্দা কাল ভুজঙ্গিনী হয়ে,
শ্রবণ-বিবরে পশিল হৃদয়ে ;
দংশিল অন্তরে, হৃদয় বিদরে,
বিষের জ্বালায় কালী, কালী কাল-দারা॥
বিবর্ণ হইল সুবর্ণ মূরতি,
শশি-মুখে মসী রাশি আসি স্থিতি ;
পতি পশুপতি প্রতি রেখে মতি,
যোগেন্দ্রমোহিনী তারা মুদে তারা॥

"প্রাণ পরিহরিলেন তারা"

পতিব্রতা যে রমণী, রমণীর শিরোমণি,
পতি ভিন্ন অন্য নাহি জানে।
সতীর পরম ধর্ম্ম, পতিসেবা মুখ্য কর্ম্ম,
অন্য ধর্ম্ম কিছু নাহি মানে॥
পতি জরা-কলেবর, হইলেও অনাদর,
নাহি করে পতিব্রতা নারী।
শুদ্ধচিত্ত একান্তরে, সদা পতিসেবা করে,
যথা-কালে দেয় অন্ন বারি॥
ভাগ্য-ফলে যদি পতি, হয় দুষ্ট পাপমতি,
সদা করে অহিত আচার।
পতিব্রতা নারী যেবা, নাহি ছাড়ে পতিসেবা,
নাহি করে অযশ তাঁহার॥

পতিনিন্দা হয় যথা, প্রাণান্তে না যায় তথা,
পতিব্রতা রমণী সকল।
দিবানিশি পতি ধ্যান, পতি প্রাণ পতি জ্ঞান,
চিন্তা করে পতির কুশল ॥
পতির অযশঃশর, বিঁধিলে হৃদয়-ঘর,
সহিতে না পারে সতী যারা।
পতিনিন্দা শুনি কাণে, অধৈর্য্য হইয়া প্রাণে,
"প্রাণ পরিহরিলেন তারা।"

"সবেদন করে নিবেদন।
দংশে নিন্দা-ভুজঙ্গিনী, কালীকায়া হেমাঙ্গিনী,
মেঘাচ্ছন্ন গগণের তারা।
মৃতকায় মৃত্তিকায়, নিরখিয়া অম্বিকায়,
সবে শবপ্রায়; চক্ষে ধারা ॥
চারি দিক্ নিরুৎসব, কাঁদে পুরবাসী সব,
ছিন্নতরু ধরণী-শয়নে।
তারা সহোদরা তারা, হাহাকার করি তারা,
কাঁদে, ধারা বহে দু-নয়নে।
প্রসূতি হা সতী ব'লে, মূর্চ্ছা যান ধরাতলে,
ধোরে তোলে অন্তঃপুর নারী।
দক্ষরাজা অধোমুখ, বাক্য নাই যেন মূক,
মনে দুঃখ, চক্ষে নাহি বারি ॥
ভবদারা ভবতারা, হইলেন প্রাণ হারা,
এই বাক্য করিয়া শ্রবণ।
ভাবি নন্দী ঘোরাপদ, করে ধরি তারা-পদ,
"সবেদন করে নিবেদন ॥"

অষ্টাদশ সংগীত।

রাগিণী ললিত, তাল আড়া।

নন্দী উক্তি।

ত্যজে মণি মন্দির চতুর্দ্দোল রত্ন আসন।
কি বিষাদে ও মা সতী, করেছ আজ ধরায় শয়ন॥
কি দুঃখে হরিলে জীবন, ওমা তারা জগৎ জীবন;
হর হৃদে হর সর্ব্বক্ষণ; (তুমি) সর্ব্বজয়ের সর্ব্বস্ব ধন॥
যখন আসি যজ্ঞ স্থলে,
ত্রিলোচন ভাসি ত্রি-লোচনের জলে,
ত্রিলোচনী ধর ব'লে, দিলেন ত্রিলোচন;
মাতৃহীন হয়ে এখন, কেমনে যাই শিবের সদন,
সুধালে দিক্-বসন হরি! (হরি) করিবে কি নিবেদন॥

"মাতৃহীন সন্তানের বেঁচে কিবা ফল।"

তারা পদ ধরি নন্দী, বলে সকাতরে।
প্রাণ হর, হরপ্রিয়া, দক্ষ অনাদরে॥
পতিনিন্দা শুনি সতি! প্রায়শ্চিত্ত কর॥
সতীত্বের পরিচয়, দিতে প্রাণ হর॥
এ যশ গাইবে তব, জগৎ সংসার।
কেবল হইল মা গো! কলঙ্ক আমার॥
আমি মূঢ় ভৃত্য, প্রভু নিন্দা শুনি কাণে।
এখন রয়েছি বেঁচে, ধিক্ মম প্রাণে॥
আমি অজ্ঞ অকৃতজ্ঞ, চলচিত্ত অতি।
কেমনে কৈলাসে যাব, তাই ভাবি সতি?
জিজ্ঞাসিলে ভব মোরে, কোথা ভবতারা।
কি বলিব আমি তাই, ভাবি ভবদারা॥
তোমা ভিন্ন গতি নাই, ওমা ত্রিনয়নী।
ভবের সর্ব্বস্ব ধন, তুমি দাক্ষায়ণী॥

ক্ষেপা ত্রিপুরারি সদা, শ্মশানে বেড়ান।
তুমি সংসারের গতি, সংসারের প্রাণ॥
তোমা বিনা ওমা! ভব-সংসারের গতি।
কি হইবে নিজদাসে, তাই বল সতি!॥
অন্নপূর্ণা বিনা মা গো! দিবা অন্ন জল।
কে তুষিবে আশুতোষে, তাই মোরে বল॥
কে করে সংসার কার্য্য, বিনা দশভুজা।
কে করে প্রত্যূষে বল, নিত্য শিবপূজা॥
অন্নপূর্ণা বিনা মা গো, সংসারের মাঝে।
অন্ন দিযা রক্ষা করে, অন্য কেবা আছে॥
তুমি যদি সংসারের, মাযা পরিহরি।
চলিলে মা! তবে আর কিসে প্রাণ ধরি॥
ক্ষুধার সময তারা, মা ব'লে দাঁড়াই।
অন্ন দাও এত দিন, বেঁচে আছি তাই॥
এত বলি নন্দী কাঁদে, চক্ষে পড়ে জল॥
"মাতৃহীন সন্তানের বেঁচে কি বা ফল॥"

ঊনবিংশ সংগীত।

রাগিণী কাল্যাংড়া, তাল কয়ালি।
পদকর্ত্তার উক্তি।

নিরানন্দে নন্দী চলে কৈলাসে।
আঁখি জলে, আঁখি তারা হারা দুটী আঁখি তারা ভাসে॥
যথা শিব তারাপতি, তথা ত্বরা করি গতি
নিবেদন মনোবেদন প্রকাশে;
উমায হারাযেছি বলে উমেশে;
তারা শশী বিনা আঁধার কৈলাস হ'ল দিবসে॥
কি কব হে ভূতনাথ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত,
অকস্মাৎ হ'ল যেন শিরে, তব নিন্দা সাপিনীর রূপ ধরে;
দংশিল হৃদয়ে সতীর প্রাণ যায় বিষে॥

"গিরিশ রজত-গিরি ভাসিতে লাগিল।"

শুনি নন্দীর বচন, শুনি নন্দীর বচন।
মরমে পেলেন হর, পরম বেদন॥
মুখে বাক্য নাহি সরে, মুখে বাক্য নাহি সরে।
সতীর বিচ্ছেদ শরে, বক্ষঃভেদ করে॥
সতী শোকে দিগম্বর, সতী শোকে দিগম্বর।
দরশন করিছেন, দশ দিগম্বর॥
শূন্যে নাহি দেখে তারা, শূন্যে নাহি দেখে তারা।
তারাপতি হইলেন, আঁখি তারা হারা॥
দেখি জগৎ আঁধার, দেখি জগত আঁধার।
আকুল বাতুল প্রায়, জগত আঁধার॥
শোক দাহ অনিবার, শোক দাহ অনিবার।
নির্ব্বিকারে ঘটাইল, বিরহ বিকার॥
শোকে বলিছেন হর, শোকে বলিছেন হর।
বিনা দোষে কেনে, সতি! পতি পরিহর॥
নাহি জানি তোমা বই, নাহি জানি তোমা বই।
ক্ষণকাল না দেখিলে তারা হারা হই॥
আমি না জানি কখন, আমি না জানি কখন।
কেমনে করিতে হয়, সংসার পালন॥
তুমি সংসারকারিণী, তুমি সংসারকারিণী।
সংসার পালন কর, সংসার পালিনী॥
আমি যথা তথা যাই, আমি যথা তথা যাই।
অন্নপূর্ণে! তব গুণে, অন্ন খেতে পাই॥
কি বলিব তব কথা, কি বলিব তব কথা,
কখন পতির কথা, না করে অন্যথা॥
আমি যদি সিদ্ধি চাই, আমি যদি সিদ্ধি চাই।
সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধি দাও, সিদ্ধি পাই তাই॥
সিদ্ধি করি যত বস্তু, সিদ্ধি করি যত বস্তু।
তাই সিদ্ধি হও তুমি, বৎ সিদ্ধি স্ব...

তুমি সিদ্ধি করা ধন, তুমি সিদ্ধি করা ধন।
সিদ্ধি করি হারাইলাম, আমি অভাজন ॥
বর্ণে পঞ্চানন শোক, বর্ণে পঞ্চানন শোক।
কেমন বর্ণিবে তাহা, একানন লোক ॥
শোক-সিন্ধু উথলিল, শোক-সিন্ধু উথলিল।
উলটি রজত-গিরি, ধরাতে পড়িল ॥
ভয়ে ফণি পলাইল, ভয়ে ফণি পলাইল।
নাগপাশ জটাবন্ধ, স্খলিত হইল ॥
গঙ্গা নয়নে পশিল, গঙ্গা নয়নে পশিল ॥
"গিরিশ রজত-গিরি, ভাসিতে লাগিল ॥"

বিংশ সংগীত।

রাগিণী বিভাস ঝিঁঝিট, তাল ঝাঁপতাল।

পদকর্ত্তার উক্তি।

সতী-শোকে পতিত-পাবন, পশুপতি পতিত ধরা।
সুন্দর রজত-গিরি, ধরা লোটায় না যায় ধরা ॥
জীবন তারা বিনা তারাপতি, হল রে আজ জীবন হারা;
অন্য ধ্বনি নাহি শুনি, ধ্বনি কেবল তারা তারা;
ত্রিনয়নের ত্রিনয়ন-তারায়, তারাকারা ধারা ॥
ওরে, নিরানন্দে সদানন্দ, নন্দীকে বলেন ত্বরা,
কি বলিলি ওরে নন্দী, তারা কি হলেম হারা;
ভবের আপদ যায় রে দূরে, চিন্তা, করি যে তারাপদ;
তারাপদ দক্ষযজ্ঞে, দিলি নন্দী কি সংবাদ;
কোথা আপদ-ভঞ্জিনী হৃদি-রঙ্গিনী তারা ॥

"ভয়ে যমের যম-যন্ত্রণা"

চমকিত থাকি থাকি, ক্রোধে শিব রক্ত-আঁখি,
ধীরতা হারাইলেন ধীর।
জটাধর জটা ধরি, ফেলিলেন ছিন্ন করি,
তাহে জন্মে বীরভদ্র বীর ॥

মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর দুটী চক্ষু দিবাকর,
উচ্চ চূড়া পরশে গগণ।
বীরভদ্র স্তব করে, যোড়করে মহেশ্বরে,
নত শিরে বন্দিল চরণ॥
ত্বরা গিয়া দক্ষযজ্ঞে, যজ্ঞ অধিকারী দক্ষে,
আজ্ঞা দেন বিনাশিতে হর।
বীরভদ্র ভদ্রমতি, বুঝাইতে পশুপতি,
বিনতি করেন অতঃপর॥
অজ্ঞে যদি করে দোষ, বিজ্ঞে নাহি করে রোষ,
তাহে আশুতোষ নাম ধর।
প্রজাপতি গুরুজন, পশুপতি কদাচন,
তাঁরে নাহি গুরু-দণ্ড কর॥
অকলঙ্ক নামে তব, কলঙ্ক হইবে ভব,
স্থির ভব দাসের প্রার্থনা।
সতী বিনা-নিমন্ত্রণে, যান পিতৃ-নিকেতনে,
তাই ঘটে অঘট ঘটনা॥
তব নিন্দা শুনি কাণে, সতী ত্যজিলেন প্রাণে,
দেখাইতে সতীত্ব আপন।
বধ-যোগ্য দক্ষ নয়, তাই করি অনুনয়,
ক্ষমা কর হে ভূতভাবন॥
শুনি বীরভদ্র-বাণী, কহিছেন শূলপাণি,
দহে সতী-শোক হুতাশন।
উপদেশ দ্বৃত আর, দিও না হে বারে বার,
ত্বরা কর যজ্ঞ বিনাশন॥
বুঝি হর অভিপ্রায়, বীরভদ্র নিরুপায়,
সজ্জা করে দানা সেনাগণ।
দিয়া শত শত লম্ফ, করে বীর বীর-দম্ফ,
ভূমিকম্প হয় ঘনে ঘন॥
অদ্ভুত কিম্ভুত ভূত, সকলেই ক্রোধ যুত,
অগণন শিব-সৈন্য যত।

দানা সাজে দলে দলে, ক্রোধে মার মার বলে,
অগ্নি জলে চক্ষে অবিরত ॥
প্রেত নাচে পালে পালে, বাদ্য করে গালে গালে,
চালে চালে বেড়াইছে ছুটে।
তুলনায় যেন তাল, সাজিল বেতাল তাল,
দেখে ভয়ে মুখে রক্ত উঠে ॥
কটা কটা ভূত কটা, শব্দ করে ঘন ঘটা,
গর্জ্জে যেন স্বর্গে নিরন্তর।
দানা সেনা যত ছিল, তারা হাতে শূল নিল,
দেখে তুষ্ট শূলপাণি হর ॥
থর থর কাঁপে ধরা, শিবসৈন্য ভার ধরা,
ভার হল তাঁর অতিশয়।
দশ দিক্ টলমল, ক্ষিতি যায় রসাতল,
জল স্থল বুঝি এক হয় ॥
বীরভদ্রে করি দৃষ্টি, ব্রহ্মা কন গেল সৃষ্টি,
শর বৃষ্টি অতি চমৎকার।
অচল পবন গতি, কর শূন্য দিবাপতি,
ভয়ে মরে দেব পুরন্দর ॥
চন্দ্রের ত চন্দ্রায়ণ, নারায়ণ পলায়ন
করিবারে করেন মন্ত্রণা।
অন্য দেব যথা তথা, ভয়ে স্তব্ধ নাহি কথা,
"ভয়ে যমের যমযন্ত্রণা ॥"

একবিংশ সংগীত।

রাগিণী পীলু, তাল কয়ালি।

পদকর্ত্তার উক্তি।

চলিল বীরভদ্র বীর দক্ষযজ্ঞ বিনাশনে।
সঙ্গেতে অদ্ভুত ভূত, ভূতনাথের আজ্ঞা পালনে ॥

যজ্ঞকুণ্ড লণ্ডভণ্ড, দেখিয়া প্রচণ্ড কাণ্ড,
তুণ্ড কাঁপে পলায় দ্বিজগণে ;
(ওরে) ভূতে ছাড়ে হুহুঙ্কার, চূর্ণ দক্ষ অহংকার,
ছিন্ন মুণ্ড কদাকার, ধরা আসনে ॥
ভয়ংকর গালবাদ্য, নিবারে কাহার সাধ্য,
দেবারাধ্য শিবসৈন্যগণে ;
(ওরে) তালে তালে নাচে তাল, বেতাল ধরিছে তাল ;
উপস্থিত প্রলয়কাল দক্ষভবনে ॥

"কবে সতি ! ভবে দেখা দেবে"

চূর্ণ দক্ষ অহঙ্কার, ছিন্নমুণ্ড কদাকার,
হাহাকার করে সর্ব্বজন।
দূরে ফেলে দিয়া মুণ্ড, নিবাইল যজ্ঞকুণ্ড,
প্রস্রাবের ধারে, ভূতগণ ॥
পলাইল হুতাশন, কক্ষে করি কুশাসন,
দ্বিজগণ উর্দ্ধশ্বাসে ধায়।
ভূতগণ রাগে রাগে, দাঁড়াইলা গিয়া আগে,
দন্ত কড়মড় করি চায় ॥
ভূতে দেয় মাথা দাবা, কেহ বলে বাবা বাবা,
বাবা ভূত আমারে মরনা।
আমি ত না জানি কিছু, এসেছি সবার পিছু,
বিনা দোষে দিওনা যন্ত্রণা ॥
নারুদে ব্রহ্মার বেটা, ঘটায়েছে সব লেঠা,
নিমন্ত্রণ দিয়া সবাকার।
তাই আসি যজ্ঞস্থলে, কিছু অর্থ পাব বোলে,
অনর্থ জানিনা কিছু আর ॥
ভয়ে হয়ে দিগম্বর, কেহ বলে দিগম্বর,
রক্ষা কর এ ঘোর বিপদে।
এইরূপে সভাভঙ্গ, ভূত প্রেত করি রঙ্গ,
নাচিছে বিপরীত দ্বিপদে ॥

স্বর্গ মর্ত্ত্য টল মল, ধরাতল রসাতল,
যায় যায় ভাবে দেবগণ।
একতান সকাতরে, মহেশ্বরে স্তব করে,
শুদ্ধচিত্ত হয়ে এক মন॥

অনাদি অঘোরনাথ, অজর অমরতাত,
আশুতোষ তোষ হে।
সত্য শম্ভু উমাপতি, জগগুরু জগপতি,
হর হর দোষ হে॥
শঙ্কর করুণাকর, অক্ষমাল দিগম্বর,
শিব শিব-দাতা হে।
ত্রিশূল ডমরু ধারী, ত্রিপুর সংহার কারী,
ভব ভব-ত্রাতা হে॥
ধূর্জ্জটী ধুতূরা আসী, ককুদ্ কৈলাস বাসী,
প্রভাকর কর হে।
দেবদেব মহেশ্বর, নীলকণ্ঠ স্থূলোদর,
শশধর ধর হে॥
ভজিলে তোমায় প্রভু, না থাকে জীবের কভু,
মহাভয় ভয় হে।
নেহার করুণা-চক্ষে, কর দেব সৃষ্টি রক্ষে,
মৃত্যুঞ্জয় জয় হে॥

স্তবে তুষ্ট পশুপতি, দক্ষালয়ে করি গতি,
দক্ষ গতি করেন বিধান।
ভূতে করি নিবারণ, ভূতনাথ ত্রিলোচন,
করিলেন আদেশ প্রদান॥
বীর সবে হও স্থির, আন দক্ষরাজ-শির,
কোন বীর মুণ্ড নাহি পায়।
কি হবে দক্ষের গতি, চিন্তা করি পশুপতি,
হইলেন অতি নিরুপায়॥

ছাগ-মুণ্ড দূরে ছিল, বীরভদ্র এনে দিল,
শিবনিন্দা প্রতিফল ফলে।
অজামুণ্ড স্কন্ধোপরে, প্রাণ পেয়ে দক্ষ পরে,
পূর্ণাহুতি দেন যজ্ঞানলে॥
যজ্ঞ সমাধান করি, সতী-দেহ শিরে ধরি,
নাচিছেন গঙ্গাধর ভাবে।
ব্যাকুল হইয়া অতি, কহিছেন পশুপতি,
"কবে সতি! ভবে দেখা দেবে॥"

দ্বাবিংশ সংগীত।

রাগিণী ভৈঁরব, তাল একতালা।

শিবোক্তি।

কিবা দোষে দোষী করি, নিজ দাসে পরিহর, হরশঙ্করী।
তোমা বিনা কেমনে কাল হরি;
(ওহে) হর-পাপ হর, হরতাপ হর, হরপ্রাণ, প্রাণহরী॥
তোমা ভিন্ন সতি, নাহি অন্যগতি, আমি ক্ষেপা ত্রিপুরারি;
আমি বড় ক্ষুধার কালে, অন্নপূর্ণা ব'লে; ডাক্‌লে দাওহে অন্ন বারি॥
শিবে আর কি তোষিবে, আশুতোষ শিবে,
তব দুখ বিনাশিবে, আসি ভবে, কৈলাস শেখরে প্রকাশিবে,
সুখশশী আসি সুখেশ্বরী;
কবে সদানন্দে কর্‌বে সদানন্দ; আনন্দ বিতরণ করি;
(ও গো) সদানন্দময়ী,
নিরানন্দে আর কত দিন রহিবে হরি॥

"হরি আনন্দিত হয়, রূপ নিরখিয়া॥"
সুদর্শন চক্র ধরি বিষ্ণু নিজ করে।
ফেলিলেন সতীদেহ, খণ্ড খণ্ড করে॥
হইল বায়ান্ন স্থানে, মহাপীঠ নাম।
কামাখ্যা প্রভৃতি করি, কালীঘাট নাম॥

সতী-শোক মহা অগ্নি, করিতে নির্ব্বাণ
যোগেশ করেন মন, যোগে সমাধান ॥
হিমালয়ে জন্মে সতী, মেনকা উদরে।
হরিশ গিরিশ অতি, আনন্দ না ধরে ॥
গিরিবালা গৌরী নাম, হইল দুর্গার।
জানিয়া ভবের মনে, আনন্দ অপার ॥
নারদ ঘটক হয়ে, ঘটান সম্বন্ধ।
বর বেশে গিরিপুরে, যান সদানন্দ ॥
হরিশে গিরীশে গিরি, করি গৌরী দান।
কৌতুকে যৌতুক দিয়া, রাখিলেন মান ॥
হর নামে বসিলেন, হরী হরপ্রিয়া।
"হরি আনন্দিত হয় রূপ নিরখিয়া" ॥

ত্রয়োবিংশ সংগীত।

রাগিণী ভৈরবী, তাল একতালা।

পদকর্ত্তার উক্তি।

(মরি) হরবামে হরী বসি।

হর দুঃখ হবে, রজত শেখরে, আলো করে যেন শরদ শশী ॥
হর গৌরী মিলিত অঙ্গ কি সুন্দর, আধ ধবল গিরি, আধ শশধর।
আধ বেণী আধ জটা মনোহর, আধ আঁখি জবা আধ যে সরসী।
দক্ষিণ শ্রবণে ধুতুরার ফুল, বামকর্ণে স্বর্ণ-কুণ্ডল অতুল,
খগ-চঞ্চু নাসা আধ তিল ফুল,
অধরে না ধরে মধুর হাসি ॥
বলয়া কঙ্কণ কর শোভা করে, অক্ষমণি হারে, মুনি মনোহরে;
দ্বিভুজ সজ্জিত ত্রিশূল ডম্বুরে;
অন্য ভুজদ্বয়ে চক্র করাল অসি ॥
বাঘাম্বর সনে নীলাম্বরী সাজে, যুগল চরণে স্বর্ণ নূপুর বাজে;
হরিহররূপ হৃদয় সরোজে; হরি দরশন করে দিশি নিশি ॥

দক্ষযজ্ঞ সমাপ্ত।

বিজয়া।

উমা।

হিমালয়ে শিবের আগমন।

গিরিপুরে গিরিজায়, আনিতে গিরীশ যায়,
গিরীশ হরিষ অতিশয়।
কৃত্তিবাসে ভালবাসে, বসাইযা ভাল বাসে,
আদরে কুশল জিজ্ঞাসয়॥
অগ্রে করে অর্ঘ্য দান, ধূম পান জল পান,
পরে পান পাণ গোটাকত।
ভোজনে যা প্রয়োজন, গিরিরাজ-প্রিয়জন,
আয়োজন করে নানা মত॥
বৈদ্যনাথ বৈষ্ণবাংশ, নাহি খান মাছ মাংস,
তরকারি ডাল বংশ পাক।
খাওয়াইতে একান্ন, ব্যঞ্জন পদ একান্ন,
ইহা ভিন্ন নানা মত শাক॥
নাই যার পর মান্য, পরিশেষে পরমান্ন,
মিঠাই মিষ্টান্ন স্বাদু জল।
জামাতারে ডেকে আনি, নিজ হাতে গিরিরাণী,
খেতে দেন, সুখে ঢল ঢল॥
ফেলে রেখে শাক পাত, ধীরে ধীরে তুলে হাত,
অন্ন খান অন্নদার স্বামী।
মেনকা বলেন বাছা, বাছা দ্রব্য কেন বাছা,
বেছে পাক করিয়াছি আমি॥

অন্তঃপুর-নারীগণ, অন্তরালে থেকে কন,
সুপদে যে জন হয় শালী।
কটিবস্ত্র ছেড়ে দাও, হাত তুলে ভাত খাও,
লজ্জায় রেখ না পেট খালি॥
সভ্য মূল তুমি ভাই, কাশীনাথ কাজ নাই,
গলায় আঙুলে কাশী তুলে।
বিবাহ-সভায় হর, হয়েছিলে দিগম্বর,
ভোলানাথ সব গেছ ভুলে॥
লজ্জা পেয়ে লজ্জা মাগী, দেশ ছাড়ে তার লাগি,
মিছে কেন উন রাখ পেট।
এত বলে নারীগণ, হাস্য করি ত্রিলোচন,
কথা কন মাথা করি হেট॥
লজ্জা পেয়ে গেলে লজ্জা, লুকায়ে সমর-সজ্জা,
কে করিত ইন্দ্রজিৎ প্রায়।
বুঝিয়াছি বিলক্ষণ, শিরঃপীড়া কুলক্ষণ,
মাথা তোলা হইয়াছে দায়॥
আহারের দোষে জ্বর, বলে যত বৈদ্যবর,
সুস্থ হেতু বস্তু বিবেচনা।
বয়স চরম ভাগে, নরম যে ভাল লাগে,
শক্ত দ্রব্য বিরক্ত ঘটনা॥
গরম পিষ্টক পুলি, নবম নরম গুলি,
দুধে গুলি খেয়েছি সকল।
হাতে পাতে যত পাই, কিছুমাত্র রাখি নাই,
জল বাকী রয়েছে কেবল॥
বলে তরঙ্গিনী নারী, এত নহে জ্বর জারি,
হাই উঠে করিতে আলাপ।
অনুভব করি তাই, সিদ্ধি বুঝি খাও নাই,
সিদ্ধিদাতা গণেশের বাপ॥
রমা বলে সর্ব্বনাশ, চন্দ্র করে রাহু গ্রাস,
ভেক গিয়া খাইল ভুজঙ্গ।

সোণাতে ধরিল ঘুণ, জলের আগুণ গুণ,
পুড়ে গেল গঙ্গার তরঙ্গ ॥
সরস্বতী চণ্ডী ভুলে, মধু নাই পদ্মফুলে,
ব্রহ্মার মন্দাগ্নি, ভোগী যোগী।
ছন্দ নাই রচে পদ্য, সেইরূপ দেখি অদ্য,
বৈদ্যনাথ মাথা-ধরা রোগী ॥
হেঁটেছ রৌদ্রের তাতে, মাথা ধরিয়াছে তাতে,
জল দাও জল হয়ে যাবে।
গৃহে মাথা ধরা হ'লে, ঠাণ্ডা হ'তে গঙ্গাজলে,
গিরিপুরে গঙ্গা কোথা পাবে ? ॥
যুক্তি শুন গঙ্গাধর, গঙ্গারে স্মরণ কর,
নামে গঙ্গা হবে কূপ জল।
এত বলি ব্যঙ্গ করে, পুরনারী রঙ্গভরে,
মুখে বস্ত্র হাসি খল খল ॥
শুনিয়া মেনকা রাগে, বলে মেয়েদের আগে,
আরে ম'ল মেয়ের আস্পর্দ্ধা।
বেহায়া সব বৌ ছুঁড়ি, কথা বন্ধ হাতে তুড়ি,
এদিকেত চক্ষে নাই পর্দ্দা ॥
লজ্জা দেখি বিলক্ষণ, ইন্দ্রজিৎ করে রণ,
আড়ালে দাঁড়ায়ে রসবঙ্গ।
কথাগুলি চোকা বাণ, যাতনায় যায় প্রাণ,
বিষে জ্বলে অনঙ্গের অঙ্গ ॥
মেনকা রাগিয়া উঠে, ছুঁড়িরা পলায় ছুটে,
শিবের ভোজন সমাপন।
গিরিরাণী সকাতরে, গিরিকে বলেন পরে,
নিবেদন শুনহে রাজন ! ॥

রাগিণী ভৈরবী, তাল একতালা।

করি নিবেদন, শুন হে রাজন!
অবোধ জামাই আমার সদানন্দ।
নিতে উমা-ধনে, এলেন তব ভবনে,
প্রাণ উমায়, দিব না বিদায়,
না হয় ইথে আমায়, লোকে বলিবে মন্দ
যদি হে নিষেধ না শুনি আমার,
উমায় নিতে জিদ করেন বারংবার;
আমি কেন মান রাখিব তাঁহার,
না হয় জামাই ঝিয়ে করিব দ্বন্দ্ব॥
শিবের ঘরে যে সুখ সকলি ত জানি,
অন্ন বিনা শীর্ণা হয়েছেন ঈশানী;
গঙ্গা নামে আছে উমার সতিনী,
তারে শিরে ধরে শিবের আনন্দ॥

শয়ন মন্দির।

সদানন্দময়ী আর, সদানন্দ হর।
শয়ন-মন্দিরে কথা-ছলে মনান্তর॥
ভবানী বলেন ভব, এ তব কি রীত।
দু'দিন না গত হতে, হলে উপনীত॥
তিন দিন তরে আমি, লয়েছি বিদায়।
না হয় হে পাঁচ দিন, রলাম হেথায়॥
তাতে তব ক্ষতি নাই, ঘুচেছে জঞ্জাল।
গঙ্গাজলে গঙ্গাধর, থাকিতে হে ভাল॥
শিরঃপীড়া মনঃপীড়া, আর চিন্তানল।
গঙ্গাজলে সব রোগ, হয়ে যেত জল॥
ভব কন, জ্বালা দাও, কথায় কথায়।
অন্নদা না হ'লে অন্ন, মিলিবে কোথায়?॥
জল পানে তৃষ্ণা যায়, ক্ষুধা যাবে কিসে।
গিরিপুরে আসি তাই, হারাইয়া দিশে।

ভোলানাথ বটে আমি, ভুলি না কখন।
মায়া করি হরি! অন্ন, হরিলে যখন॥
লোকনাথ নাম বটে, ত্রিলোকে বেড়াই।
কোন স্থানে এক মুষ্টি, অন্ন নাহি পাই॥
অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণে! রাখিলে জীবন।
শিবা বিনে শিবে অন্ন, মিলে না কখন॥
হাসিয়া হরের প্রতি, কন জগদম্বা।
কাজে কিছু নাই কিন্তু, কথা গুলি লম্বা॥
ভালবাস [illegible]বাস হে, বাসনা আমার।
সদানন্দ সদা থাকি, নিকটে তোমার॥
পথশ্রান্ত হয়ে কান্ত! কেন এলে তুমি।
যেতেম তিন দিনান্তে, সে কৈলাস ভূমি॥
শিরো বিলাসিনী গঙ্গা, রেখে একা ঘরে।
আসা ভাল হয় নাই, গিরীশ নগরে॥
সোহাগিনী হিমশিলা, গঙ্গা যে তোমার।
রাগোত্তাপে গলে গেলে, নাহি পাবে আর
এক পথে চলে না সে, ত্রিপথ-গামিনী।
পথ ছাড়া হ'লে নাহি, পাবে শূলপাণি॥
ভোল নাই ভোলানাথ, ভুলিবার নয়।
গিয়াছিল একবার শান্তনু আলয়॥
বেগবতী সুরধনী, গতি জান তাঁর।
এবার হারালে ভব, নাহি পাবে আর।
পিপাসায় নীলকণ্ঠ, শুষ্ককণ্ঠ হ'লে।
কি করিবে অন্ন বল, ভিন্ন গঙ্গা জলে॥
তাই বলি অন্নদা, না; তোমার জীবন।
জীবন হয়েছে তব গঙ্গার জীবন॥
এরূপ কন্দলে হয়, নিশীথ সময়।
নিদ্রিত হলেন পরে, উমা মৃত্যুঞ্জয়॥
রজনী প্রভাতে উমা, যাবেন কৈলাসে।
অনিদ্রায় গিরিরাণী, ভাবেন হুতাশে॥

বিনয় করিয়া কন, রজনীর প্রতি।
প্রভাত হও না নিশি, দাসীর বিনতি॥

রাগিণী আলেয়া, তাল আড়াঠেকা।

শুন গো রজনী, করি মিনতি তোমারে।
অচলা হও আজকার তরে, অচলারে দয়া করে॥
সাধে কি নিষেধে দাসী, তুমি অস্তে গেলে নিশি;
অস্তে যাবে উমা-শশী; হিমালয় আঁ[illegible]র করে॥
কি বলব তোমায় যামিনী, তুমি ত অন্তর্যামিনী,
অন্তরের ব্যথা আপনি, সকলি জান অন্তরে।

গিরিরাণীর সখেদ কুলনিন্দা।

পাষাণী বলেন শুন, শুন গো রজনী।
রমণীর ব্যথা জানে, কেবল রমণী॥
তাহাতেই বলিতেছি, মরমের কথা।
ক্ষণেক তিষ্ঠিয়া দেখ, মানবের ব্যথা॥
যে ধরে উদরে মেয়ে, সেই জানে ভাল।
মেয়ের জ্বালায় মার, হাড় হয় কাল॥
প্রসব হইতে মেয়ে, অধিক বেদনা।
পালন করিয়া পরে, পর আরাধনা॥
যতনে রতন রেখে, পরে দিয়া দান।
ভাবনা যাতনা হেতু, সদা জ্বলে প্রাণ।
বয়োধিক হ'লে মেয়ে, ভাবনা অধিক॥
কথায় কথায় লোকে, দেয় শত ধিক।
শত্রু বলে আই আই, আইবড় মেয়ে।
ঘরে রেখে ভাত খায়, কুল লজ্জা খেয়ে॥
মেয়ে দান দিলে পরে, সুকুলীন বরে।
গোষ্ঠী শুদ্ধ হেঁটে হেঁটে, ভিঁটে নীল করে॥

না জানে কেমন মেয়ে, শ্বশুরের বাস।
বার মাস বাপ মার, যেন গল-পাশ॥
কদাচিত চিত হস্ত, বিপরীত নাই।
ইহা দাও উহা দাও, বলেন জামাই॥
পোঁড়া-মুখ কুলীনের, গুণ-কব কত।
টাকা যদি নাহি পান, নিজ মনোমত॥
কন্যার সহিত তবে, না ক'রে আলাপ।
ধর্ম্ম কর্ম্ম ভ্রষ্ট করে, এই মহাপাপ॥
বারেন্দ্রীয় কুলীনের, কুল চমৎকার।
কুশ-কন্ধে কুল রেখে, কুলাচার তাঁর॥
করণে বরণ করি, কুশের জামাই।
ডুবান মেয়ের কুল, কুল বাঁচে তাই॥
কাটিয়া কুশের কুশ, জলে দেন পাত্র।
তত্ত্ব ক'রে লন পরে, মনো মত পাত্র॥
বয়সানুসারে কেহ, দর বৃদ্ধি করে।
ধন লোভে কন্যা ধন, দেন অন্য বরে।
কুল দোষে কন্যা হেতু, সকলেই জ্বলে।
কন্যা-বেচা লোকে সুখী নিজ বাহুবলে॥
শাস্ত্রে যদি মানা যায়, কন্যা-বেচা মুচি।
এক ব্যবসায় করে, একরূপ শুচি॥
কুলীনের গুণ এই, বলিলাম সব।
এই কুলে কন্যা দিলে, অধিক গৌরব॥
দিতে কিছু ত্রুটি হ'লে, রাগেন জামাই।
গু-খেকোর মেয়ে বলে, বেহান বেহাই॥
মেয়ের জ্বালায় যেবা, জ্বলে সর্ব্বক্ষণ।
সে জন জেনেছে মনে, যাতনা কেমন॥
আবার মেয়ের রীত, বিপরীত হয়।
আনিতে বিলম্ব হ'লে, কত কথা কয়॥
কষ্টে সৃষ্টে মেয়ে যদি, কভু আনা যায়।
বাড়ী যাব বাড়ী যাব, কথায় কথায়॥

আমার সংসার বয়ে, গেল নানা কাজে।
পরের বাড়ীতে থাকা, আমার কি সাজে॥
প্রসব করিয়া মাতা, হইলেন পর।
আপন হইল তাঁর, শ্বশুরের ঘর॥
নারীর জনম ধিক, ধিক্ শত বার।
এত বলি গিরিরাণী, কাঁদেন আবার॥
নবমীর শশী অস্তে, করিছে গমন্।
প্রভাত হইল নিশি, ভাবিয়া তখন॥
জয়া ডাকে উচ্চ রবে, উঠ গো জননী।
দূরদেশে যেতে হবে, প্রভাত রজনী॥

রাগিণী অহং, তাল একতালা।

একবার, জাগ মা, কুলকুণ্ডলিনী,
শম্ভু-হৃদয়-বাসিনী।
আমি ডাকি অবিরত, মা রলি নিদ্রিত,
শঙ্কর সহিত, শঙ্কর-মোহিনী॥
দেখ, তারা সনে শশী, অস্তে গেল নিশি,
পোহাইল তারা ত্রিনয়নী।
পূজার সময় হ'ল, শিব মন্মোহিনী, উঠ শিবে!
শিবপূজা কর শিবসামন্তিনী।
মাগো, রতন পালঙ্গে, তুমি শম্ভু সঙ্গে,
নিদ্রিত না শুন হরির রাণী।
কিসে চেতন পাব মা; মায়া নিদ্রাতে সদা অচৈতন্য;
তুমি চৈতন্য না হ'লে চৈতন্যরূপিণী॥

জয়াকে সখেদ গিরিরাণীর নিবারণ।

জয়ার আহ্বান বাণী, শুনিয়া গিরীশ-রাণী,
জয়া-প্রতি বলেন বচন।

যাবে বলে ঝুরে তারা, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তারা,
এখনি যে করেছে শয়ন॥
করিলে তার নিদ্রাভঙ্গ, অলস হইবে অঙ্গ,
পথে নাহি চলিতে পারিবে।
জয়া তোর করে ধরি, সে জন্য নিষেধ করি,
নিশি অন্তে আপনি উঠিবে।
এখন রজনী আছে, নিশাপতি তারা সাজে,
সাজে দেখ কিবা চমৎকার।
অচঞ্চল যত শাখী, নীরব রয়েছে পাখী,
চক্রবাক করিছে চীৎকার॥

নিশি যদি পোহাইত, দীপশিখা, হইত লোহিত।
পবন বাহিত মৃদু, পাখীসব, গাইত ললিত॥
নিশি যদি পোহাইত, ঝিল্লীরব, না থাকিত আর।
চক্রবাকী না করিত, ক্ষণে ক্ষণে, বিরহ চীৎকার॥
নিশি যদি পোহাইত, দিবাভীরু, নিশাচরগণ।
তবে কেন ইতস্ততঃ, ভয়হীন, করিবে ভ্রমণ।
নিশি যদি পোহাইত, আলোকিত, তারক মণ্ডল।
শশীর সহিত তবে, এতক্ষণ যেত অস্তাচল॥
নিশি যদি পোহাইত, পূর্ব্বদিক, হইত রক্তঘোটা।
সিঁথায় পরিত সাধে, নব ভানু, সিঁদুরের ফোঁটা॥
নিশি যদি পোহাইত, সরোবরে, ফুটিত কমল।
মধুলোভে বেড়াইত, মধুপ্রিয়, ভ্রমর সকল॥
নিশি যদি পোহাইত, তবে জয়ে, শশী-সোহাগিনী।
কুমুদিনী থাকিত কি, হাস্য মুখে, মৃণাল-বাসিনী।
নিশি যদি পোহাইত, এতক্ষণ, লইয়া গোপাল।
হই রবে গোষ্ঠে যেত, নগরের, কৃষক-রাখাল॥
নিশি যদি পোহাইত, ঘরে ঘরে নগরের লোক।
চেতন হইত পেয়ে, নবোদয়, ভানুর আলোক॥

নিশি যদি পোহাইত, মঞ্চোপরি, রাজবন্দীগণ।
বিভাস, ভৈরব, টড়ি, আলাপিয়া, গাইত এখন॥
তাই তোরে বলি জয়া, চেয়ে দেখ, রয়েছে যামিনী॥
জাগাওনা নিদ্রাগত, আছে মম, প্রাণের ঈশানী।

রাগিণী ললিত, তাল আড়াঠেকা।

জাগাও না হরজায়ায়, জয়া, তোমায় বিনয় করি।
যাবে বলে সারা নিশি, কাঁদিয়া পোহাল গৌরী॥
নিশি জেগে কাতর হয়ে, আছেন উমা ঘুমাইয়ে,
বিষাদে ও বিধুবদন, মলিন হয়েছে, মরি॥
নিদ্রা ভঙ্গ হ'লে পরে, হিমালয় আঁধার করে,
উমাশশী কৈলাসপুরে, যাবে পরিহরি।
নিতে এসেছেন হর, তাই বলি বিলম্ব কর,
যতক্ষণ ঘুমায়ে থাকে, ও বিধুবদন হেরি॥

গিরিরাণীকে তত্ত্ব কথায় জায়ার প্রবোধ।

'জয়া বলে বাণী, শুন গিরি রাণী,
উমা কি তব নন্দিনী।
এই বেদ মর্ম্ম, নিরাকার ব্রহ্ম,
সাকারে ব্রহ্মরূপিণী॥
তোমার উমার, আকার প্রকার,
নাহি জানে যোগিজন।
কহেন পণ্ডিত, ত্রিগুণ অতীত,
এই বেদের বচন॥
দানব মানব, দেবতা বাসব,
সৃজন পালন লয়।
জীব জন্তু দিশা, ষট্ কাল নিশা,
সব তাঁহা হ'তে হয়॥

কে জানে দুর্গার, স্বরূপ আকার,
নিরাকার কি সাকার।
এই জ্ঞান সত্য, তিনি সার তত্ত্ব,
অনন্ত জগদাধার॥
দেখ যত তনু, হস্তী কীট অণু,
অচল সচল চয়।
চন্দ্র তারা ভানু, সব পরমাণু,
যোগে মাত্র ক্রিয়া হয়,
তিনি সৃষ্টি মূল, তিনি সূক্ষ্ম স্থূল,
অবস্থিতি সর্ব্ব ঘটে।
অনাদি অহেতু, মহামায়া হেতু,
রাণী তব ভ্রম ঘটে॥
উমা সর্ব্বভূতে, চেতনা স্বরূপে,
বিষ্ণুমায়াতে শব্দিতা।
উমা, সর্ব্বভূতে, স্থিতা নিদ্রারূপে,
ক্ষুধা ত্রিলোক-বিদিতা॥
উমা, সর্ব্বভূতে, শিবশক্তি রূপে,
শ্রদ্ধা বৃত্তি রূপে স্থিতা।
উমা, সর্ব্বভূতে, শান্তি কৃতি রূপে,
ভক্তি রূপে অধিষ্ঠিতা॥
উমা, সর্ব্বভূতে, লজ্জা ধৈর্য্য রূপে,
লক্ষ্মী মাতৃ রূপা কান্তি।
উমা সর্ব্বভূতে, তৃষ্ণা ভদ্রারূপে,
স্মৃতি, চিতি রূপা ভ্রান্তি॥

রাগিণী সুরট, তাল একতালা।

উমা নহে তোমার নন্দিনী।
ভবতারিণী, ভবমোহিনী; তারা ত্রিতাপহারিণী,
দুঃখ নিবারিণী, ব্রহ্মস্বরূপিণী॥

বেদের মর্ম্ম এই শুনগো জননী, নিরাকার ব্রহ্ম ভাবে তত্ত্বজ্ঞানী,
সাকারেতে আবার ব্রহ্মসনাতনী, ত্রিজগতবন্দিনী ॥
অসম্ভব সব তাঁহাতে সম্ভব, মায়াতে উদ্ভব, বিধি বিষ্ণু ভব,
শক্তিরূপে আদ্যশক্তি মেয়ে তব, জগত-প্রসবকারিণী ॥
তিনি মহামায়া দেবের আরাধ্য,
মায়াতে আছে জগত আবদ্ধ,
কাটে মায়াপাশ কার এমন সাধ্য, শুনগো জননী ॥

ভগবতী ও মেনকার বিলাপ

মায়ের অঞ্চল ধরি, চঞ্চল নয়ন।
চঞ্চলা-বরণী তারা, করেন ক্রন্দন ॥
ভাবি কথা ভাবি মনে, মলিন বদন।
মেঘরাশি করে যেন, শশী আবরণ ॥
ভাসিল তারার দুটি, নয়নের তারা ॥
অবিশ্রান্তে বর্ষে যেন, জলদের ধারা ॥
হুতাসে নিশ্বাস যেন, বাতাস প্রবল।
বিশদ শরদে হয়, বর্ষা অবিকল ॥
যেতে হবে এই ভাব, হইতেছে মনে।
চমক বিদ্যুৎ বজ্র, ক্রন্দনের সনে ॥
মনের উদ্যানে ছিল, ইচ্ছা-লতা যত।
কতক পুড়িল, ছিন্ন-মূল হল কত ॥
যাঁহার মায়ায় মুগ্ধ, প্রসার সংসার।
মায়ের মায়ায় প্রাণ, আকুল তাঁহার ॥
মমতায় দুহিতায়, কোলে করে রাণী।
বিদরিয়া যায় বুক, দেখে মুখখানি ॥
ভূধর-রমণী কোলে, শ্রীধর-বন্দিনী।
একত্র মিলিত হয়, শশী সৌদামিনী,
কন্যারে প্রবোধ দিয়া, বলেন পাষাণী।
ধৈর্য্য ধর গঙ্গাধর-মোহিনী ঈশানী ॥

তিন দিন তরে তোরে এনে হিমালয়।
হিমালয় হ'ল শোক-অনল আলয় ॥
ধারায় ধারায় তারা, তারাকারা ধারা।
সারা নিশি কেঁদে উমা, প্রাণে হলি সারা ॥
ক্ষান্ত দে মা ক্ষান্তিরূপা এস কোলে করি।
বৎসরের মত মাকে, মা বল শঙ্করি ॥

রাগিণী বিভাস ঝিঝিট জং, তাম ঝাপতাল।

এস কোলে করি উমা, বল মা বিধুবদনে।
তোমার মারে মা বলে মা, কে আছে তোমা বিনে ॥
দুঃখিনী জননী বধে, ঈশানী যাবে কেমনে।
তুমি আমার নয়নতারা, তোরে বিদায় দিয়া তারা,
তারাহারা নয়নে রব কেমনে ভবনে ॥
ওমা তিন দিনের তরে আসিয়া, নিবাণ আগুণ জেলে দিয়া,
নিদয় হ'য়ে বিদায় দিতে বল গো কি কারণে।
প্রাণান্তে নয়নপ্রান্তে, যেতে দিব না তোমাধনে,
সাগর সিঞ্চন নিধি, ভাগ্যেতে মিলান বিধি,
নিজ দোষে হারাই যদি, পাব না জীবনে।

যোগেশ্বরীর যোগ পরিচয়।

দেখে মার মহা মায়া, চিন্তা করি মহামায়া,
যোগমায়া দেন পরিচয়।
দেখি মা গো কি বিকার, কে তোমার তুমি কার,
কে নন্দন কেবা কন্যা হয় ॥
যে দেখ মা রথ বাজী, সকলিত ভোজবাজী,
কর্ম্ম-সূত্রে বদ্ধ জীবগণ।
যে যেমন করে কর্ম্ম, রাখে নিজ নিজ ধর্ম্ম,
সেইরূপ ফলবিণরত ॥

এ সংসার নাট্য ঘর, দেবতা দানব নর,
বহুরূপ করিছে ধারণ।
সময়েতে নাহি রবে, প্রস্থান করিতে হবে
অদ্য কিম্বা কল্য নিরূপণ।
তথাচ বিষয়ে মত্ত, হারাইয়া জ্ঞান তত্ত্ব,
অনুমত্ত মর্ত্তবাসীগণ॥
জীবগণ মোহপাশে, বদ্ধ হয়ে ধর্ম্ম নাশে,
মায়াবশে সদা মুগ্ধ রয়।
কি বলিব চমৎকার, গুটিপোকা যে প্রকার,
নিজ সূত্রে নিজে বদ্ধ হয়॥
সম্মুখে বিবাদ কাল, পাতিয়াছে মৃত্যু জাল,
মোহ বন্ধ শীঘ্র কর ছেদ।
জ্ঞান তত্ত্ব করি সার, চিন্তা কর সারাৎসার,
মুক্তি পাবে পরিহর খেদ॥

রাগিণী অহং, তাল একতালা॥

কাঁদ কার তরে আর কে তোমার নন্দিনী।
আপন বল যারে, কোথায় রবে তারা জীবনঅন্ত হলে,
এ মহীতে সকল মহামায়ার মোহিনী॥
সংসার নাট্য নিকেতন, নট জীবগণ, মুগ্ধ মহামায়ার মায়াগুণে।
নানা কর্ম্ম বেশে, বিষয় বিষম তালে নাচে সর্ব্বক্ষণ,
তারা কার্য্য অন্তে গমন, করিবে আপনি॥
আমার দারা পুত্র ধন, আমার পরিজন, বলে কেবল মহামায়ার কারণ
কারে পুত্র বল, তারা রবে কোথা জীবন অন্ত হলে,
বল কেবা কার পিতা, কেবা কার জননী॥

মেনকার সহজ জ্ঞান।

করি প্রাণ মনোযোগ, মেনকা শুনিয়া যোগ,
যোগেশ্বরী উমা প্রতি কন।
যোগাসনে যোগিগণ, ক'রে যোগ আরাধন,
অন্তকালে মুক্তির কারণ॥
কিবা কাজ মমতায়, আমি তব মমতায়,
বদ্ধ হ'য়ে রয়েছি শঙ্করী।
ডাকে যত প্রতিবাসী, উমার মা ভালবাসি,
শুন্তে তাই দিবস শর্ব্বরী॥
তোরে কোলে করি তারা, ভাবি আমি ধ্রুবতারা—
লোকে বাস করিতেছি সুখে।
চন্দ্রলোকে কেন যাব, কোটি চন্দ্র হাতে পাব,
মা বল মা, তুমি চন্দ্রমুখে॥
মুক্তি ইচ্ছা করে যারা, যুক্তি নাহি মানে তারা,
মুক্তি পদে কি বা সুখ বল?
ভক্তিযোগে দিয়া যোগ, শুকদেব সুখভোগ,
করে মনে আনন্দ বিমল॥
করি যোগ আরাধন, আমি যে যোগের ধন,
যোগেশ্বরী পেয়েছি তোমারে।
মুক্তি আশা করে ভক্তি, হারাইলে শিবশক্তি,
তুমি কি মা বলিতে আমারে॥
করিয়া কত সাধনা, পেয়েছি তাই সাধ না,
তোরে রাখি নয়ন প্রান্তরে।
যোগতত্ত্বে ভুলাইয়া, বোকা পেয়ে ধোকা দিয়া,
যাবে কি মা, ভেবেছ অন্তরে॥

রাগিণী বিভাস, তাল একতালা।

আরে অবোধ মেয়ে, মিছে প্রবোধিয়ে,
মায়েরে ভুলায়ে, যাবে কি উমা।

অনেক যোগসাধন, ক'রে যোগাসন,
যোগে পেলেম তোরে, যোগেশ্বরী মা ॥
যোগে সাধে যোগী, মনে মুনিগণ, সে সব কথায় আমার কিবা প্রয়োজন,
আমি জানি উমা মেয়ে, আমি মা, উমা মাগো ;
এমন সহজ তত্ত্বে যোগতত্ত্ব কাজ কি মা ॥
মোক্ষদা নাম ধর জীব মুক্তি দানে, মুক্তি পেলে আমি সুখী নহি প্রাণে,
সুখে থাক্‌লে তুমি, দুঃখে তরি আমি, দুর্গে মাগো!
মেয়ের সুখে সুখী আর দুঃখে দুঃখী মা ॥

গিরিরাণীর অনন্তরূপ দর্শন ও মূর্চ্ছা প্রাপ্তি

মায়ের অন্তর হতে, মহামায়া হরি!
মায়া করি লইলেন, মহা মায়া হরি ॥
ভ্রম জ্ঞান গেল তাঁর, অন্তরে অন্তরে।
উমাকে দেখেন রাণী, অন্তরে অন্তরে ॥
কখন ভাবেন উমা, গঙ্গা-নীরাকার।
কখন ভাবেন তিনি, ব্রহ্ম নিরাকার ॥
কখন দেখেন আছে, উমা ধরা ধ'রে।
কখন দেখেন রাণী, উমা ধরাধরে ॥
কখন দেখেন তিনি, দিবাকর করে।
কখম দেখেন তাঁর, দিবাকর করে ॥
কখন দেখেন উমা, আঁখিতারা মাঝে।
কখন দেখেন তারা, আছে তারামাঝে॥
আবার দেখেন রাণী, অনন্ত উপরে।
মহাবিষ্ণু রূপে উমা, অনন্ত উপরে ॥
যে দিকে ফিরান রাণী, নয়নের তারা।
সে দিকে দেখেন তারা, নয়নের তারা ॥
তখন জয়াকে ডেকে, বলেন ত্বরায়।
এই গুণে বুঝি উমা, পাতকী তরায় ॥
বলিতে বলিতে ভয়ে, বলে ধর্ আয়।
মুর্চ্ছিতা হইয়া রাণী, পড়েন ধরায় ॥

লোকে ভাবে শোকে রাণী, আছে ধরা ধরি।
চেতনা করিয়া তোলে, করি ধরাধরি॥
মায়ারূপ পরিহরি, হরি মহামায়া।
জননী রে বলিছেন, হরি মহা মায়া॥
কৈলাসে যাইব আমি; এবার ত্বরিতে।
তাহাতেই বলি দে মা, বিদায় ত্বরিতে॥
শুনিয়া গিরীশ-রাণী, ভাসি চক্ষু-নীরে।
ডাকিয়া বলেন যত, পুরবাসিনীরে॥

রাগিণী ললিতবিভাস, তাল একতালা।

আমার উমা যায় কৈলাস, হিমালয় করি-শূন্য।
নয়নতারা হলেম হারা, নয়নতারা তারা ভিন্ন॥
জয়া দেগো মুক্তকেশীর কেশ ক'রে পরিচ্ছন্ন।
পুরবাসী দে গো আসি, মায়ের সিঁথায় সিঁদুর চিহ্ন॥
তিন দিন না গত হ'তে, হর এসেছেন নিতে,
উমা ধনে বিদায় দিতে, হৃদয় হয় বিদীর্ণ;
দিনে আঁধার হলো আমার, স্বর্ণপুরী হেরি শূন্য।
হরি বলে মা আমার, দে গো বিদায় যাব তূর্ণ॥

তিনটি দীন দ্বিজের প্রার্থনা।

পরিহরি হিমাচলে, কৈলাস অচলে চলে,
অচল-রাজনন্দিনী তারা।
শাক্ত তিন দ্বিজ দীন, বহুদিন পরে দিন
পেয়ে ডাকে দুর্গা বলে তারা॥
যাত্রা কর দেখে দিন, এ দিকে যে ডাকে দীন,
দীন রেখে অদিনে কি যাবে?
দীন-দয়াময়ী তবে, দীনতারা নামে ভবে,
একেবারে কলঙ্ক রটাবে॥

আসিয়াছ তিন দিন, তাই শুনে তিন দীন,
তিন দিন পথেতে হাঁটিছে।
তাদের ত বাকী নাই, দিনমণি-সুতে তাই,
ফাকি দিতে তোমারে ডাকিছে ॥
যদি বল শেষ দিনে, ডাকিলেও আমি দীনে,
দি' নে ফাকি, দয়া ক'রে থাকি।
যদি মা অজ্ঞানে থাকি, তবেই ত দিলে ফাকি,
মা বলে মা, তাই আগে ডাকি ॥

রাগিণী ভৈরবী, তাল একতালা।

আগে নিবেদন করে রাখি।
অকৃতি সন্তানে, স্থান দিও চরণে,
অন্তে তারা আমায় দিওনা ফাঁকি ॥
দিনে দিনে যত গত হচ্ছে দিন,
নিকটে আসিছে শেষের সে দিন;
দিনমণি-সুত বাঁধিবে কোন্ দিন,
এ দীনের ক' দিন আছে মা বাকি ॥
রাসনা সময়ে ডাকিব তোমাকে,
কি জানি রসনা বশ না থাকে;
অন্তিমকালে তারা ভুল না আমাকে,
অজ্ঞানে সজ্ঞানে যে ভাবে থাকি ॥

সমাপ্ত।

অক্রূর সংবাদ।

নান্দী।

রাগিণী সুরট, তাল ঝাঁপতাল।

মন ভজ রে নিত্য নিত্য, সত্য সনাতন নিত্য,
সত্য বিনে শান্তি নাই আর, জেন এই সত্য সত্য।
সত্যসেবায় আত্মশুদ্ধি, দূরে পলায় ভ্রমবুদ্ধি,
সত্যতত্ত্বে জ্ঞানবৃদ্ধি সুপ্রকাশ্য আত্মতত্ত্ব॥
লইলে সত্যের শরণ, অহঙ্কার না থাকে কখন,
দ্বেষ হিংসা কাম ক্রোধ দূরে করে পলায়ন।
সত্যকে রাখিলে হৃদে, ডোবেনা জীব পাপহ্রদে,
সত্য কলুষ সংহারে, প্রকাশে বিভু মাহাত্ম্য॥
সত্য ভিন্ন ধর্ম্মকর্ম্ম, ধর্ম্ম নয় সে ধর্ম্ম মর্ম্ম—
ভেদ করা কলুষ অস্ত্রে, মনে জেন নিশ্চয়।
শুন ওরে ভ্রান্ত মন, সত্য পথে কর ভ্রমণ,
ষড়রিপু হবে দমন, পাবে পরম পদার্থ॥

(সূত্রধারের প্রবেশ।)

সূত্রধার। (স্থির নয়নে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) সভার কি আশ্চর্য্য শোভা হয়েছে। আমি সভাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, গুরুজন এবং নানাশাস্ত্রদর্শী গুণিগণের চরণারবিন্দে প্রণিপাত করে নিবেদন করি; হংস যেমন জল পরিত্যাগ ক'রে ক্ষীর গ্রহণ করে, পণ্ডিত এবং গুণিগণও তদ্রূপ আমাদিগের দোষ মার্জ্জনা করে গুণ গ্রহণ করুন। (স্বগত) সামান্য সজ্জায় এ সভার সন্তোষ সাধন করা দুঃসাধ্য। একবার প্রেয়সীকে ডাকি, শুনি তিনি কি বলেন। (উচ্চৈঃস্বরে) প্রিয়ে! প্রিয়ে!

একবার এদিকে আস্তে হবে। (কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া) কৈ ধনি! এলে না? ধনী হলেই কি গৌরব বাড়ে?

(নেপথ্যে) এই যে আমি।

(গান করিতে করিতে নটির প্রবেশ।)

রাগিণী কালেংড়া, তাল একতালা।

ধনী বলে কর ধ্বনি, কেন নট গুণময়।
রসময় হলে কিহে, নাই সময় অসময়॥
তব ধ্বনি বংশীধ্বনি, রমণীকুলহরিণী, হায়,
ধ্বনি শুনে উন্মাদিনী, কেমনে ভবনে রয়॥
মলয় চন্দন ব'লে, স'পেছি প্রাণ করতলে, হায়,
অধীনীর ভাগ্যফলে, হলে কি গরলময়॥

সূত্রধার। তুমি কি ঘুমায়ে ছিলে, না বিলম্বের আর কোন কারণ ছিল?

নটী। কারণ আর কি, আমি ঘরের কাজকর্ম্ম শেষ করে, একটু আরাম করতে ইচ্ছে কব্‌লাম, আর আপনি ডাক্‌লেন। (সস্মিতে) আবার কি কাজ কর্‌তে হবে, তা বলুন।

সূত্র। না, এমন কিছু নয়, তবে সভ্যগণ তোমায় একটী গান কর্‌তে বল্‌ছেন।

নটী। সে কি, আমি মেয়ে মানুষ হয়ে সভার মাঝে কেমন করে গাইব?

সূত্র। তাতে লজ্জা কি, তুমি ত আর কুৎসিত গান করবে না। বিশেষ আমি তোমার সঙ্গে।

নটী। আর সকলকে পারা যায়, গান-পাগ্‌লাকে পারা যায় না। আপনার অনুরোধ, গাইতে হ'ল।

রাগিণী পরজ ভৈরবী, তাল যৎ।

বিনিগুণ পরখিয়ে তোমায়।
প্রাণ স'পিয়ে আমার এখন প্রাণ যায়॥
রমণী সরল মীন, পরাধীন চিরদিন,
পুরুষ পরশ আশে; (ওহে)
প্রণয় বড়শি গ্রাসি, কলঙ্কনীরে উঠে ভাসি,
পুরুষে যে কত খেলা খেলায়।

অধীনী রমণী মীন, বল কোথায় কোন্ দিন,
পুরুষ অবলায়, দয়া করে ; (ওহে)
প্রণয় বড়শি খুলে, রেখে যায় হে দূরে ফেলে,
মরে নারী বিরহ বেদনায় ॥

সূত্র। এ গানটী তোমার মনোমত।

নটী। কেবল আমার কেন, অনেক মনোমোহিনীর মনোমত।

সূত্র। সে যাহা হউক, এখন একটী গীতাভিনয় দ্বারা সভ্যগণকে সন্তুষ্ট করা কর্ত্তব্য।

নটী। এই সব মহামতি সভ্যদিগকে সন্তুষ্ট করি, আমার এমন গুণ কি আছে ?

সূত্র। লোকে বলে পদ্ম-মধু উত্তম, কিন্তু পদ্মিনী তা বলে না।

নটী। পদ্মে মধু আছে বটে, সূর্য্যদেব না হলে সে কি তা দান কর্‌তে পারে ?

সূত্র। তবে কি মুখবন্ধ পাঠ কর্‌ব ?

নটী। কোন্ বিষয়ে ?

সূত্র। তাই ত চিন্তা কর্‌ছি। (কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া) গ্রামমণ্ডলীতে আজকাল শ্রীমদ্ভাগবতের বড় সমাদর। বৈষ্ণব মাত্রেই তাহার প্রতি ভক্তিমান, অতএব মহারাজ কংসের ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান হ'তে, অক্রূরসংবাদ পর্য্যন্ত অভিনয় করা যাক্, তাতে অনেকের সন্তোষ সাধন হ'তে পারে।

নটী। উত্তম কল্পনা করেছেন ; বিলম্বে আর কাজ কি, চলুন বেশ বিন্যাস করা যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মথুরা রাজধানী।

বিশ্রামভবনে মহারাজ কংস, গুরু, পুরোহিত
ও বিদূষক আসীন।

পুরোহিত। মহারাজের শরীর ক্রমে শীর্ণ, বিবর্ণ হচ্ছে। দেখ্‌লে বোধ হয়, যেন চিন্তানল সর্ব্বক্ষণ আপনাকে দগ্ধ কর্‌ছে। কারণ কি?

কংস। ভগবন্! দুঃখের কারণ আর কি জিজ্ঞাসা করেন; দেবকীই আমার কাল হয়েছে। আমি যে অবধি দৈববাণী শুনেছি, সেই হ'তে চিন্তা জ্বরে জর্জ্জরিত হচ্ছি। চাণূরাদি প্রধান প্রধান যোদ্ধাদিগকে গোকুলে পাঠালেম, কেহ ফিরে এল না। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ)

পুরো। মহারাজ! আমি জানি সে সামান্য বিপদ নয়; কিন্তু বিবেচনা ক'রে দেখ্‌লে এতে আপনার অন্য চিন্তা অল্প।

কংস। শত্রু ক্রমে বলবান্ হচ্ছে, আমার অন্য চিন্তা অল্প; আপনি কি ভেবে বল্‌ছেন, বুঝ্‌তে পারিনে।

(প্রতিহারীর প্রবেশ।)

প্রতিহারী। (প্রণাম পূর্ব্বক) মহারাজ! বৃদ্ধ মহারাজ পুরুত ঠাকুর মহাশয়কে ডেকেছেন।

কংস। (পুরোহিতের প্রতি) ভগবন্! পিতা আপনাকে দর্শন করতে ইচ্ছা করেছেন।

পুরো। (গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) তবে আমি এক্ষণে আসি।

[পুরোহিতের প্রস্থান।

গুরু। মহারাজ! যিনি যা কেন না বলুন, আমি আপনাকে উচিত বল্‌ছি, আপনার দোষেই আপনার মৃত্যু ক্রমে নিকট হচ্ছে।

যত শত্রু ছিল বলী, ধরে এনে দিলে বলি,
তাই বলি এত অহঙ্কার।
বপুরাজ্যে রিপু ছয়, না করিলে পরাজয়,
সেই হেতু ঘটে অনাচার॥
মর্ম্মব্যথা দিয়া মর্ম্মে, তাড়াইয়া বেদধর্ম্মে,
অধর্ম্মেরে করিলে আহ্বান।
বেদধর্ম্ম অনুগত, ছিল তব রিপু যত,
স্থানান্তরে করিল প্রস্থান॥
মনে অহংকার ভরা, রিপুহীন হ'ল ধরা,
স্বেচ্ছাচার কর সমুদায়।
অবিনাশী অনুতাপ, দিবা নিশি দেয় তাপ,
তারে পরাজয় করা দায়॥
অনুতাপে তনু জ্বলে, শান্তি নাই কোন স্থলে,
ভবন কানন উপবনে।
অনিবার চিন্তাজ্বর, আত্মা দহে নিরন্তর,
কৃত পাপ যত পড়ে মনে॥
রাজা হয়ে ছন্নমতি, বিনা পাপে ভগ্নীপতি,
সুশীলা ভগিনী দেবকীরে।
বদ্ধ করি কারাগারে, কষ্ট দাও অনাহারে,
শোক দুঃখে ভাসে চক্ষুনীরে॥

রাগিণী ভৈরবী, তাল একতালা।

(বলি) সমুদয়, কার দোষ নয়, কর নিজ দোষে নীচ সঙ্গ।
দ্বেষ করে হরি ধ্বনি, বিষয় হরি ধ্বনি
করিলে, ওহে মজিলে, ডেকে আনিলে,
আপনি, আপন কাল ভুজঙ্গ॥
তব সহোদরা দেবকী সুশীলে, শিলে বেঁধে হৃদে, হৃদে শিলে দিলে,
নিদ্রিত ভুজঙ্গ জাগ্রত করিলে, অগ্নি বাসে বাঞ্ছা বাসে ঢেকে অঙ্গ॥
ধরাপতি যদি অবিচার করে, ধরা নাহি সেই পাপ-ভার ধরে,
কাঁপে থর থর ধরা, ধরাধরে, নগর ডুবায় হে সাগর-তরঙ্গ॥

কংস। (সক্রোধে) আমার যা ইচ্ছা আমি তাই করব। কারও উপদেশ শুন্‌তে চাইনে। বসুদেব দেবকীরে কারাগারে বদ্ধ করে অধর্ম্ম করে থাকি, আমি তার ফল ভোগ করব। অন্যের তাতে কি ?

গুরু। হিত বল্‌লে যে বিপরীত ভাবে, তার কখন কল্যাণ নাই। (ক্রোধ-পূর্ব্বক বেগে প্রস্থান)

কংস। কেমন সখে ! রাগ করে গেলেন, তাতে আমার বড় ক্ষতি। উনি যে কথা বলেছেন, তা গুরু না হলে জান্তে পেতেন, আমি কেমন কংস। আজ কাল্ অনেক বেটাই পরের দোষ দেখিয়ে উপদেশ দিয়া থাকে, আপন দোষ দেখ্‌তে পায় না। (কিঞ্চিৎ মৌন থাকিয়া) যাক্ ও কথায় আর কাজ নাই। ভাল বয়স্য ! কুলদেব যে বল্‌লেন, "তোমার অন্ত চিন্তা অল্প" অনেক ক্ষণ ভাব্‌ছি, তার তাৎপর্য্য বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।

বিদূষক। মহারাজ বুঝ্‌তে পারেন নাই বটে, ব্রাহ্মণমাত্র শর্ম্মা সব বুঝেছেন ; প্রকৃত আর গুরু বেটার ভয়ে প্রকাশ করেন নাই। এখন আপদ শান্তি হল, ছুবেটা বুড়ো চ'লে গেছে, সব বল্‌ছি শুনুন। আপনকার প্রকৃত বল্‌ছিলেন কি, নন্দের বেটা সেই কালটা, কষ্ট দিয়া বধ করে না, যে ধরে সেই সারে, কাজেই আপনার অন্ত চিন্তা অল্প, কষ্ট পেয়ে মরতে হবে না।

কংস। দূর হ পাগল, এ রহস্যের সময় নয় ; কুলদেবের বাক্যের কোন তাৎপর্য্য আছে।

বিদূ। (মস্তক কণ্ডূয়ন, স্বগত) তা আছে বই কি, তুমি মলেই শ্রাদ্ধে কিছু পটে ; তাতে আমিও অসন্তুষ্ট নই, ফলারটা ভালই হবে। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে হ্যাঁ কুলদেব আপনকার হিতৈষী, অবশ্যই কোন মঙ্গলের কথা বলেছেন।

(নেপথ্যে বীণার শব্দ ও গান। আকাশে কর্ণ রাখিয়া কংস ও বিদূষকের শ্রবণ)

রাগিণী সুরট, তাল ঝাঁপতাল।

শোন্ রে বীণে ! বল্‌বিনে, কেবল হরিনাম বিনে,
ক্ষণকাল বিফলে বীণে ! হরি বিনে হরিবিনে ॥
যেতে ভবপার বীণে, পারবিনে পারবিনে,
সে সঙ্কটে হরিপদ তরি বিনে, তরিবিনে ॥
প্রতি তারে প্রীতি তাঁরে, কর বীণে নিশিদিনে,
তারে তারে তারে তারে তাঁরে ডাক রে বীণে ॥

অপার ভব দুস্তারে, কে তারে আর তাঁরে বিনে,
বীণে রাধারমণ বিনে কুপথে মন দিবিনে ॥
যাগ বিনে জাগবিনে সংসার যাত্রায়, রাগ বিনে রাগবিনে অন্যেরই কথায়,
যোগে কেবল জাগে যোগী, জাগে না যে ভোগীরোগী,
জেনে শুনে বৃথাভোগী, ভাবি ভাবনা ভাবিনে ॥

কংস। বয়স্য! বীণাযন্ত্র বাজিয়ে গান করতে করতে কে আস্‌ছে?

বিদূষক। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক) আর কে মহারাজ! ঢেঁকিবল্লভ।

কংস। ঢেঁকিবল্লভ কে?

বিদূ। আজ্ঞে ঐ কুলোবল্লভের ভাই, ব্রহ্মার পুত্র নারদে মুনি আস্‌ছেন।

দেবঋষির প্রবেশ ও কংসকে আশীর্ব্বাদ।

(গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দেবঋষিকে কংস ও বিদূষকের প্রণাম,
সম্ভাষণ, এবং সকলের উপবেশন।)

কংস। আমার অদ্য সুপ্রভাত, ঋষিরাজের শ্রীচরণ দর্শন পেলেম।

বিদূষক। (স্বগত) তোমার সুপ্রভাত বই কি, আর অপেক্ষা নাই, শীঘ্রই যমালয়ে যেতে হবে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! ঋষিরাজের দর্শনে আমি চরিতার্থ হলেম।

নারদ। মহারাজের অন্তঃকরণে যেন কোন দুর্নিবার চিন্তা হয়েছে? তাইতে শরীর জীর্ণ শীর্ণ দেখা যাচ্ছে।

কংস। ভগবন্! আপনি যথার্থ অনুভব করেছেন। দেবকী আমার কাল হয়েছে। দৈববাণী হলো "দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান আমার প্রাণের বৈরী হবে," এই কথার উপর নির্ভর করে, দয়াধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে, দেবকীর সাতটী পুত্র, একটী কন্যা নষ্ট করলাম; এখন শুন্তে পাচ্ছি আমার জীবনহন্তা গোকুলে জন্মেছে। দেবতারা মিথ্যাবাদী এ আগে জানিনে।

নারদ। (ঈষদ্ধাস্যে) দেবতারা মিথ্যাবাদী নহেন, বুঝ্‌বার ভুল। আপনার শত্রু দেবকীর গর্ভে জন্মে ছিল, বসুদেব তাকে গোপনে নন্দালয়ে রেখে এসেছেন।

কংস। কি! তা ত আমি কিছুই জান্তে পারি নাই; জান্‌লে কি গোপবংশ রক্ষা পেত? কোন্ দিন যমালয়ে দিতেম।

বিদূ। (স্বগত) তাতে বা ত্রুটি কি হয়েছে, উড়তে না পেরে এখন গোল

মেনেছেন, চাণূরাদি কত বীরকে পাঠালেন, কিছু কর্‌তে পার্‌লেন না। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! তা ত আমিও জানিনে, জান্‌লে (করশব্দ পূর্ব্বক) এক চড়ে গোকুল রসাতলে দিতেম।

নারদ! মহারাজ! নন্দ ঘোষের পুত্র ব'লে আপনি যাকে সামান্য মনে করেছেন, সে সামান্য নয়।

কংস। আপনি আমার পরম হিতৈষী, তাই সকল গূঢ় বৃত্তান্ত প্রকাশ ক'রে সন্দেহ দূর কর্‌লেন, এখন উপায়?

নারদ। (বিদূষকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া) বিস্তর উপায় আছে, গোপন হলে ভাল হয়।

কংস। তা সত্য, চারিদিকে আমার বিস্তর শক্র।

[দেবঋষি ও কংসের প্রস্থান।

বিদূ। (মুখভঙ্গি পূর্ব্বক, স্বগত) উঁ হুঁ হুঁ, আমি ব্যাটা পর, আর নারুদে মুনি আপন হ ল। গোপনে পরামর্শ কর্‌তে চল্লেন। নালা কেটে জল আনা, আর সাপের গর্ত্তে হাত দেওয়া, কেমন মজা, এর পর টের প্যাবেন। রাজার ঘাড়ে দুষ্টা স্বরস্বতী চেপেছেন, আর রক্ষা নাই। (চারি দিকে দৃষ্টিপূর্ব্বক) এখানে কেউ নেই, একবার রাজসিংহাসনে বসে দেখি কেমন দেখা যায়। (সিংহাসনে উপবেশন) বাঃ, আমি বেশ দেখা যাচ্ছি। ঠিক রাজার মত। এখন ব্রাহ্মণী শর্ম্মা কাছে থাক্‌লে ত শোভা পেত। (উচ্চস্বরে) হেথা কেউ আছিস্ রে—বাতাস দে। (নেপথ্যে পদশব্দ) ও বাবা! না বল্‌তেই ফল্‌লো। কে যেন আস্‌ছে, বুঝি দেখ্‌তে পেয়েছে। মান থাক্‌তে নেমে বসি (অন্য আসনে উপবেশন।)

(ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। মহারাজ কি বাতাস কর্‌তে ডেকেছেন?

বিদূ। বাঃ—আমি কি রাজার সিংহাসনে বসেছি?

[সভয়ে বেগে প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

নেপথ্যে গান।

রাগিণী লুম ঝিঁঝিট, তাল একতালা।

(সে কি) সামান্য বালক, হরি গোলক-পালক।
নন্দ যে বালকের প্রতিপালক, প্রতি পলকে তাঁর কত সৃজন প্রলয়।
ধ্রুব নাহি যাঁর পায় ধ্রুবলোক,
বালকরূপে গোকুলে গোপালক, সেই গোপালক।
গোলক পরিহরি, হরি, (মহারাজ) গোলোকবিহারী,
বালক রূপে হলেন, গোকুলে উদয়॥
ব্রহ্ম ভাবে যাঁরে ভাবে ব্রহ্মলোকে,
ভক্তিভাবে করে কত সেবা লোকে, সে বালকে ;
হরি বলে সে বালকে, (মহারাজ) ভাবে যে বা লোকে,
পরলোকে সে ত গোলোকবাসী হয়।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অক্রুর মুনির ভবন।

নির্জ্জন তুলসী বনে অক্রুর মুনি।

অক্রুর। (তুলসী তুলিতে তুলিতে)

জয় জনার্দ্দন, শ্রীনন্দনন্দন, কংসনিসূদন, ত্রিভুবনপালক হে।
জয় নিরঞ্জন, ভয়বিভঞ্জন, সৃজন কারণ, ভবভয়হারক হে।
জয় সনাতন, হরি নারায়ণ, ভুবনমোহন, জনগণতারক হে।
জয় পীতাম্বর, নীলকলেবর, বেণু চক্র ধর, বনমালাধারক হে।
জয় গিরিধারী, মুকুন্দ মুরারি, গোলোকবিহারী, বসুদেববালক হে।
জয় খগপতি-পৃষ্ঠ গজপতি, মদনমূরতি, ইন্দ্র চন্দ্র কারক হে।
জয় শ্রী বামন, লোহিত চরণ, মুরলী বদন, সুচন্দন ভালক হে।
জয় যজ্ঞেশ্বর, গোপীমনোহর, দেব প্রভাকর, জলধর চালক হে।
জয় শ্রীমাধব, কিশোর কেশব, অমর বান্ধব, ভৃগুপদ ধারক হে।
জয় রাধাকান্ত, সত্যগুণ শান্ত, অন্তমনোধ্বান্ত, জীবাভীষ্ট দায়ক হে॥

জয় ব্রজবাসী, জীবশিবভাষী, মোহরাশি নাশি, ব্রজবধূ নায়ক হে
জয় নরহরি, তুমি হর হরি, ভবতরতরি, কালবারি শায়ক হে ॥

নেপথ্যে। অক্‌কূরমণি! আব্ ঘরমে হেঁ, ইয়ানাঃ মহারাজ কংস্ বাহাদুর আব্ কো বোলায়ে হেঁ।

অক্রূর। (সচকিত) এ যে কংসদূত ডাক্‌ছে, আমি এখন কোথা যাই, আমি যে বৈষ্ণব তা ত মথুরায় কেউ জানে না; তবে কে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে?

নেপথ্যে। কাহে আব্ বাহের হুয়ে নেহি, ক্যা—অন্দরমে না যানেছে, নেক্‌লেঙ্গে নেহি?

অক্রূর। ঐ এল কোথায় দীনবন্ধো! ভক্তবৎসল! দয়াময় হরি নিজ দাসের প্রাণরক্ষা কর।

রাগিণী সুরট, তাল ঝাঁপতাল।

কোথা জনরঞ্জন, জন বিপদ-ভঞ্জন,
দুর্জ্জন ভয়ে রাখ, হে যদুনন্দন ॥
ভজিতে নির্জ্জনে তোমায়, দুর্জ্জনে ঘেরিল-আমায়,
বিপত্তে আজ যায় হে জীবন, জগজীব-জীবন ॥
কুজন ভয়ে নাহি পূজন আয়োজন,
মনে মনে সংকল্প মনে বিসর্জ্জন,
জনরবে কংসজন, করিছে আমায় তর্জ্জন,
অন্তর্যামী তুমি হরি, জান দাসের যে ভজন ॥

(দূতগণের প্রবেশ।)

দূত। ইয়া বেহুদা ব্রাগিন্! শাইদ ভাগ্‌তে হো? হিঁয়া আও।

অক্রূর। (কম্পিত কলেবরে) বাবা বাবা! দূত বাবা! এই যে বাবা আমি বাবা!

দূত। তুলুসী বনমে বৈঠ্‌কে, ক্যা কর্‌তে হো?

অক্রূর। বাবা! তুলসী বাবা! ক্ক—ক্ক না, না, বাবা। কা-কা-লী বাবা!

দূত। ক্ক-ক্ক-কা-কা, উয়ো সব্ রাখ দেও; বদন্ মে তুম্‌হারে কিস্‌কা দাগ হ্যায়।

অক্রূর। না, না, বাবা! মের না. আমি হরি-মন্দির দিই নাই।

দূত। তুম্‌হারা নাক্‌মে সাদা রঙ্গকে ক্যা লাগা হ্যায়। সাইদ্! তিলক কর্‌কে সাধু হুয়ে হো?

অক্রূর। (নাসিকার তিলক মুছিতে মুছিতে) কৈ? বাবা! আমিত কিছু জানিনে।

দূত। এস্‌ওয়াক্ত চলো, তুম্‌হারা বাপকো পাস্। তেরা সব্ বেহুদ্‌গী দুর কিয়ে যাগা।

অক্রূর। আচ্ছা বাবা! চল, যেখানে ল'য়ে যাবে সেইখানেই যাব।

[সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

নেপথ্যে সংগীত।

রাগিণী ভৈরবী, তাল একতালা।

(এই) নিবেদি হে অক্রূর মুনি।

বল্‌লেন নারদ মুনি, তুমি অক্রূর মুনি, মুনির শিরোমণি, বৈষ্ণব চূড়ামণি॥
আনিলে হে মুনি, নীলকান্ত মণি, পাইবে মুনি, নীলকান্ত মণি,
পরশে সে মণি, আমি হব মুনি, যেমন লৌহ স্বর্ণস্পর্শে স্পর্শমণি॥
ব্রজ রাজ্যে গমন করিলে আপনি, রাম কৃষ্ণ হেথা আসিবেন আপনি,
হরি বলে মণি, নন্দের নীলমণি, নৃপমণির পক্ষে সর্প শিরোমণি॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কংস কারাগার।

(বক্ষে শিলা, হস্ত পদ শৃঙ্খলে বদ্ধ, ধরা শয়নে বসুদেব, দেবকী।)

দ্বারে প্রধান দ্বারপাল।

১ম বন্দী। জমাদার ছাপ! আর মোরে মারবান্ না, মুই গরিব, কোথেকে মোশাযকে পেন্নামী দিই।

২য় বন্দী। আমাব বড় পিপাসা হয়েছে, বুক ফেটে গেল, একটুকু জল দাও, তোমার পায় ধরি।

৩য় বন্দী। দমফেটে মলেম, পাথরের ভার আর সইতে পারিনে, বুকের উপর হ'তে পাথব খানা একবার তোল্ না ভাই! নিশ্বাস ফেলি।

প্রধান দ্বারপাল। চোপ্ রহো। সো হোগা নেহি।

(দ্বারে অক্রূর মুনির প্রবেশ।)

অক্রূর। দ্বারি! আমি একবার বসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ করতে যাব।

দ্বারী। মহাবাজকো য্যায়সা হুকুম নেহি, কি উন্‌কে বেহুকুম, কিসিকো ফটক্‌মে যানে দেনা। উয়ো হোনেসে মেরে জান্‌পর নহবৎ আবেগা।

অক্রূব। আমি মহারাজের অনুমতিক্রমে, বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণকে আন্তে যাচ্ছি। বসুদেবকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে হবে। নতুবা কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

দ্বাবী। তব যাইয়ে, আউর দেরী কর্ না জরুর নেহি।

অক্রূর। (কাবাগারে প্রবেশ করিয়া বসুদেব দেবকীকে নিরীক্ষণ পুর্ব্বক, স্বগত) আহা! কি কষ্ট!! বসুদেব পরম ধার্ম্মিক রাজপুত্র, কখন ক্লেশের মুখ দেখেন নাই, যান বিনে গমন করেন নাই, শয্যা বিনে শয়ন করেন নাই, এখন মৃত্তিকায় স্পন্দহীন পড়ে আছেন, হস্তপদ শৃঙ্খলে বদ্ধ, বক্ষঃস্থলে পাষাণ চাপা, চক্ষে অবিরত ধারা বচ্ছে। দেবকী রাজনন্দিনী, কোমলাঙ্গী, অবলা, সরলা; নির্দয়

প্রহরীগণ বন্ধন করে, ওঁরও কোমল বক্ষে পাষাণ দিয়ে রেখেছে। দেখে যে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! আহা! ওঁদের চেতনা মাত্র নাই। আমি যে কারাগারে এয়েছি, তা জাস্তেও পারেন নি ডেকে চৈতন্য করি। (উচ্চস্বরে) মা দেবকি! মা দেবকি!

দেবকী। (চৈতন্য হইয়া,)

রাগিনী ললিত বিভাস, তাল একতালা।

তুই কি এলি আয়, একবার কোলে আয়, রে নীলকান্ত।
শোকাতুরা, সকাতরা, মারে ত্বরা কর শান্ত।
তোমার কারণ, যায় রে জীবন, নয়নজলে নয়নান্ত,
যাদব আমি তোর মা রে! মারে কংসদূত দুরন্ত।
হয়েছে রে দুরদৃষ্ট, পুত্র হয়ে তুই রে কৃষ্ণ,
দেখ্‌লিনে রে এক দৃষ্ট, কি কষ্ট অবিশ্রান্ত;
দেখ্ স্বচক্ষে, পাষাণ বক্ষে, শোক দুঃখে হল প্রাণান্ত।
সইতে নারি, প্রহারে প্রহরী বলবন্ত।

অক্রূর। (সাশ্রু, স্বগত) আহা! মা দেবকীর কি কষ্ট! আমাকে গোপাল মনে করে ক্রন্দন কর্‌ছেন। দুঃখ আর দেখা যায় না, পরিচয় দিতে হ'ল। (প্রকাশ্যে) মা! আমি অক্রূর মুনি, আপনার যাদব নই, রাম কৃষ্ণকে আন্‌তে বৃন্দাবনে যাচ্ছি; আপনকার কৃষ্ণ, আমার কাছে জিজ্ঞাসা করলে, আমি কি বল্‌ব মা! আমায় ব'লে দিন্।

দেবকী।—

রাগিনী বিভাস ঝিঝিট, তাল ঝাঁপতাল।

স্বচক্ষে দেখিলে সকল, অক্রূর তোমায় বলিব কি।
কৃষ্ণে ব'ল এই কথা, মরেছে তোর মা দেবকী॥
পাষাণ বুকে, মরি দুঃখে, যেন রে ঘোর পাতকী।
দামোদরে, ধরি উদরে, কপালে ছিল এত কি।
নয়ন জলে গেছে নয়ন, ভাগ্যেতে আর আছে কি॥
(আমি) হরি ব'লে কাঁদি যত, প্রহারে প্রহরী তত,
মরিরে প্রাণ ওষ্ঠাগত, প্রাণে এত সয় কি,
হস্ত পদে নিগূঢ় বন্ধন উঠিতে আর সাধ্য কি।
সিন্ধুমুনি বিনা যেমন, মরে অন্ধ অন্ধকী;
হরির তরে, তেমনি মরে (এই) বসুদেব আর দেবকী॥

অক্রূর। (সজল চক্ষে) মা! আর রোদন করো না, আমি যেরূপে পারি, রাম কৃষ্ণকে এনে দেব। এখন আমি যাই।

[অক্রূর মুনির প্রস্থান।

পটক্ষেপণ

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শ্রীবৃন্দাবন।

গোষ্ঠে কৃষ্ণ বলরাম।

কৃষ্ণ। (বলরামের প্রতি) দাদা! ছিদাম শুবলেরা গোবর্দ্ধনে গো-পাল চরাচ্ছে, তুমি সেথা যাবে না?

বলরাম। (তোতলা স্বরে) না ভাই! এস আমরা বংশীবটে বসি, তারা এখনি আস্‌বে।

উভয়ে বংশীবটচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান।

(অক্রূর মুনির প্রবেশ।)

অক্রূর। (চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্বগত) এই কি শ্রীবৃন্দাবন! আহা! দর্শন ক'রে আমার প্রাণ সার্থক হ'ল। নানাজাতি তরুগণ, কি আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করেছে। পুষ্পফলভারাবনত শাখা সকল, বায়ু-হিল্লোলে দুলিয়ে দুলিয়ে আগন্তুক পথিককে বৃন্দাবন দর্শন করতে যেন আহ্বান করছে। বৃক্ষবিহারি সুকণ্ঠ শুক শারিকা, কোকিল কোকিলা, সর্ব্বক্ষণ মধুর ধ্বনি করছে। শুনে বোধ হচ্ছে, যেন বৃক্ষগণই কৃষ্ণভক্তদিগকে হরিনামামৃত গান শুনাচ্ছে। ময়ূর ময়ূরী নর্ত্তক নর্ত্তকীর ন্যায় নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। গোকুলবাসিনী সুরূপিণী আভীরিণিগণ, কেহ কুম্ভ কক্ষে জলে, কেহ পশরা শিরে পথে, কেহ বৎস বক্ষে

গোষ্ঠে, ইতস্তত: গমন করছে। গোষ্ঠমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে মধুর বেণুশব্দ হচ্ছে। সেই রব শুনে, ধেনুগণ বনে বিচরণ করছে। বেগবতী যমুনা উজান বচ্ছে, মীনগুলি মুখ তুলে নীরে তীরে আস্ফালন করছে। দেখে শুনে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হ'ল।

রাগিণী আলিয়া, তাল একতালা।

বুঝি হবে এই বৃন্দাবন।

আহা মরি, কিবা হেরি, সদানন্দ ধাম, সদানন্দ যে ধাম,
ভাবেন অবিশ্রাম, পূর্ণ মনস্কাম, ভাগ্যে সেই ধাম, করিলাম দরশন॥
কুসুমিত যত কুসুম-তরুগণ, অবিরত করে কুসুম বরিষণ,
মধুব্রত করে মধু অন্বেষণ, মধুর স্বরে হরে মন।
উচ্চ পুচ্ছ করি নাচিছে শিখীতে, নর্ত্তকী না পারে সে নৃত্য শিখিতে,
শারী শুকের নিত্য সুখের ধ্বনিতে, ধ্বনিত ভবন বন॥

(কদম্বমূলে দৃষ্টি পূর্ব্বক স্বগত) কি আশ্চর্য্য শোভা! বন উজ্জ্বল হয়েছে। এই দুটিই বুঝি কৃষ্ণ বলরাম হবেন। হাঁ! ঠিক তাইত, বসুদেবের অনেক অবয়ব লক্ষিত হচ্ছে। সেই মুখ, সেই চোক, সেই নাক। ভাল, জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে)

রাগিণী বেহাগ, তাল যৎ।

তরুতলে কে, তোরা মনোহর ঠাম।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা তনু, বেণু বাজাও অবিশ্রাম॥
চন্দ্রাধরে ধর বেণু নব-নীরদ-শ্যাম।
ললিত গুঞ্জিত চূড়া তাহে মালতীর দাম।
পীতাম্বরে শোভে কটি, জিনি কোটি কাম;
মদনমোহন রূপ, জনগণ অভিরাম॥
ঈশানরূপী ঈশধরা রূপ অনুপম।
বিশদ শরদশশী করে ভূতলে বিরাম।
নীলধটী কটিতটে, কে তুই রজতগিরি বটে,
অনুভব বংশীবটে, বুঝি কৃষ্ণ বলরাম॥

কৃষ্ণ। হাঁ, আমরা দু-ভাই কৃষ্ণ বলরাম বটে; তুমি কি কংসচর, মুনির সাজ সেজে এয়েছ?

অক্রূর। না বাপু! আমি অক্রূর মুনি; তোমাদের খুল্লতাত; কংসের প্রেরিত বটে, কিন্তু বসুদেব দেবকীর দুঃখ, তোমাদিগকে বল্‌তে এয়েছি।

কৃষ্ণ। খুড়া মহাশয়! আমার পিতা মাতা ত ভাল আছেন?

অক্রূর। বাপু হে! মা বাপ ব'লে কি তোদের মনে আছে? বসুদেব দেবকী কংস-কারাগারে কি কষ্টে আছেন, বল্‌তে বক্ষ বিদীর্ণ হয়।

যার পদ-রজে শিলা, মানবিনী হয়।
তার মার বুকে শিলা, করে কে প্রত্যয়॥
যে বাঁধে সাগর, শিলা ভাসাইয়া জলে।
তার মা যে কারাগারে, এ কথা কে বলে॥
যার নাম ক'রে লোকে, হরে মৃত্যু ভয়।
তার মার মৃত্যুদশা, কথা মন্দ নয়॥
কালিয়-দমন কারী, হয় যার নাম।
তার মারে দূতে মারে, বিধি অতি বাম॥
গঙ্গা যার পদ-রজে, হয় উপাদান।
তার মার পিপাসায়, ওষ্ঠাগত প্রাণ॥
যার নাম লক্ষ্মীকান্ত, লক্ষ্মীজনার্দ্দন।
তার মা যে অন্ন বিনে, সদা অনশন॥
যার নাম করি লোকে, ভব-সিন্ধু তরে।
তার মা যে, পুত্রশোকে ঘরে পড়ে মরে॥
যার নামে ত্রিভুবন, জুড়ায় অন্তর।
সেই নামে তার মার, কষ্ট নিরন্তর॥
পুত্র আশা করে লোকে, ভাবিয়া নিদান।
অসময়ে কুলাইবে, হইলে সন্তান॥
মল মূত্র অঙ্গে ধরি, দিবস রজনী।
যতন করেন পুত্রে, জনক জননী॥
সে পুত্র কারণে যায়, মা বাপের প্রাণ
জন্মিয়ে না মরে কেন, এমন সন্তান।

রাগিণী সুরট, তাল একতালা।

শোন্‌রে শোন্, বলি দুঃখের বিবরণ।

কৃষ্ণ বল্‌ব কি, তোর মা দেবকী,

এত কি পাতকী হল, তোরে গর্ভে করি ধারণ॥

(ওরে) দেবকীনাথ ঘোর বিপদ, বাঁধা আছে কর পদ,

পাষাণ চাপা আছে বক্ষে সর্ব্বক্ষণ; বক্ষ বিদারণ, দুঃখে দুনয়ন,

(ওরে) জলধারা নাহি ধরে, তো বিনে রে জলদ-বরন॥

হরি ব'লে কাঁদে যত, প্রহারে প্রহরী তত,

শোক দুঃখে ওষ্ঠাগত জীবন রে,

তনু লোটাইয়ে বসু, আছে তোমার পিতা বসু,

তার দুঃখে পশু পক্ষ কাঁদে রে,

বলে বসুদেব, কোথা বলদেব,

কোথা প্রাণের পুত্র, বাসুদেব রে, দেবের দেবারাধ্য ধন॥

বাপু রাম কৃষ্ণ! শুন্‌লে ত, এখন যা কর্ত্তব্য কর। আমি নিমন্ত্রণ দিতে নন্দালয়ে চল্‌লেম।

[অক্রূর মুনির প্রস্থান।

কৃষ্ণ। (রোদনপূর্ব্বক) দাদা! দাদা! আমাদের জীবন ধারণে ফল্ কি? আমরা কেন জন্মেছি? পিতা মাতা আমাদের দ্বারা সুখী হবেন, না, তাঁদের এই বিপদ, এই কষ্ট!!

বলরাম। (ক্রোধারক্ত নয়ন ও রোদন বদনে দম্ভপূর্ব্বক তোতলা স্বরে) ভাই! এত অত্যাচার আর সহ্য হয় না, আমি এর প্রতিকার কর্‌ছি। এই ঈশ-দণ্ডে দুষ্ট কংসের মুণ্ডপাত কর্‌ব। (ঘন ঘন শিঙ্গা শব্দ)।

পটক্ষেপণ।

নেপথ্যে গান।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা।

শুনি দুখের বিবরণ।

রজত-বরণ ওরে শ্যাম নব ঘন, আরক্ত-নয়ন, (মরিরে)

ঝুরে নয়নে ধন, নব ঘনে ঘন ঘন বরিষণ॥

শ্রবণমাত্র জনক জননীর দুখ, চক্ষে বহে নীর বিদরয়ে বুক,
কালী হল মুখ, (মরিরে) কালী হল কালাচাঁদের চাঁদ-মুখ,
ধরাধর করেন ধরা দরশন ॥
ঈশদণ্ড কাঁধে কাঁদে বলরাম, নয়ন আরক্ত যেন পরশুরাম,
রাম বলে শ্যাম, (মরিরে) চলরে মধুর ধাম, দুষ্ট কংসাসুরে করিব নিধন ॥

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

গোকুল।

গোপরাজ নন্দের বহির্ব্বাটী।

নন্দ, উপানন্দ, সদানন্দ, ভবানন্দ, শতানন্দ, প্রেমানন্দ কৃপানন্দ,
প্রভৃতি গোপগণ আসীন।

নন্দ। (সর্ব্ব সমক্ষে) মহারাজ কংস নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। ধনুর্যজ্ঞ কর্‌বেন, যাওয়া কি না, আপনাদের ডেকেছি।

উপানন্দ। নেমন্তন্ন কে আন্‌লে ? মুখোমুখি, না পত্তর ওত্তর আছে ?

নন্দ। (পত্র দেখাইয়া) অক্রুর মুনি পত্র এনেছেন।

উপানন্দ। কি ন্যাখ্‌ছেন পড়।

নন্দ। (ভবানন্দের হস্তে পত্র দিয়া) আপনি পড়ুন।

ভবানন্দ। (কিঞ্চিৎক্ষণ দৃষ্টি পূর্ব্বক) মুইত পান্নু না, আখর গুনো বড্ড ছোট। (শতানন্দের হস্তে প্রদান)

সতানন্দ। (হস্তে পত্র লইয়া স্বগত) মোটেই মা রাঁধে না তার তপ্ত আর পান্তা। (প্রকাশ্যে) মোর ক'দিন গা গতোর ভেঙ্গে জ্বর আস্‌ছে, তার আর পড়্‌ব কি ?

উপানন্দ। হুঁ, সব্বারই বিদ্যে টের পাওয়া গেল। মোদের গয়লা জাতির ক আখর পেটে নেই; (নন্দের প্রতি) তুমি মুখোমুখি কি শুনলে তাই কও।

নন্দ। তাতো আগেই বলেছি।

(গর্গ মুনির প্রবেশ।)

এখন হবে, মুনি ঠাকুর আস্‌ছেন (সকলের সহর্ষে প্রণাম।)

গর্গ। (নন্দকে আশীর্ব্বাদ ও উপবেশন পূর্ব্বক সকলের প্রতি) এখন হবে—কথা টা কি হে?

নন্দ। (পত্র প্রদান পূর্ব্বক) পড়ে সকলকে শুনান।

গর্গ। তা বুঝেছি। (পত্র পাঠ।)

গোপরাজ শ্রীযুক্ত নন্দঘোষ মহাশয়!

নন্দগ্রাম প্রতি আগেষু।

মথুরাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ কংস সেন বাহাদুর, ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। নিরূপিত দিবসে মথুরা রাজধানীতে সবান্ধব উপস্থিত হইয়া, যজ্ঞ দর্শন করিবেন। মহারাজের বিশেষ অনুরোধ, আপনকার কুমার কৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে আনিবেন। তাহাদিগকে দেখিতে মহারাজের নিতান্ত ইচ্ছা। ইতি নিবেদক

সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী।

নন্দ। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উপানন্দের প্রতি) শুনলেন ত, এখন কি করা পরামর্শ?

উপানন্দ। আর সব বেস ন্যাথ্‌ছেন, শ্যাষের কথা ডা ভাল না।

শতানন্দ। ভাল না তা সত্যি, লাজার কথা না নাথ্‌লে কি গয়লার পরাণ বাঁচ্‌বে?

সদানন্দ। মুইত সেথা যেতে নারব। কেষ্টকেও যাতে মানা করি।

নন্দ। (গর্গ মুনির প্রতি দৃষ্টি পূর্ব্বক) মুনি ঠাকুর কি বলেন?

গর্গ। না, না, রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করা হবে না। তাতে নানা বিপদ ঘট্‌তে পারে। কৃষ্ণবলরামকে সঙ্গে লয়ে যাও। মথুরা অভদ্র স্থান নয়, যে রাজার যা ইচ্ছা তাই করবেন। বিশেষ যখন অক্রূর মুনি এয়েছেন, তখন আর কোন সন্দেহ করা উচিত নয়। তোমরা যাবার উদ্যোগ কর, অক্রূর মুনি আমার আশ্রমে আছেন। আমি আর বিলম্ব করতে পারিনে, চল্‌লেম।

[গর্গ মুনির প্রস্থান।

নন্দ। (গোপগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক) কংস মহারাজকে ভেট দিতে হবে; কাল সকালে এক শ মণ ঘি, পঁচিশ মণ মাখন, ষোল মণ ছানা, আশি মণ খাসা দই, চল্লিশ মণ দুধ, পঞ্চাশ মণ ক্ষীর, আর দশ মণ ক্ষীরসা চাই। সব যে যত জোটাতে পার সেই ভাল। এখন এর যোগাড় দেখ। আমি বাড়ীর ভিতর যাই, দেখি, রাণী বা একথা শুনে কি বলেন।

[নন্দের প্রস্থান।

উপানন্দ। মুই ঢের ক্ষণ বাথান ছাড়া, অখন যাই, মশয়রা আপ্না আপনি ঠেকানা কর।

[উপানন্দের প্রস্থান।

প্রেমানন্দ। মুই ত মাখন দিতে নারব। আর বছর দুই কুড়ি টাকা দিয়ে চারটা গাই কিন্নু, বছর না ফির্‌তেই শালার গাই দুবার গাব্‌রা ফেল্‌লো।

রুপানন্দ। (জনান্তিকে প্রেমানন্দের প্রতি) দাদা! তুই ভাব্‌ছিস কি? দুধের বায়না নেনা, ডর কি? জল দিয়াই শালার টাঁকের হাঁড়ি টেঁকে দিব।

সদানন্দ। (মাথায় হাত দিয়া) শালার দ্যাশে বিচার টিচার নেই; টাকা কড়ির কথায় তেলে বেগুণ; চাঁদে চাঁদে বায়না। মোদের গরিব নোকের আর মা বাপ নেই।

প্রেমানন্দ। তা সত্তিই ভাই! বায়না চাইলে বলে সুদের টাকাই দুধের বায়না। হিসাব কালে মাসের এক দিন কম্‌লে, কেটে লয়, সমান হলে সমান সমান। এক দিন বাড়লে শালারা আর ধরে দেয় না। মুই বেস্ বুঝ্‌ছি, ভদ্দর লোক শালারা, চোর ডাকাতের বাবা। মোদের ছোট নোককে বাধাতে পার্‌লে আর ছাড়ে না। তা আর ভাব্‌লে কি হবে? চল যাই, রাজার পিণ্ডির যোগাড় দেখি গে।

[সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নন্দরাজের অন্তঃপুর।

যশোদা আসীন।

যশোদা। (দধিমন্থন করিতে করিতে স্বগত) মহারাজ মারেন, মন্দ বলেন, আর কেটেই ফেলেন, আমি প্রাণ থাক্‌তে প্রাণগোপালকে মথুরায় যেতে দেব না। যে কংস রাজা গোপালের বধ করিতে পুতনার স্তনে বিষ দিয়ে পাঠালে, আমি মা হয়ে সেই রাজবাড়ীতে কেমন্ করে গোপালকে পাঠাব? (ক্রন্দন, অঞ্চলে চক্ষের জল মোচন।)

(নন্দের প্রবেশ।)

নন্দ। রাণি! বসে কি ভাব্‌ছ? গোপালকে সাজিয়ে দিলে না? ব্রজবাসী সব্বাই মথুরায় গেল, বেলা হয়ে উঠ্‌ল, আর বিলম্ব করতে পারিনে। শীঘ্র শীঘ্র সাজিয়ে দাও।

যশোদা। (নন্দকে রাগদৃষ্টিতে) মহারাজ! লোকে বলে, বুড় হ'লেই বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায়, আপনার তাই ঘটেছে। আপনি কি পাগল হয়েছেন, তাই মথুরায় প্রাণ গোপালকে লয়ে যেতে চান। আমার প্রাণ থাক্‌তে তা হবে না। আমি কখন দুরন্ত কংসের বাড়ীতে গোপালকে যেতে দেব না। এতে আপনি রাগ ক'রে মারেন আর কাটেন। (রোদন)

নন্দ। সে কি? আমি অক্রূর মুনির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, গোপালকে এখন সঙ্গে না নিলে কি মান থাকে? স্ত্রীলোকের ধর্ম্মই স্বতন্তর। কথায় কথায় দ্বন্দ্ব, মাথার দিব্য, একটুকু কড়া কথা বল্‌লেই পর্ব্বতের ঝরণার মত চোক দিয়ে জল পড়ে। যদি সাজিয়ে না দাও, তবে যা শোন্‌বার তা শুন্‌বে।

যশোদা। (নন্দের পদে পতিত হইয়া) পায়ে ধরে বল্‌ছি, আপনি এমন কাজ কর্‌বেন না। আপন হাতে বিষ খাবেন না, প্রাণ গোপালকে সঙ্গে নিয়ে আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বেন না। (রোদনস্বরে)

রাগিণী আলিয়া, তাল একতালা।

তোমায় সাধে কি করি বারণ;
আমি একান্ত হে কান্ত, দিব না নীলকান্ত,
গোপালের বৈরি সে মথুরা-কান্ত;

তাই বলিহে কান্ত, ভেবে সে বৃত্তান্ত,
ক্ষান্ত কয় ভ্রান্ত মন।
ওহে নন্দ আমার একে মন্দ কপাল,
সন্দ হয় তাইতে পাঠাতে গোপাল ;
দ্বন্দ্ব করে সদা মথুরার ভূপাল,
ভুলেছ সে বিবরণ।
কত কথা ব'লে ব্যথা দাওহে হৃদে,
পদে পদে দোষী আছি তব পদে,
গোপাল লয়ে গেলে পড়িবে বিপদে,
বঞ্চিত হবে সঞ্চিত ধন।

নন্দ। স্ত্রীজাতি অল্পবুদ্ধি, কেবল কাঁদতে জানে, ভাল মন্দ বোঝে না। গোপাল আমার সঙ্গে যাবে এতে আর চিন্তা কি ? বিলম্ব করো না, শীঘ্র সাজিয়ে দাও, আমি বাহিরে চল্লেম।

[নন্দের প্রস্থান।

যশোদা। (রোদন করিতে করিতে স্বগত) যাই, কেঁদে আর কি করব, অবোধের হাতে পড়েছি। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) মাগো, পোড়া কপালে যেন কি আছে। (উপবেশন)

(কৃষ্ণ বলরামের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। মা ! আমায় সাজায়ে দে, আমি মথুরায় যাব ; ছিদাম, সুদাম, তারা সব্বাই সেজে এয়েছে।

যশোদা। বাপ আমার ! যাদু আমার ! তুমি মথুরায় যেওনা। আমি মা হয়ে কেমন করে বিদায় দি ; এতে মহারাজ নন্দ বল্লে, ঘরে আর থাকব না, তোরে বুকে ক'রে নগরে নগরে মেগে খাব।

বলরাম। (তোত্‌লা স্বরে) মা ! তোর ভয় কি ? আমি কাছে থাকতে কে কি বলতে পারে ? রাজার কাছে হাত ধরে নে যাব, যদি কেউ দ্বন্দ্ব করে, এই লাঙ্গল দিয়ে তার মাথা ভাঙ্‌ব। আমি মার কাছে যাই, সাজি গিয়ে।

[বলরামের প্রস্থান।

যশোদা। (গোপালকে কোলে করিয়া সজ্জা করিতে করিতে স্বগত) কি হ'ল; আজ প্রাণ কেন এমন করছে,চুড়ো বাঁধ্‌তে ধড়া খসে পড়ছে, আবার ধড়া বাঁধ্‌তে

চূড়ো হেলে পড়ছে, গোপাল আমার মুখপানে চেয়ে, ছলছল চক্ষে কি বলতে চাচ্ছে, বলতে পারছে না। (রোদনস্বরে)

রাগিণী ললিত বিভাস, তাল একতালা।

কেন কাঁদে প্রাণ আমার, সাজাইতে আজ নীলকান্তে।
গুঞ্জছড়া মোহন চূড়া, খঁসে পড়ে ধড়া বাঁধতে ॥
গোপাল আমার, আসবে না আর, বৃন্দাবনে পেরেছি জানতে
বুঝি তাইতে, মা বলিতে, ধারা বহে নয়ন প্রান্তে ॥
(গোপালের চিবুক ধরিয়া)
ব্রজে বুঝি আর আসবেনা, মা বলিয়া আর ডাকবে না,
ননির তরে আর কাঁদবে না, আর হবে না বাঁধতে ;
ধরে অঞ্চল, আঁখি চঞ্চল, যেন আমায় কি চাও বলতে ;
মনে কি তোর, রে মাখন চোর, বল মায়ে, চাই জানতে।।

(গোপালকে ক্রোড়ে করিয়া দাঁড়াইয়া স্বগত) আর কাঁদলে কি হবে, রাজার যে ভাব দেখছি, তিনি কখন নীলমণিকে ছেড়ে যাবেন না। গোপাল যাঁর দেওয়া ধন, এখন সেই দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকেই ডাকি, তিনি যা করেন। (রোদন স্বরে)—

রাগিণী বিভাস ঝিঝিট, তাল ঝাঁপতাল।

কোথা দুর্গে! দুখহরা দনুজদল-দলনী।
গোপালে শ্রীপদে রেখ, বিপদে বিপদ-নাশিনী ॥
কংস-যজ্ঞে মথুরা যায়, মা আমার নীলমণি ;
আশীর্ব্বাদ কর আসি, আশুতোষ-তোষিণী ;
আসন্ন আপদ হর, হরমনোমোহিনী।।
ভয়ে ডাকি গো অভয়ে তাই, মা বলে আর এমন নাই,
বড় দুখের ধন কানাই, দুখিনীর দুখ পাসরা ;
হর পূজি বিল্বদলে, কোলে পেলেম মাখনচোরা,
গোপাল আমার নয়ন-তারা, সকলি ত জান তারা,
দণ্ডে দণ্ডে হই হারা, পলকে প্রলয় গণি ।।

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আয়ান ঘোষের অন্তঃপুর।

শয়নমন্দিরে শ্রীমতী আসীনা।

শ্রীমতী। (মালা গাঁথিতে গাঁথিতে স্বগত) আজ প্রাণ এমন কর্‌ছে কেন। অকারণে চোকে জল আস্‌ছে, চলতে পায়ে পা লাগ্‌ছে, দক্ষিণ আঁখি আর দক্ষিণ অঙ্গ নৃত্য কর্‌ছে, গাঁথা মালা হাত থেকে খসে পড়ছে, নন্দালয়ের ভেরির শব্দে আমার প্রাণ শীতল হচ্ছে না, কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে, জটিলা কুটিলার বড়ই আনন্দ দেখ্‌ছি, তারা হেসে হেসে বল্‌ছে "আপদ শান্তি হ'ল।" (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ) প্রাণকান্ত বুঝি মথুরায় গেলেন। (রোদন)

(বিসখার প্রবেশ)

শ্রীমতী। এস সখি! নিকটে বস।

বিসখা। (নিকটে বসিয়া) রাজনন্দিনি! নির্জ্জনে বসে কি চিন্তা কর্‌ছ? আমি শুনে এলেম তোমার প্রাণনাথ আমাদিগকে অনাথ করে, মথুরায় যাচ্ছেন।

শ্রীমতী। সখি! কি সর্ব্বনাশ! বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'ল, ও—তাইতে আমার প্রাণ এমন কর্‌ছে। (বিসখার হস্ত ধরিয়া রোদন করিতে করিতে)

রাগিণী পীলু সিন্ধু, তাল আড় কয়ালি।

বিসখা বিসখা হোলেম, কি শুনি আজ শ্রবণে।
মথুরা যায় প্রাণসখা, কৃষ্ণসখা, সখাসনে॥
জটিলার জটিলতা, কুটিলার কুটিলতা,
কত ব্যথা পাই গুরু গঞ্জনে;
(ওলো) সে সব অসৈল সই লো, এত দিন প্রাণে সই লো,
শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ শৈল, সই লো কেমনে॥

ব্যাকুল হয়ে বাঁশীর গানে, কুলভয় না মানি প্রাণে
দুকুল দিলাম গোকুল চাঁদের চরণে ;
এখন আমার যায় গো কুল, কি হোল হাসিল গোকুল,
অকুলে ভাসালেন হরি, তরি কেমনে ॥

(বৃন্দা, বিস্থা ও বড়াই প্রভৃতির প্রবেশ)

বৃন্দা। রাজনন্দিনি, বিরলে বসে রোদন কর্‌লে আর কি হবে ? তোমার কৃষ্ণচন্দ্র যে গোকুল আঁধার করে অন্তে যাচ্ছেন। যদি দেখ্‌তে সাধ্‌ থাকে, তবে শিগ্‌গির এস।

রাগিণী জং, তাল একতালা।

প্রেম-ব্রত ভঙ্গ, ছেড়ে যায় ত্রিভঙ্গ, কি কর কিশোরী।
শ্রীহরি শ্রীহরি, (কিশোরী তোমার) মধুপুরে আজ করেন শ্রীহরি ॥
পদ্মযোনির শিরোমণি, তোমার হৃদি-পদ্মের মণি,
যশোমতীর নয়নমণি, নীলমণি নিল হরি মুনি হরি ॥
তোমার প্রাণহরি, তোমার প্রাণ হরি,
অকুলে ডুবায় গোকুল নগরী।
গোপীকুলের কুল হরি, গোপীকুলের কুলহরি,
বিচ্ছেদ অকূলে যায় পরিহরি, বল উপায় কি করি ॥

(শ্রবণ করিতে করিতে সখী অঙ্গে অঙ্গ দিয়া শ্রীমতীর অর্দ্ধমূর্চ্ছা।)

(কুটিলার প্রবেশ।)

কুটিলা। (প্রতি সখীকে লক্ষ্য করিয়া) এই যে বৃন্দে, এই যে বিসখা, এই যে ললিতে, সকলেই এখানে আছেন ; হাঁলো ! তোরা আবার কি পরামর্শ কর্‌ছিস্‌ ? একবার ঘটকালী করে কুলে কালী দিলি, আবার বুঝি বৌকে নে মথুরায় গিয়ে ঢলাঢলি কর্‌বি। "ভাগ্যে অক্‌কুর ব্রজে এল, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খেল, ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল।"

(নামানুসারে প্রতি সখির মুখের উপর হাতনাড়া দিয়া।)

বড়াই, বড়াই বড় ছিল তোর মনে।
শেষ কালে কালী চুণ পড়িল বদনে ॥
রঙ্গদেবী, রঙ্গভঙ্গ হ'ল এত দিনে।
ললিতা, লোলিত চর্ম্ম, হবে কৃষ্ণ বিনে ॥

ইন্দুরেখা, যাবে না লো এ কলঙ্ক রেখা ।
চিত্র করে রাখ কাল, চিত্তে চিত্ররেখা ॥
ওলো বিদ্যে ! ভাল বিদ্যে করিলি প্রকাশ ।
বিসখা লো, বিষ খালো, প্রাণে কিবা আশ ॥
ছি গো বৃন্দে ! শ্রীগোবিন্দে তোরে যায় ভুলে ।
ঘটকালী করে তুই, কালী দিলি কুলে ॥
রাধিকার চমৎকার, চিন্তা জ্বর দেখি ।
প্রেমের বিকার ঘোর ওমা ! একি একি ॥
কালা গেল তবু তার জ্বালা নাহি যায় ।
জ্বলে জ্বলে উঠে অঙ্গ, জলে না নিবায় ॥
কিশোরীর কি শরীর ছিল আহা মরি ।
তিলার্দ্ধ বিরহ-তাপ ফেলে শুষ্ক করি ॥
এর পর কি হইবে তাই ভেবে মরি ।
কাল বুঝি কাল হয়, উপায় কি করি ॥
রাখালের মন প্রাণ দিস্ না লো রাই ।
কত মানা করেছিনু কিছু শুন নাই ॥
রাখাল গোপাল রাখে, প্রেম নাহি জানে ।
মন দিয়া মন পোড়ে জ্বলে মর প্রাণে ॥
দেহে প্রাণে সে কালার একরূপ কাল ।
কোন্ কাজে কালো বল কার পক্ষে ভাল ॥
বাহিরে যাহার কাল অন্তরেও তাই ।
বুঝিয়ে কালার প্রেমে মন সঁপি নাই ॥
এখন যে পৃথিবীতে আছে ধর্ম্ম নাম ।
ভাগ্যেতে অক্রূর এল বৃন্দাবন ধাম ॥
ষাঁড়ের ঘরের শক্র বাঘে মেরে খেল ।
পিত্ত শেলেষ্মার জ্বর ঘাম দিয়া গেল ॥

রাগিণী লুমঝিঝিট, তাল পোস্তা।

গোকুলে আস্‌বে না শ্যাম, কালী দিয়া যায় গো কুলে।
বিচ্ছেদ আগুণ কেন জ্বলে, যা লো কালার রূপ ভুলে॥ (ও রাই)
আগে না ভাবিয়া পরে, পরে কুল দিলে,
এই দশা তার হয় লো পরে, ডুবে মরে কলঙ্ক জলে॥ (ও রাই)
ভাগ্যে অক্রুর ব্রজে এল, ষাঁড়ের শক্র বাঘে খেল,
ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল, কুলের বৌ তুই আয় গো কুলে॥ (ও রাই)

পটক্ষেপণ।

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজপথ।

রথে কৃষ্ণ বলরাম।

(সখী সঙ্গে শ্রীমতীর প্রবেশ।)

বৃন্দা। কিশোরি! এমন হ'লে কেন, আমার গায়ে ভর দে, ধীরে ধীরে এস; ঐ রথ দেখা যাচ্ছে, অধিক দূর নাই।

শ্রীমতী। (কতক দূর গমন করিয়া) সখি! আর কত দূর? আমার পা যে চলে না।

বৃন্দা। প্যারি! এই ত রথের নিকট এয়েছ; চেয়ে দেখ, তোমার মনচোর অক্রুরের রথে। যা বল্‌তে এলে' বল।

শ্রীমতী। সখি! তোমরা আমার শিশুকালের সঙ্গিনী, মনের ব্যথা সকলই জান, আমি আর কি বল্‌ব। যা বল্‌তে হয় তুমি বল।

বৃন্দা। আমি চিরকাল বলে এলেম্, এখনও বলি, (কৃষ্ণের প্রতি) বলি,

ও কাল মেঘ! আবার কোন্ দিকে বর্ষণ করতে চল্‌লে? হায়! পিপাসা গেল না, কেবল বজ্রাঘাতে কমলিনীর প্রাণ গেল। একবার বদন তুলে দেখ।

রাগিণী লুম ঝিঝিট, তাল মধ্যমান।

এল প্যারী চন্দ্রবদনা, শ্যাম!
অধোবদন কেন, চন্দ্রবদন তোল না?
এই দেখা শেষ দেখাদেখি, দেখে যান রাই বিধুমুখী,
জন্মের মত কমল আঁখি, দেখে যাই হে আর দেখ্‌ব না।
আমরা বলি বিনয় করি, ক্ষণেক রথ রাখ হে হরি,
রথে রাই রথ মিলন করি, পুরাই হে মনোবাসনা॥

কৃষ্ণ। (রথ হইতে অবরোহণ করিয়া শ্রীমতীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) প্রিয়ে! এমন হ'লে কেন? গৃহে যাও। আমি শপথ ক'রে বল্‌ছি কাল আস্‌ব।

শ্রীমতী। (অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে)

যাও যাও কেন বল, যাও আমি যাই।
যাই কি না যাই তাহা জেনে কাজ নাই॥
তুমি যাবে মধুপুরে সুখ পাবে অতি।
তাহাতে আমার সুখ, নাই কিছু ক্ষতি॥
কৃষ্ণ সুখে সুখী রাই সকলেই জানে।
তুমি সুখী হ'লে আমি সুখী হই প্রাণে॥
প্রাণ যে কেমন করে বলিতে যে নারি।
বলিতে এলেম তাই, বলিতে না পারি॥
তুমি যাও আমি আসি, দেখিতে তোমায়।
কে আনিল অচেতন করিয়া আমায়॥
আমি যে এসেছি হেথা, আমি নাহি জানি।
অপরাধ ক্ষম, ধরি পদ দুইখানি॥
তুমি যাবে, আমি কেন দেখিবারে চাই।
ইহাতেই বুঝিতেছি আমি আমি নাই॥
আমার আমিকে আজ কে করিল চুরি।
আমি হারাইয়া আমি, রাজপথে ঘুরি॥
তুমি যাও আমি কেন, কাঁদি তব তরে।
কে আমার হৃদয়কে বিদারণ করে॥

হৃদি যদি না ফাটিত, তবে আমি আর।
দেখিতে না আসিতাম তোমায় আবার॥
যাই বল না হে নাথ! আমি যাই যাই।
(মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিতা॥)

পটক্ষেপণ।

রাগিণী কালেংড়া, তাল কয়ালি।

(গান) শ্রীনন্দসুত মধু-ভবনে।
গোপিকায়, কবে হায় হায়, চায় ঊর্দ্ধ নয়নে॥
গোপীগণে চক্র করি, চক্রধরে চক্র করি,
চক্রধরের চক্র নিবারণে;
বলেন চক্রপাণি প্রবোধ বচনে,
কেন চক্র ধর সবে, কাল আসিব বৃন্দাবনে॥
কাঁদেন প্যারী ধরা ধরি, সবে করি ধরাধরি,
ত্বরাত্বরি যায় কুঞ্জ কাননে;
বলে নিসখা অশ্রু নয়নে, হরি হরি হরি বিনে,
হরিপ্রিয়ে মরে প্রাণে।
শত বৎসর রাধিকার, কৃষ্ণ বিচ্ছেদ অধিকার,
অধিক আর না দেখি পুরাণে;
ব্রজে নিত্য লীলা ব্যাসের বচনে,
রাধা কৃষ্ণ যুগল মিলন ভাবাবেশে হরি ভণে॥

সমাপ্ত

ভাবোচ্ছ্বাস।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

পূর্ব্বরাগে মধুর-রসোচ্ছ্বাস।

যমুনা গমনের পথ,—শ্রীমতী।

শ্রীমতী। (স্বগতঃ) আজ প্রাণবল্লভ যখন গোষ্ঠে যান, তখন পাপ ননদী নিকটে ছিল; বেণুর ধ্বনি শুনে, দধির পসরা আনতে বল্লেন; আমি গো বৎস ধরতে গেলেম। তা দেখে তিনি হাস্‌লেন; কুটীলে কতই ব্যঙ্গ কর্‌ল, কতই ভৎসনা করে বল্‌ল, বৌ বুঝি কালার বেণু শুনেছিস্? না হ'লে এমন হবি কেন? লজ্জায় অধোমুখ হলেম, ভয়ে আর বাহিরে যেতে পেলেম না; কাজেই প্রাণ-বল্লভকে আজ আর দেখিনি। সারাদিন যে ভাবে গেল তা বিধাতা জানেন, এখন প্রাণের মধ্যে কেমন্ করতে লাগ্‌ল, বুক ফেটে চোকে জল এল, ঘরে আর থাকতে পেলেম্ না, জল আনার ছল করে তাই যমুনার ধারে এলেম; ভেবেছিলেম প্রাণবল্লভকে এখানে দেখ্‌তে পাব? কৈ এখানে ত নাই, (দীর্ঘ নিশ্বাস পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণোদ্দেশে) ও রাখাল-রাজ! ব্যাধেরা যেমন বাঁশী বাজিয়ে হরিণীর সর্ব্বনাশ করে, তুমি বেণু বাজিয়ে আমারও সেইরূপ সর্ব্বনাশ করলে।

রাগিণী মূলতান, একতালা।

আমার ব্যাকুলিত মন।
গৃহেতে রহেনা, প্রবোধ মানেনা, সদা ভাবে জলদবরণ ॥
নিঠুর ব্যাধের বাঁশরী শুনিয়ে,
হরিণী যেমন বেড়ায় হে ছুটিয়ে,
আমি সেইরূপ হোয়ে, (বঁধুহে) এলাম হে ধাইয়ে,
দেখা দাও রাধারমণ ॥

নব মেঘের উদ্দেশে, বৃক্ষ ডালে ব'সে
চাতকিনী সদা ডাকে যেমন ;
আমি সেইরূপ হোয়ে, লুকায়ে লুকায়ে,
হৃদয়ে ডাকি সর্ব্বক্ষণ ;
সে পাপ ঘরে আমার কুললাজ অরি,
হৃদয় খুলে তোমায় ডাকিতে না পারি,
আমি গুমরিয়ে মরি, দিবস শর্ব্বরী,
ঝুরে দুনয়ন ॥

শ্রীমতী। প্রাণবল্লভ, ক্ষণ কাল তোমায় না দেখ্‌লে শুষ্ক সরোবরের মীনের মত ছট্‌ফট্‌ করি, প্রাণে বাঁচিনে, আজ সারাদিন গেল দেখিনি, তাই গৃহকাজ আর কুললাজ ত্যাগ করে যমুনার কুলে তোমায় দেখ্‌তে এলেম। হে ত্রিভঙ্গ, একবার দেখা দিয়ে দাসীর প্রাণ বাঁচাও। আমার গৃহে বাঘিনীর ন্যায় শ্বাশুড়ী, কাল নাগিণীর ন্যায় পাপ ননদিনী, তাতো সব জান ; আমি আর কতক্ষন এখানে থাক্‌ব বল ; আমি যে থাকৃতে পারিনে যেতেও পারিনে, শাঁকের করাতের ধারে পড়েছি

(রাখাল বেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।)

কৃষ্ণ। কমলিনি ! এখানে এসেছ, তা আমি রাখালমণ্ডলী হোতে দেখ্‌তে পেয়ে, যমুনার ধারে যাই বলে ছল করে তোমায় দেখ্‌তে এলেম। যাই বিলম্ব কর্‌তে পারিনে, রাখালগণ গোপাল লয়ে গৃহে যাচ্ছে।

শ্রীমতী। তুমি আমায় কি করেছ তাই বল শুনি ? আমি যে আর ঘরে থাকৃতে পারিনে ? মনে হয় রাখাল হয়ে বনে যাই, তোমার সঙ্গে খেলা করি। বলি ও শঠ রাখাল ! কুলের বৌ হয়ে আমি তোমায় দেখ্‌তে এলাম, আর তুমি যাই যাই কর্‌ছ ? (স্থিরচক্ষে কৃষ্ণমুখ দর্শন) সারাদিন আজ দেখি নাই, যদি এলে ক্ষণেক দাঁড়াও। একবার প্রাণ ভরে দেখি ; ঐ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা দেখে তাপিত প্রাণ শীতল করি।

রাগিণী মুলতান, একতালা।

বঁধু, দাঁড়াও হে দাঁড়াও।
দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ হইয়ে, বাঁশরী লইয়ে,
চাঁদমুখে একবার বাজাও ॥

রাখাল সঙ্গে রঙ্গে, যখন এলে বনে,
ননদিনী ছিল তোমার ভবনে,
তখন, না পেয়ে দেখিতে, দিন যায় কাঁদিতে,
এখন এ প্রাণ জুড়াও ॥
তব প্রেম বিরোধিনী, সে পাপ ননদিনী,
দিবানিশি দেয় হে গঞ্জনা ;
থাক্ কৃষ্ণ বলা দূরে, মরি পাপ ঘরে,
কাল বল্তে দেয় না ;
বসিয়া হান্‌সালে, কাঁদি ধূমাছলে,
ননদিনী বলে কথার কৌশলে,
কেন কাঁদিস্ লো কিশোরী, লইয়ে গাগরি,
যমুনায় জল আন্তে যাও ॥

(নেপথ্যে শিঙ্গার ধ্বনি)

কৃষ্ণ। ঐ দাদা বলাই আস্‌ছেন।

[উভয়ে উভয়কে সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে দেখিতে প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

রাগিণী ভৈরবী, তাল আড়া।

কোথা কান্ত, সে নীলকান্ত,
কি করিতে কি করিলাম ;
সিঞ্চিয়ে সে জলনিধি, পেয়ে নিধি হারাইলাম।
মেঘের জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে, চাতকীপ্রায় এলাম ধেয়ে,
মেঘ লুকাল দেখা দিয়ে, পিপাসাতে প্রাণে ম'লেম ॥
প্রতিপদ চাঁদ উদয় হ'ল, চকোরিণী ধেয়ে এল,
শশী অমনি লুকাইল, সুধা আশে ক্ষুধায় মলেম ॥

———

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

বাৎসল্য-রসোচ্ছ্বাস।

নন্দালয়—যশোমতী রোহিণী।

যশোদা। দিদি! তুমি ত মথুরায় ছিলে, কংসরাজার সকলই জান; তার আকৃতি প্রকৃতি কেমন?

রোহিণী যেমন আকৃতি, তেম্‌নি প্রকৃতি, দেখ্‌তে মহিষাসুরের মত, স্বভাবেও তাই। তার ভগ্নি সোণার প্রতিমা দেবকী, সরলা অবলা, তারে কারাগারে বেঁধে রেখেছে, কত প্রকারে কষ্ট দিচ্ছে। [illegible] একটী নয়, দুটি নয়, তার আট আটটি সন্তান বধ কর্‌লে; এমন পাষণ্ড কি [illegible]তে আছে। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া ক্রন্দন)

যশোদা। (রোহিণীর হস্ত [illegible]) ছি দিদি! অমন করে কাঁদ্‌তে নেই, ভগবান্ আছেন, তিনি এর [illegible] দেবেন। পৃথিবীতে কত দস্যি অসুর জন্মেছিল, তারা কি কেউ [illegible] বংশে বাতি দেবার লোক নেই; তার কংস আর ক' দিন [illegible]? [illegible] বাড় বেড়েছে, তেমনি সাঁজের রাত্রে গোল্লাই যাবেন।

রোহিণী। তা সত্য [illegible]! [illegible] দেবকীর কথা মনে হ'লে, আমার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠে

যশোদা। দিদি! [illegible] হচ্ছে, বনের কথা মনে প'লে, ভয়ে বুক দপ্ দপ্ করে। সে দিন স্তন [illegible] রাক্ষসী পূতনা এয়েছিল, আর একদিন বনের মধ্যে অঘাসুর নীলমণিকে গিলে [illegible]ছিল, ভাগ্যে যাই তোমার বলাই ছিল তাই রক্ষে, নতুবা সে দিন কি হতো তা মনে করতেও আমার বুক কেঁপে উঠে। (গৃহদ্বারে আসিয়া সূর্য্যদেবকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) দিদি! আর বেলা নাই, সূর্য্যদেব পাটে যাচ্ছেন, আমার নীলমণি এখনও এলোনা কেন? আর দিন ত এতক্ষণ এসে থাকে? কি জানি রাখালেরা আজ আবার কি বিবদে প'ল। এখানে ত কেউ নাই, কারে রাখালে পাঠাই।

রাগিণী ইমন, তাল কাওয়ালী।

দিদি কি ঘটে, গোঠে না জানি।
অস্তে গেল দিনমণি, এল না মোর নীলমণি॥

ব্রজ রাখালের সনে, গিয়াছে সেই গোচারণে ;
সারাদিন রয়েছে বনে, না খেয়ে ক্ষীরনবনী ॥
গোপাল আমার শিশু রাখাল, নিতি নিতি চরায় গোপাল ;
বৈরি মথুরার ভূপাল, ভ্রমে দিবস রজনী ॥

(নেপথ্যে শিঙ্গা ও বেণুর ধ্বনি এবং আবা আবা শব্দ)

রোহিণী। যশোদা! আর কাঁদিস্‌নে ; রাখালেরা ঐ আস্‌ছে।

(উভয়ের গাত্রোত্থান)

(আবা আবা শব্দে রামকৃষ্ণ ও রাখালগণের প্রবেশ।)

যশোদা। এস! আমার যাদু এস! (মুখে চুমা দিয়া গোপালকে ক্রোড়ে)

রোহিণী। বাপ এস! (কোলে করিয়া বলরামের প্রতি) আজ তোদের এত বেলা গেল কেন?

বলরাম। গো-গো-গো-ঠে ক-ক-কত খে-খে-খেলা খে-খে-খেল্‌লাম।

যশোদা। (ছিদামের প্রতি) বাছা ছিদাম! আজ তোদের এত বেলা গেল কেন?

ছিদাম। আজ আমাদের অসুর আর রাক্ষসী ঘিরেছিল। মা! তারা একটা নয়, অনেক এসেছিল। তারা মা! বেশ ভাল মানুষ, কিছু বোল্‌লে না, আর মোদের কানাইকে দণ্ডবৎ কোল্লে। ওমা! তাদের কথা বল্‌ব কি, মধ্যে এক-জনার চার্‌দিকে মুখ, সে আবার হাঁসের উপর চ'ড়ে ছিল। একজন মহিষে চড়ে এল, তাকে দেখে মুই বড় ভয় পেয়েছিলেম। আর একজনের পাঁচ মুখ, মোদের যমুনার মত তার জটায় এক নদী আছে ; ওমা সে নদী আবার কুল কুল ক'রে ডাকে। মা! তোর মত এক রমণীও এসেছিল, তার তিন চোক দশ হাত ; সে আবার তোর গোপালকে কোলে করল। মা! আজ তোর আশীর্ব্বাদে মোরা বেঁচে এসেছি।

রাগিণী বিভাস, তাল একতালা।

শোন্‌ মা যশোদে! আজ যে বিপদে,
পড়েছিলাম গোঠে, বলি মা তোমায়।
জননী, কত অসুর আসিয়ে ঘেরিল সবায় ॥
এক বৃদ্ধ পঞ্চানন, তাহার ত্রিলোচন,
প্রণমিল সে জন তোর গোপালের পায় ॥

পঞ্চমুখের জটার মাঝে এক রমণী,
সে ধনী করে কুলু কুলু ধ্বনি,
দশহস্তা নারী, দেখে ভয়ে মরি,
তোর, গোপাল অবোধ ছেলে, তার কোলে যায় ॥

রোহিণী। ছিদাম যা বল্‌ল, তা যদি সত্য হয়, তবে ত এঁরা মানুষ নয়, দেবতা।

যশোদা। তাই ত কি সর্ব্বনাশ লো!

(নেপথ্যে আরতির বাদ্য।)

পট পরিবর্ত্তন।

রাগিণী আলেয়া, তাল আড়া।

আনন্দ আরতি, গায় গোপবৃন্দ,
যশোমতীর করে প্রদীপ, কোলেতে গোবিন্দ ॥
বাজে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁশী, মধুর মৃদঙ্গ বাঁশী,
বাথান হ'তে নন্দ আসি, কোলে লয় আনন্দ ॥
গোপাল কাঁদে রাণীর কোলে, দে মা চাঁদ ধরে দে ব'লে,
রাণী ডাকে কুতূহলে, আয়রে আয় চন্দ্র।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

রূপানুরাগ রসোচ্ছ্বাস।

শ্রীমতীর ভবনমন্দির।

যোগাসনে বসিয়া বাম করে কপোল রাখিয়া চিত্র পুত্তলিকার মত শ্রীমতীর চিন্তা।

(বৃন্দা, বিশখা ও ললিতাদি সখীর প্রবেশ।)

বৃন্দা। (বিশখার প্রতি) সখি! ঐ দেখ কমলিনী বিরলে বোসে চিত্র পুত্তলের ন্যায় কি চিন্তা কোর্‌ছে। আমরা যে এখানে এসেছি, তা জান্‌তেও পারেনি;

যোগিনী যেন যোগ চিন্তায় মগ্ন হোয়েছে। কিশোরীর এ কি ভাব, বুঝ্তে পারিস্? এখন আর আগের মত স্বভাব নেই, দেখা হ'লে ডেকে হেসে কথা কয় না।

বিশখা। তাই ত সখী? আপ্নি ত কিছু বলেই না, জিজ্ঞাসিলেও মুখ হেঁট ক'রে থাকে। একবারের পর দুবা্র কিছু জিজ্ঞাসা কোর্লেই বিরক্ত হয়।

(গুন্ গুন্ স্বরে শ্রীমতীর গান)

রাগিণী শঙ্করা, তাল একতালা।

গিয়াছিলাম যমুনাতে জল আনিতে কি কুক্ষণে।
কালিয়া দংশিল আমার, বাঁকা নয়ন দশনে॥
সামান্য সব বিষধরে অধরেতে বিষ ধরে,
কালিয়া ভুজঙ্গের বিষ অপাঙ্গ-ভঙ্গিমা সনে॥
অন্য ভুজঙ্গ দংশিলে, প্রাণ যায় অঙ্গ জ্বলে;
কুলবধূ পাগল হয় মাঁ! এ ভুজঙ্গ দংশনে।

ললিতা। (বৃন্দার প্রতি) এখন্ ত শুন্লি? গান শুনে বুঝ্লি? রাই কেন এমন হলো? ধোঁড়া নয় বোড়া নয়, কালিয়ে সাপ ওকে খেয়েছে। যদি মন্ত্র ওষুধ জান, তবে গিয়ে ঝাড়; যদি পার, না হয় কালিয়ে সাপ ধোরে এনে দাও।

বৃন্দা। আমি ত ঝাড়্তেই আছি, পটে সাপ লিখে দেখাল বিশখা, সেই সাপ আবার যমুনার ঘাটে দংশন করলে, এখন ঔষধ খুজ্বো আমি? যে সাপ দেখাল, ঘাটে নে গেল, এখন সেই ঝাড়ুক, আর ওষুধ বিষুধ আমুক; না হয় সাপ ধরে দিক্, তাতে আমার দায় কি.

বিশখা। আচ্ছা।—যে বিষ দিয়েছে, সেই অমৃত দেবে, এখন যাবি নাকি চল; রাইকে জিজ্ঞাসা করি ও অমন ক'রে ভাবে কি?

[রাধার নিকট সকলের গমন।

শ্রীমতী। (সচকিতে গাত্রোত্থান পুর্ব্বক) আয় বিশখা, বৃন্দে, ললিতে আমার কাছে এসে বোস্। (সকলের উপবেশন।)

বৃন্দা। (শ্রীমতীর নিকটে বসিয়া তাঁহার চিবুকে হাত দিয়া) রাজনন্দিনি! কেন এমন হলি মা! সে মদনমোহন শোভা, সে ভুবনমোহন বেশ, এখন ত তার কিছুই নাই? চাঁদ মুখখানি একেবারে কালী হয়ে গেছে, তুমি সর্ব্বদা কি ভাব? ময়ূরকণ্ঠ দেখ্লে কেন তোমার মন ব্যাকুল হয়? মেঘ দেখ্লে কেন

এক চোখে দশ ধারা বয়; তুমি পীঠের বেণী বুকে রেখে চেয়ে চেয়ে কি দেখ বল? আমরা সখি, আমাদের কাছে মনের কথা ব'লতে লজ্জা কি! তোমার কি হোয়েছে?

রাগিণী বিভাস, তাল—একতালা।

কি কাল ভুজঙ্গে, দংশিল তোর অঙ্গে,
কমলিনী, কেন এমন হলি।
রাধে, না জানি তুই কি গরল খেলি॥
ছিল কি শরীর, কিশোরী তোমার,
এমন সোণার শরীর ভেবে হয় কালী॥
(রাই) শিখিকণ্ঠ হেরে, উৎকণ্ঠা অন্তরে,
জলধরে হেরে আঁখি ভাসে জলে,
নিষেধিলাম তোরে কত, শ্রবণে শুন্‌লিনা তা ত;
আগে, না ভাবিয়ে ভবিষ্যত; যমুনাতে গেলি॥

শ্রীমতী। (বৃন্দার হাত ধরিয়া) না সখি! তা নয়; তবে অনেক ক্ষণ তোদের দেখি নাই, তাই প্রাণ কেমন ক'র্‌ছিল। আর মনে মনে কি যেন ভাব্‌লেম, এখন আর কোন দুঃখ নাই; তোদের মুখ দেখে সব জল হয়ে গেল।

ললিতা। বলি রাই! কাপড়ে কি আগুণ ঢাকে? কতকগুলো গয়না গায় দিলে কি গায়ের দাগ যায়? অলকা দিলে মুখের মেচেতা কি লুকায়? এতক্ষণ তুমি কি গান গাইলে, আবার গাও শুনি? বলি এত লুকোচুরী কাজ কি?

শ্রীমতী। যখন চোকে দেখেছ, তখন মুখেশুনে আর কি করবে? তবে যা হয়েছে বলি, তোমরা সখী তোমাদিগে আর গোপন কি? বিশাখা একখান চিত্র-পট দেখিয়েছিল, একদিন যমুনার ঘাটে গিয়ে দেখি সেই রূপ চিত্রপটের অনুরূপ কিনা, তাই চেয়ে— (অধোমুখ)

ললিতা। (শ্রীমতীর মুখ তুলিয়া) বল, বল, লজ্জা কি? এখানে আর কেহ নাই, আমরা সখী।

শ্রীমতী। তাই চেয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাতে আর আমি নাই। শয়নে স্বপনে এখন সেই রূপ দেখি।

রাগিণী ভৈরবী, তাল একতালা।

হরে প্রাণ মন, সে বাঁকা নয়ন,
ওরে, নন্দনন্দন ত্রিভঙ্গ;

শয়নে স্বপনে, সদা জাগে মনে, মন উচাটন, না মানে বারণ,
শ্যামের প্রীতি-অঙ্গ লাগি, কাঁদে প্রতি অঙ্গ।
দেখ্‌ব না বলিয়া বসন দিলাম ঢাকা,
নীলাম্বরী মাঝে দেখি ঈষদ্ বাঁকা;
ইথে কি লো সই, কুল যায় রাখা,
বুঝি দুকুল ডুবায় অকুল তরঙ্গ॥
সুনীল আকাশে, সে নীলবরণ,
নীলোৎপল দলে দলিত অঞ্জন;
ময়ূরকণ্ঠ আরো উৎকণ্ঠা কারণ,
যথা ফিরাই আঁখি দেখি কাল অঙ্গ॥

বিশাখা। ওমা! এর মধ্যে এত হোয়েছে? তাতো জানিনে? যদি এত হবে, জান্‌তেম্, তবে কি চিত্রপট দেখাই? ভাল করতে গিয়ে মন্দ হ'ল? যা হবার তা ত হ'ল? রাই এখন এ রূপ ভুলে যাও। তোমার ভুল্‌তে ইচ্ছা না থাক্‌লেও (হস্তধারণ পূর্ব্বক) আমি হাতে ধ'রে ভুল্‌তে অনুরোধ করি। কেননা, লোকে আমাকে মন্দ বল্‌বে। এই এখনি বৃন্দে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েনি। সে সখি, বল্‌লই বা; পরে বল্‌লে আর সবে না।

শ্রীমতী। সখি! তুমি বল্‌বে কি? আমি এখন ভুল্‌লে বাঁচি। তা, ভুল্‌তে পারি কৈ? আমি বলি ভুলে যাই, তা ভুলে যাইনে কেন? এ রোগের ওষুধ কি? যদি জানিস্ তবে তোরা বলে দে; আমি ত কিছু জানিনে। ভুল্‌ব বলে প্রতিজ্ঞা করি, কিন্তু তারে ভুল্‌ব কি? সেই আরও ভুলায়, ভুল্‌ব মনে ক'রে মনের মধ্যে এ, ও, তা আনি; ভাবি এইবার ভুলেছি। আবার দেখি মন সে সব ভুলে গিয়ে, যা ভুল্‌তে চাই, তাই মনে মনে জপ ক'র্‌ছে।

রাগিণী মল্লার, তাল আড়া।

ভুলিব কেমনে তারে, বল বল সখি!
নয়ন মুদিলে দেখি, হৃদ্‌কমলে কমল-আঁখি॥
চিত্রপটে যা দেখালি, যমুনায় সেই বনমালী,
অধরে ধরে মুরলী, মনে জাগে মন ভুলবে কি॥
আগে নয়নে পশিল, পরে হৃদে প্রবেশিল,
মন প্রাণ যে ভুলাল, তারে ভোলা যায় কি!

মদন মোহনরূপ, রসকূপ নটভূপ,
অপরূপ শ্যামরূপ নিরবধি নিরখি ॥

বৃন্দা। (শ্রীমতীর প্রতি) বলি রাই! তুমি কুলবতী, তোমার ঘরে শ্বাশুড়ী, ননদী; তারা মানুষ নয় বাঘিনী, নাগিনী। না ভুলে, কি করবে বল? তুমি একদিকে শ্যাম, আর একদিকে কুল, দুই কখন রাখ্‌তে পার্‌বে না, তা যায়ও না; শ্যাম, নয় কুল এ দুয়ের এক ভুল্‌তেই হবে। আমি বলি একটা কাল ছোঁড়ার জন্যে কুল ত্যজে অকূলে যাস্‌নে, পাঁথারে ভাসিস্‌নে, তুফানে ডুবিস্‌নে, ধন মান রূপ যৌবন লোকে কত ভুলে যাচ্ছে, জন্মদাতা পিতা আর বড় ভালবাসার ধন মা, তাও ভুলে যাচ্ছে। কখন আপনাকেও ভুলে যায়। আপনাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাকেও ভুলে থাকে; এমন কি তাঁর নামও করে না। আর তুমি কি সেই কালো ছোঁড়াটাকে ভুল্‌তে পার্‌বে না? অবশ্য পার্‌বে। যদি সে সুন্দর হত, ভাল পোষাক পর্‌ত, তা'হলে ভুলতে দুদিন বিলম্বও হ'তে পারে। ধড়া পরা রাখাল, তাতে আবার কালো, হাতে পাঁচনী, মাথায় পাখীর পাখা, দেখ্‌তে কুৎসিত, আবার একটা বাঁশের বাঁশী বাজায়, সাত চড়ে কথা বেরোয় না, তার জন্যে এত কেন? লক্ষ্মী আমার কথা শুন, ভুলে যাও।

শ্রীমতী। বৃন্দে! ভুল্‌তে বল ভুলে যাই, কিন্তু তাকে কাল ব'লে নিন্দা কর না। আমি সব পারি, তুমি যা বল তা ক'র্‌তে পারি, প্রাণ দিতে বল তাও পারি, কাল ভুল্‌তে বল, না হয় তাও ভুল্‌তে পারি, কিন্তু কাল নিন্দা সইতে পারি না। তুমি যাকে কাল বল্‌ছ, সে কি কাল? না কালশশী? আকাশের চাঁদ বাহিরের আঁধার নষ্ট করে. আর কালাচাঁদ মনের আঁধার নাশে।

রাগিণী বাহার, একতালা।

সখি গো সে কি কাল।
কাল নয় কাল, হরে চিকণ কাল,
মনের কাল নাশি, আমার কালশশী,
হৃদয় মন্দির করে আলো ॥
কাল বল সখি মম দুটি আঁখি, লয়ে কালাচাঁদে তোরা দেখ্ দেখি;
হেরিলে যুবতী, মোহন মূরতি, রাখিতে নারিবে কুলশীল ॥
নিন্দি ইন্দীবর, শ্যাম কলেবর, সদা অনুমত্ত মন মধুকর,
সুধার আধার অধর সুন্দর, মদনের মন হরে লো ॥

বৃন্দে। কাল নয় তবে কি?

শ্রীমতী।— "বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়া ত কোটী কাম,
বদন জিতল কোটি শশী।
ভাঙ্গ ধনু ভঙ্গী ঠাম্ নয়ান কোনে পুরে বাণ,
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥
সই এমন সুন্দর বর কাণ।
হেরিয়ে সে মূরতি, সতী ছাড়ে নিজ পতি,
তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান॥

(নেপথ্যে বংশীস্বরে,—রাই আয়! রাই আয়!)

পটক্ষেপণ।

রাগিনী আলেয়া, তাল কয়ালি।

বাঁশী বাজিল বনে।
মুনির মানস টলে, যমুনা উজান চলে,
ত্রিভুবন মোহিত গানে॥
ছিল মীন গভীর জলে, মুখ তুলি কূলে কূলে,
দলে দলে চলে জলে, আনন্দ মনে।
এমন বাঁশীর গানে, কেমনে বাঁচিবে প্রাণে, কুলবতী কামিনিগণে॥

তৃতীয় উচ্ছ্বাসের গর্ভাঙ্ক।

নেপথ্যে ক্রমাগত বংশীধ্বনি।

শ্রীমতী। (উদ্দেশে বাঁশীর প্রতি) বাঁশি! এত গভীর গরজ কেন? তোমার রবে বনের হরিণী নগরে ধায়, যমুনার জল প্রফুল্ল হ'য়ে উজানে ধায়, মুখ তুলি মৎস্য কূলে কূলে ভেসে বেড়ায়, শুষ্ক তরুলতা মুঞ্জরিত হয়, ত্রিভুবন স্তব্ধ করে, যোগীর ধ্যান ভঙ্গ হয়, যুবতী পতি ছাড়ে; আমি অবলা কেমন করে ধৈর্য্য ধরি বল? আমার কুল গৌরব সকলি গেল; তোর রবে পরশী জাগ্‌ল, ননদীর

ঘুম ভাঙ্গল। আমি এখন কি করি, ঘরে থাকা দায়, বনে যেতেও পারিনে ; শাঁখের করাতের ধারে পোড়েছি, তাই রে বাঁশি ! তোরে বিনয় করি বলি ;—

রাগিণী বেহাগ, তাল একতালা।

ওরে বাঁশী বাজ ধীরে ধীরে, এত কেন গভীর গরজ তোমার।
গভীর রবে গৃহে জাগে, কাল ননদী আমার ॥
গভীর গরজ সম্বর, ক্ষণেক ধৈরয ধর, এলাম বিলম্ব নাই আর ॥
কৃষ্ণ অধর সুধা পানে, গরব বেড়েছে মনে, অনুমত্ত আছ পানে, না কর বিচার ;
বসি গুরুজনের মাঝে, বাজ বাঁশী মরি লাজে, নাম ধরে বেজ না রে আর ॥

শ্রীমতী। বাঁশি ! এত নিষেধ কর্‌লেম, এত বিনয় কর্‌লেম, কিছুই শুন্‌লে না, আমি যত কাঁদি, তুমি ততই বলে বলে বাজ ? ও নিষ্ঠুর ! তোর কি অবলা ব'লে দয়া হয় না ; কুলবধূর কি গঞ্জনা, কি লাঞ্ছনা, তা যদি জান্‌তে তবে আর অমন করে বাজ্‌তে না। জানি রে বাঁশী জানি ! অকূলে যার জন্ম, তার আর কূলের ভয় কি ? তোকে বল্‌লে আর কি হবে। যায় জন্যে তোর এত বল, যে তোর এত গৌরব বৃদ্ধি কর্‌ল, সেই যখন শঠ, তখন তুমি শঠ না হবে কেন ? যেমন দেবতা তার তেম্‌নি বাহন। বলি বাঁশি ! দুধই দৈ হয়, দৈ কি কখন দুধ হোয়ে থাকে ? যার জন্ম অসার বংশে, সে কি কখন সৎ হয় ? ব্যাধ কি কখন হরিণী দেখে দয়া করে ? নীচ বংশের কার্য্য ও পুরুষার্থই পরের সর্ব্বনাশ। নীচ যদি ভাগ্যে সৎ সঙ্গ পায়, তা হ'লেও অসৎ স্বভাব ত্যাগ করে না। শূকর ভগবানের সঙ্গ পেয়ে যখন পুরীষ ভোজন করে, তখন তুমি যে কৃষ্ণ সঙ্গ লাভ করে কুটিল স্বভাব ত্যাগ কর্‌বে, ইহা কি সম্ভব হয় !! বাঁশি ! কৃষ্ণচন্দ্র তোমায় অধরেই রাখুন, আর তুমি অধর সুধাই পান কর, তথাচ তুমি নীচবংশকুলাঙ্গার, তুমি যে কুলবতীর কুল নষ্ট কর্‌বে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি ?

রাগিণী সুম, একতালা।

অকূলে জন্ম যার, কূলের ভয় কি তার ॥
তুই বাঁশী অসার বংশ, নাহি আছে সার ;
অধরে ধরেছেন কৃষ্ণ, সেই গরব তোমার ॥
বাঁশী যদি তোরে পেতাম, স্রুক বুজাইয়া দিতাম,
তখন তুমি বাজতে কিসে, তাই দেখিতাম ;
আদরে অধরে কৃষ্ণ, ধরিবেন না আর ॥

বৃন্দা। রাই, তুই কি পাগল হ'লি, আবল তাবল কি বক্‌ছিস্? ক্ষণেক ধৈর্য্য ধর, এখনও গুরুজন ভাল ক'রে ঘুমায় নি; আগে শ্বাশুড়ী ননদ ঘুমাক, পরে যা হয় তা করিস্। রাজলক্ষ্মী, তুমি সকল বোঝ, তোমায় আর কে বুঝাবে? একটু ধৈর্য্য ধর; একেবারে কুলের গোড়ায় আগুণ দিও না। সোণা ভাইটি ভাল, একটু চুপ কোরে বোসে থাক; যা কর্‌তে হয় আমিই কর্‌ছি।

নেপথ্যে বংশীধ্বনি।

শ্রীমতী। সখি! হরিণী যদি ধৈর্য্য ধরে থাকৃতে পার্‌ত, তবে কি ব্যাধের বাণে প্রাণ দিত? পতঙ্গ যদি ব্যাকুল না হ'ত তবে কি উড়ে গিয়ে আগুণে পুড়্‌ত? মাতঙ্গের যদি জ্ঞান থাকৃত, তবে কি উন্মত্ত হয়ে পাশে বদ্ধ হ'ত? মীন যদি লোভ সম্বরণ কর্‌তে পার্‌ত, তবে কি রস ভোজনে প্রাণ হারাত? তাই বলি সখি! আমি যদি ধৈর্য্য ধর্‌তে পার্‌তেম, তবে কি কুল যেত? বাঁশী আমায় পাগল কর্‌ল! আর যে ঘর ভাল লাগে না? আমি এখন বনে যাই—(গমনোদ্যত)

রাগিণী সিন্ধু, তাল যৎ।

কে যাবি আয় গো তোরা, কৃষ্ণ দরশনে বনে।
লালসা পিপাসা, যদি হয়ে থাকে তোদের মনে॥
কৃষ্ণ কলঙ্কের পশরা, শিরে ধরি সহচরী;
সখী আমি ত চলিলাম বনে, ভূষণ করিয়া অঙ্গে গুরু গঞ্জনে,
যদি কলঙ্কের ভয় থাকে তোদের, আসিস্ না আমার সনে॥

[শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

রাগিণী কালেংড়া, তাল কয়ালী।

যায়, বনে শ্যাম মনোমোহিনী।
চলে রাই, সুধীরে ধীরে ধীরে, চলে গজগামিনী॥
সঙ্গে চলে কুরঙ্গিনী, রাধিকার সঙ্গিনী, কুরঙ্গনয়নী যত ধনি;
প্রেম তরঙ্গে হংসবর-গামিনী; সঙ্গে সমান সমান চলে,
পীঠে দোলে বিনোদ বেণী।

বৃন্দা বলে বন মাঝে, ভৃঙ্গরাজের ভয় আছে,
সখী মাঝে আয় কমলিনী,
আগে গেলে কি পাবি গুণমণি ; প্রবেশিল কুঞ্জবনে রাই কুঞ্জ বিলাসিনী ॥

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

সাধারণ রসোচ্ছ্বাস।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জদ্বার।

চন্দ্রাবলী ও তদীয় সখী পদ্মাবতী দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা।

পদ্মা। চন্দ্রাবলি! কৃষ্ণধন সামান্য ধন নয়, সাধন বিনে কেউ পায় না। চকোরিণীর ইচ্ছামাত্র যদি চন্দ্রের প্রকাশ হ'ত ; চাতকী ডাকিবামাত্র যদি মেঘের উদয় হ'ত ; আর দরিদ্র প্রার্থনা কর্‌লেই যদি স্বর্ণ পে'ত ; তা হ'লে আর ভাবনা কি ছিল? বীণার বাদ্য শিখ্‌তে হ'লেই যখন যত্ন পরিশ্রম ও সাধন ক'র্‌তে হয়, দ্রাক্ষাফলের আশা ক'র্‌লেই যখন ভূমিতে ভাল ক'রে চাষ দিতে হয়, ও সময় অপেক্ষা ক'র্‌তে হয়, তখন তুমি অমূল্য ধন কৃষ্ণধন ইচ্ছামাত্রই পাবে কেন? যতন কর, সাধন কর, বিফল হবে না; অবশ্যই আশা পূর্ণ হবে।

চন্দ্রা। সখি! সাধন ভজন ভিন্ন কিছু হয় না সত্য, কিন্তু দয়াময়ের দয়াতে সবই সম্ভবে। নতুবা পাষাণী মানবী, আর কাষ্ঠতরি স্বর্ণ হবে কেন? আমি সাধারণী, তাই আমায় সাধন করতে বলছ? যদি কৃষ্ণচন্দ্রের দয়া হয়, তবে বিনা সাধনায় সাধারণীও তাঁকে পেতে পারে।

পদ্মা। যদি এতদূর বিশ্বাস হ'য়ে থাকে, এতদূর একান্ত হ'য়ে থাক, তবে উতলা হ'ও না; বাঞ্ছা-কল্পতরু অবশ্যই তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বেন। এই পথই রাধা-কুঞ্জে যাবার; তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাক, আমি একটু এগিয়ে দেখি। তিনি আস্‌ছেন কিনা? [পদ্মাবতীর প্রস্থান।

চন্দ্রা। (কৃষ্ণোদ্দেশে) রাধাবল্লভ! কি ব'লে ডাক্‌তে হয়, ভাব্‌তে হয়, কিরূপে ভ'জতে হয়, কি দিয়া সেবা করতে হয়; তা জানিনে, আমি সাধারণী, যদি দয়াময় নামের গুণে দয়া কর, তবেই কৃতার্থ হই।

(নটবরবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ এবং চন্দ্রাবলীকে বাঁকা-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতপদে গমন। চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণের পীঠবস্ত্র ধারণ।)

রাগিণী পরজ, তাল কয়ালি।

বল, বল হে আমায়।
ভুবন মোহন সাজে রমণী রমণ,
রাখিতে কোন্ রমণীরমন, চলেছ কোথায়॥
বল ওহে মদনমোহন, ব্রজে কে রমণী এমন,
মদনমোহন মন মোহন করে হায়॥
পাষাণী মানবী হয় তোমার কৃপায়,
দয়া করি যদি আমায় রাখ নিজ পায়;
বাসনা ভজনা করি, রসনায় বলিতে নারি;
সাধন হীন সাধারণ নারী, ওহে রসরায়॥

কৃষ্ণ। (হাস্যপূর্ব্বক চন্দ্রাবলীর প্রতি) ধনি! ছাড় আমি যাই।

চন্দ্রা। রাধাবল্লভ! তোমার বাক্য কখন মিথ্যা হয় না; বর্ষার প্রভাবে যেমন বনৌষধের গুণ নষ্ট হয়; সেইরূপ এই সাধারণীর ভাগ্যে কি তোমার কথাও মিথ্যা হবে?

কৃষ্ণ। আমি মিথ্যা বল্‌লেম কিসে?

চন্দ্রা। এই ত বল্‌লে, ধনী বলে ডাক্‌লে? আবার তোমার কথাই তুমি মিথ্যা কর্‌ছ? যার সামান্য ধন আছে, সে কখন ধনী নয়? যার কৃষ্ণধন আছে সেই ধনী। তুমি এই সাধারণীকে তোমায় ভজিবার অধিকার দিয়াই ধনী বলেছ, যদি বাঞ্ছা পূর্ণ না কর, তবে কাজেই কথা মিথ্যা হয়।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, তাই হবে, আজ যাই।

চন্দ্রা। আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে যে ভজে না, সে হতভাগিনী।

রাগিণী আড়ানা বাহার, তাল কয়ালী।

যাই বঁধু যাই ব'ল না।
তোমারে, পেয়েছি হে একা দেখা, সখা যেতে দিব না॥
রস আশে রসরায়, তৃষিত চাতকী প্রায় পাই যন্ত্রণা,
জলধরে দেখা পাই না;
দাসীরে করুণা করি, যদি দেখা দিলে হরি,
যেও না হে পরিহরি, পূর্ণ কর বাসনা॥

কৃষ্ণ। ভক্তি করে ডাক্‌লে আমি চণ্ডালকে দয়া করে থাকি, ভক্তিহীন ব্রাহ্মণেরও নই।

চন্দ্রা। আমি সাধারণী, ভাব ভক্তি জানিনে, কি ব'লে ডাক্‌তে হয় তাও জানিনে ; তবে তোমায় প্রাণবল্লভ বলতে বড় ভালবাসি, তাই প্রাণবল্লভ বলে ডাকি। তোমার দয়া হ'লে নাথ! অন্ধের দৃষ্টিশক্তি, আর বধিরের শ্রবণশক্তি হয়, মূক কথা ব'লতে পারে, পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করে ; তা সাধারণী ধনী হবে, এ আর আশ্চর্য্যকি ?

কৃষ্ণ। (বক্ষে হস্ত দিয়া) উঃ! আমার বুকের মধ্যে কেমন কচ্ছে।

চন্দ্রা। (কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া) এ যে হৃৎকম্প! কার ভয়ে এমন হ'ল নাথ! দাসী রে তা বলতে হবে?

রাগিণী রামকেলী, তাল যৎ।

কারে এত ভয়, রসময়, বল দেখি,
কেন, চকিত হও, দাসীর হৃদে থাকি॥
হইলে ব্যাধের সঙ্গ, ত্রাসিত যেমন কুরঙ্গ,
সেইরূপ কাঁপে অঙ্গ দেখি ; (তোমার)
নিদ্রা নাই নয়ন কমলে, বক্ষস্থল ভাসে জলে
রাধা বলি উঠিছ চমকি॥ (একি)
যদি পোহাইত নিশি, তবে নিশিপতি শশী,
তারা মাঝে বিরাজিত সে কি ; (ওহে)
নিশি প্রভাত হ'লে পরে, মধুভরে সরোবরে,
ফুটিত কমল কমলআঁখি॥ (ওহে)

কৃষ্ণ। ধনি! আর রজনী নাই, বিদায় দাও, আমি যাই।

চন্দ্রা। যে ধন হৃদয়ের ধন, তারে কি বিদায় দেওয়া যায়?

নেপথ্যে—"বহুবল্লভ, বহুবল্লভ" শব্দ।

[দ্রুতপদে শ্রীকৃষ্ণের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

রাগিণী ভৈঁরব, তাল একতালা।

ভয়ে কলেবর, কাঁপে থর থর, নটবর পথে চলে।
যেন প্রভাত শশী অস্তাচলে,
কালশশী রতি চোর, নেত্রে নিদ্রা ঘোর,
চলিতে চরণ টলে॥
ওহে, চন্দন চর্চ্চিত, তাম্বুল রঞ্জিত, সুন্দর অধর ছলে;
অঙ্গ নখর-বিদীর্ণ, সিন্দূরের চিহ্ন, শোভিছে সুনীল ভালে॥
ছিল কৃষ্ণচন্দ্রাধর, বিমল সুন্দর, সুধার আকর, অতি মনোহর;
নাই সুধারাশি, সুমধুর হাসি, কালশশী বদনকমলে।
একে বরণ সুনীল, হইল উজ্জ্বল, নীল বসন নীলে।
নেত্রে দলিত অঞ্জন, কঙ্কন লাঞ্ছন, ভৃগুপদচিহ্নস্থলে॥

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

উৎকণ্ঠা মধুর রসোচ্ছ্বাস।

শ্রীমতীর নিকুঞ্জ।

শ্রীমতী ও সখিগণ আসীনা।

শ্রীমতী। (উৎকণ্ঠান্তরে বৃন্দার প্রতি) সখি! যার আশায় এলেম, যতন করে বাসর সাজালেম, সে কৈ এল? আরত নিশি নাই, ঐ দেখ, পূর্ব্বদিক্ অরুণ হ'ল, কোকিল পিয়ালে, শারীশুক তমালে 'রাই জাগ জাগ' বলে, গান কর্‌ছে, ভ্রমর গুঞ্জে গুঞ্জে কুঞ্জে আস্‌ছে, কুসুম ফুটেছে, মন্দ বাতাসে শরীর শিহরিছে, বুঝি আর রজনী নাই। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ)।

রাগিণী ভৈঁরব, তাল একতাল।

বুঝিলাম সজনি, পোহাল রজনী, এল না চিকণ কাল
গুমরে গুমরে, ভ্রমরা গুঞ্জরে, গাইছে কোকিলকুল॥
ভাস্কর সোহাগে, নব অনুরাগে, নবনব ফুল ফুটিল;
হাসে অরিকুল, হৃদয় আকুল, ফুল শয্যা বাসি হ'ল॥
যার আসা আশে, আসি বনবাসে, বল কোথা সে রহিল;

পথে, পেয়ে নিলমণি, যদি কে রমণী, হার গেঁথে গলে পরিল ;
সহেনা সহেনা, এ ঘোর যাতনা, হৃদয় ফাটিয়া গেল ॥

বৃন্দা। রাজনন্দিনি! আশার ধর্ম্মই আশঙ্কা, তাই ঐরূপ বোধ হচ্ছে। এখনও নিশি পোহায় নাই ? ধৈর্য্য ধর, প্রাণবল্লভ এখনি কুঞ্জে আস্‌বেন।

শ্রীমতী। আর সে নিশি আছে ? (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চক্ষের জল অঞ্চলে মুছিতে মুছিতে বনপাখীর প্রতি) ওরে, শুক শারি! তোরা তমালের উচ্চ ডালে বসে আছিস্, সকলি জানিস্ ? বল শুনি, নিশি আছে, কি পোহাল। ওরে শুক শারি! আর এক কথা জিজ্ঞাসি, তোরা কি কেউ আমার প্রাণবল্লভকে দেখেছিস্ ? যদি দেখে থাকিস্, তবে বল, তিনি কোথায় আছেন ?

রাগিণী রামকেলী, তাল যৎ।

আমায় বল্ রে বল্ ওরে পাখী। কার কুঞ্জে নিশি ভুঞ্জে কমলআঁখি ॥
বঞ্চিয়ে সেই গুরুজনে, যার উদ্দেশে এলাম বনে,
কার কুঞ্জে সে বঙ্কিম আঁখি, (আছে) যদি দেখে থাকিস্ পাখী,
আমায় দেখা আমি দেখি, দেখিয়ে রে জুড়াই মন আঁখি ॥ (আমি)
কৃষ্ণ ব'লে উচ্চস্বরে, পাখী তোরা সবাই ডাক্ রে ;
ডাক্‌লে দেখা দেয় কি না দেখি। (কমল আঁখি)
ডেকে ডেকে মধুর স্বরে, যদি দেখা পাস্ রে তারে,
আমায় দেখাস্ দিস্‌নে রে ফাঁকি ॥ (পাখি)

বৃন্দা। (শ্রীমতীর হস্ত ধরিয়া) ছি! এত কি উতলা হ'তে আছে ? তুমি বোস ; আমি দেখে আসি ? তোমার প্রাণবল্লভ কোথায় আছেন ?

শ্রীমতীর উপবেশন।

রাগিণী কালাংড়া, তাল একতালা।

রাগে রাগে চলে দূতী, নিকুঞ্জ বাহিরে।
দেখে কৃষ্ণ কালশশী, কুঞ্জে এসে ধীরে ধীরে ॥
অলস অবশ অঙ্গ, শ্যাম অঙ্গে কুমকুম রঙ্গ,
দেখে জ্বলে দূতীর অঙ্গ, বাক্য বলে ব্যঙ্গ করে ॥

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

রাই কুঞ্জের দ্বার।

শ্রীকৃষ্ণ ও বৃন্দের প্রবেশ।

বৃন্দা। বলি পূবের চাঁদ পশ্চিমে কেন? না—বল্‌তে ভুল হয়েছে; চাঁদ নয় তুমি শশী! শশী হও আর শশধর হও, যা ইচ্ছা তাই হও। বলি, বলি পথ ভুলেছ কি? কোথা যাচ্ছ?

রাগিণী ললিত, তাল ধামাল।

(কোথা) কালশশী যাও নিশি প্রভাতকালে।
অলসে অবশ অঙ্গ, চলিতে চরণ টলে॥
অরুণিত কমল-নয়ন, হোয়েছে আধ উন্মীলন;
পিযূষ পানেতে যেন, চলিতেছ ঢলে ঢলে॥
হৃদয়ে কঙ্কণ রেখা, ভৃগুচিহ্ন গেছে ঢাকা,
কে দিল সিঁদুর রেখা, ও বদন নীলোৎপলে॥

কৃষ্ণ। বৃন্দে! আমি সূর্য্য পূজা দেখ্‌তে গিয়েছিলেম; তাই পাড়ার মেয়েরা সিঁদুর দিয়ে দিয়েছে।

বৃন্দে। বেশ ক'রেছে? মেয়েরা মেয়ের কপালে সিঁদুর দেয়, তুমি ত মেয়ে নও? বেটা ছেলে কপালে সিঁদুর দিলে চোর হয়; না—কি বল্‌তে কি বল্‌ছি। চোরের আবার চোর হওয়ার ভয় কি? আর শাক দিয়ে মাছ ঢাক্‌লে চলে না। কি করেছ, এখন তাই বল? ও শঠ! তোমার শঠতায় বৃন্দে ভুলে না; তুমি কালশশী, সামান্য শশী নও? আকাশের শশী, তারা সহবাসে যামিনী জাগে; আর তুমি চন্দ্রের আবলি, চন্দ্রাবলী-সহবাসে যামিনী জাগ্‌লে।

রাগিণী ভৈঁরে, তাল একতালা।

বলি বাল বলি, ক'রে বনমালী, বলি নাই এখন বলি।
ওহে কাঁদ কেন [illegible] বলি; এখন নাই হে রাইচন্দ্র,
ওহে কৃষ্ণচন্দ্র, বল বল চন্দ্রাবলী।
তোমার দীক্ষা রাধামন্ত্রে, শিক্ষা বাঁশীযন্ত্রে [illegible] বাধে নাই বলি;
ওহে ছিছি শ্যামরায়, সাধারণীর পায়, দিলে হে সাধনাঞ্জলি।

ওহে, এক চন্দ্র গগনের চন্দ্র, সতত তরাস, রাহু করে গ্রাস,
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার, চন্দ্রাবলী আবার, পূর্ণকলা চন্দ্রাবলী ;
ওহে, একা ঘরে একা, চন্দ্র রেখে সখা, স্থানান্তরে এলে কি বলি ;
রাহু যদি চন্দ্র বলি, গ্রাসে চন্দ্রাবলী, রবে না হে নাগরালী।

কৃষ্ণ। বৃন্দে! তোমার মাথার দিব্যি, আমি রাই বিনে জানিনে, রাই আমার জীবনের জীবন।

বৃন্দা। জান, আর না জান, তা আমি জানিনে ; এখন কুঞ্জে যেতে পাবে না ? বাহিরে থাক, ঠিক হ'য়ে থাক, দেখ, নড় না, তা হ'লেই সর্ব্বনাশ! আমি প্যারিকে দেখে আসি।

[ভিন্ন ভিন্ন দ্বারে বৃন্দা ও কৃষ্ণের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

বিপ্রলব্ধ মধুর রসোচ্ছ্বাস।

শ্রীমতী ও সখিগণ আসীনা।

(বৃন্দার প্রবেশ।)

শ্রীমতী। সখি! আমার প্রাণবল্লভ কৈ ?

বৃন্দা। কুঞ্জের দ্বারে।

শ্রীমতী। কেন আন্‌লে না ?

বৃন্দা। আসিবার যো নাই ?

শ্রীমতী। (ব্যস্তভাবে) কেন কেন বৃন্দে ?

বৃন্দা। তার পরণে নীলাম্বরী, অঙ্গ চন্দনে কুমকুমে চর্চ্চিত, ললাটে সিঁদূরের বিন্দু, বদনে কাজলের রেখা, সর্ব্বাঙ্গে নখাঘাত, বক্ষঃস্থলে কঙ্কণ চিহ্ন, সারানিশি জেগে আঁখি ঢল ঢল, চরণ টল টল, তাই দ্বারে উদয় হ'ল, দূরে রেখে এলেম ?

শ্রীমতী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) আ সখি! বেশ ক'রেছ ? সখি আমায় বল্ ? আর বিলম্ব করিস্‌নে ? কার সহবাসে নিশি জাগ্‌ল ? কে নিশি জাগালে ?

রাগিণী ললিত, তাল আড়া ঠেকা।

কোন কামিনীর সহ, যামিনী পোহাইল।
সখি আমায় বল বল, সে নট নিঠুর কাল ॥
জান কুঞ্জে কুঞ্জে গিয়ে, কার এমন কঠিন হিয়ে,
পরের পরাণ পেয়ে, সারা নিশি জাগাইল ॥
যদি এত সাধ ছিল, তবে কেন না সেবিল,
রতিরঙ্গে শ্যাম অঙ্গে বেদনা দিল ;
তুলসীদল চন্দনে, সেবিতে হয় শঙ্কামনে,
কেমনে এমন ধনে, কঙ্কনে আঘাত করিল ॥

বৃন্দা। আর্ আবার কে, সাধারণি!

শ্রীমতী। সাধারণী আর আবার কে ? আমি জানি, আমি সাধারণী।

বৃন্দা। আর আবার কে ? পেটের ছুরী পেট কেটেছে, চন্দ্রাবলী।

শ্রীমতী। (বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া) ও মা! আমি মলেম ? (অর্দ্ধশয়ন)

রাগিণী ভৈরবী, তাল একতালা।

(সই) দোষ আমার, এ দোষ দিব কার। আপনি করিলাম কাল সঙ্গ,
সে কাল ত্রিভঙ্গ, হইল ভুজঙ্গ, প্রাণ সখি রে, প্রাণে মলেম রে,
কাল দংশিল হৃদয়ে বিষে জ্বলে অঙ্গ ॥
আশ্রয় কর্‌লেম তাই তমাল তরুবরে, ছায়াতে বসিয়ে জুড়াব অন্তরে ;
কে গো মা তাহার ভিতরে, আছে হলাহল গরল তরঙ্গ ॥
যা হবার তা হয়েছে লো সখি, দেখিব না কাল, মুদিত কর্‌লেম আঁখি ;
যে লো কুঞ্জের বাহির করে [illegible] সখি, না থাকে নিকুঞ্জে কাল পাখী ভৃঙ্গ ॥

শ্রীমতী। (সরোষে) সে পাখী কে ? কাল পাখী, আগে ভ্রমর কুঞ্জের বাহির করে দে! আমি আর কাল দেখ্‌ব না ? (নীল শাড়ী বহিয়া) নীল শাড়ী এখনি খণ্ড খণ্ড করে ফেলব ? বল তোরা শ্যামাকে কুঞ্জের বা'র যেতে বল্ ?

শ্যামা। (শ্রীমতীর চরণের নিকট বসিয়া)

কাল ব'লে বিদায় দিলি রাই,
তাতে ক্ষতি নাই, যাই আমি যাই।
একটি কথা ব'লে যাই, বল্ রাই!
সে কালার উপায় কি ক'রবি?

রাগিণী বেহাগ, তাল মধ্যমাণ।

কাল ব'লে বিধুমুখী বিদায় দিলি আমায়।
রাই, আমি যাই যাই, প্রণাম হ'য়ে তোমার পায় ॥
শ্যামাঙ্গী হয় যে রমণী, সামান্যা সে সাধারণী,
তুই যদি ত্যজিলি ধনী, ত্যজিব প্রাণ যমুনায় ॥
আমায় যেন কাল ব'লে, স্থান দিলিনে চরণতলে,
কালমণি নয়নকমলে, তার কি উপায়;
যে কাল তোর হৃদি মাঝে, দিবানিশি প্রবেশি আছে,
সে কাল রাই যাবে কিসে, জলে ধুলে নাহি যায়।

[শ্যামা সখীর প্রস্থান।

(কৃষ্ণের প্রবেশ।)

বস্ত্রে শ্রীমতীর মুখাচ্ছাদন।

শ্রীকৃষ্ণ। রাধে! জয় রাধে! মোরে দয়া কর রাই? যদি অপরাধ ক'রে থাকি, তবু আমি তোমার; তুমি ত্যাগ ক'রলে, নিদয়া হয়ে বিদায় দিলে, তবে আর কোথায় যাব? রাই ত্যাগা ব'লে বৃন্দাবনে কেহ আমায় গ্রহণ করবে না?

তুমি মম ধনপ্রাণ তুমি সে জীবন।
তুমি মম প্রেমগুরু তুমি সে নয়ন ॥

বৃন্দা। (শ্রীমতীর প্রতি) ছি রাই! এত মান ভাল নয়। নারী মান্ করবে, মনের মান মনেই থাকবে; কেউ জান্তেও পাবে না; তোর মান যে সমুদ্র হ'তেও গভীর; গিরি হ'তেও উচ্চ ও ভারি? তোর মান-সমুদ্রে নীলকমল ভেসে বেড়াচ্ছে, দেখে লজ্জা হয় না? কমলিনি! তোমার অঙ্গ স্বর্ণ কমল, নয়ন নীল-কমল, সকলই কমল, তবে হৃদয় কেন এমন কঠিন? কুলধন হ'তে কি তোর মানই সর্ব্বস্ব হ'ল? কালাচাঁদে আর এমন কোরে কাঁদায় লো? দেখে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হোচ্ছে।

রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল মধ্যমান।

চরণ লাগিছে গো চূড়ায়।

রাই, যে ধন জগতের চূড়া, তার চূড়ায় কি পা শোভা পায়॥

দয়া কর ধ্বনি অধরে, নয়নে না জল ধরে;

যে করে শ্যাম গিরি ধরে, সেই করে শ্যাম ধরে তোর পায়॥

মুনিগণ না পায় ধ্যানে, যোগী ভাবে যোগাসনে;

কাঁদাস্ না রাই এমন ধনে, ধনী আম্‌রা ধরি তোর পায়॥

কৃষ্ণ। জলে রাধা স্থলে রাধা, রাধা জাগে মনে॥

গহন কাননে রাধা, রাধা গিরি বনে।

চম্পক দামিনী দামে, রাধা হৃদি মাঝে।

(চূড়া হেলাইয়া।) দেখ রাধা নাম লেখা আছে চূড়া মাঝে॥

কিশোরী! যদি নিতান্তই নিজ দাসে ত্যাগ কর্‌লে, তবে একবার নীলবসন মেঘাবৃত বদনচন্দ্র মুক্ত কোরে আমায় "যাও" বল; ধনি! তোমার সেই সুধাব-ধ্বনি শুনে জন্মের মত যাই। প্যারি! আমি যাই, যাবার সময় একবার হেসে কথা বল? দন্ত কৌমুদীর সুধাপানে আমার তাপিত মন চকোর শীতল হোক্? না হয় পদ তাড়না কর, কমল চরণের আঘাতে হৃদয় শীতল হোক্?

রাগিণী বিভাস, তাল একতালা।

(জয়) রাধে বদসি যদি কিঞ্চিত।

নীলাঞ্চল আবৃত বচনামৃত, মুখে যাও বল, যাই জন্মের মত॥

জীবনের জীবন মন প্রাণ রাই, তোমা বিনে আমার আর কেহ নাই;

তুমি দিলে বিদায়, যাব আর কোথায়, (রাধে হে)

আমি চিরদিন তোমার চরণ আশ্রিত॥

তোমা ভিন্ন প্যারী অন্য কার নই, তোমার জন্য আমি নন্দের বাধা বই;

শিক্ষা বাঁশীযন্ত্রে, দীক্ষা রাধা মন্ত্রে, (রাধে হে,)

আমি দাসানুদাস চির অনুগত॥

কৃষ্ণ। যদি রাই! দয়া কর্‌লে না, বঁধু ব'লে চাইলে না, তবে যাই জন্মের মত যাই, রাধা যে মুখ দেখে না, সে মুখ আর দেখাব না, অপরাধী হ'লেম রাধা যে দেহ স্পর্শ করে না, সে দেহ আর রাখ্‌ব না, এখনি যমুনায় বিসর্জন দিব। (বাঁশী প্রতি) ওরে বাঁশি! ওরে রাধামন্ত্রে দীক্ষিত বাঁশি! রাই আমায় ত্যাগ কর্‌লেন ব'লে

তুমিও কি আমায় ত্যাগ করবে? বাঁশি! একবার বাজ? রাধা ব'লে বাজ! সুধামাখা রাধা নাম শ্রবণ ক'রে তাপিত প্রাণ শীতল করি। ও বাঁশি! কৈ বাজ্‌লে না? রাই ত্যাগ কর্‌ল ব'লে, তুমিও কি আমায় ত্যাগ করলে?

[বাঁশী ধূলায় ফেলিয়া প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

রাগিণী রামকেলী, তাল একতালা।

যায়, নিকুঞ্জ বাহিরে নিকুঞ্জবিহারী।
(চরণ) চলিতে না চলে, রাধা বক্ষঃস্থলে,
নীলাঞ্চলে নিবারে নয়নবারি॥
চলে ধীরে ধীরে, ফিরে ফিরে চায়,
ভাবে রাই বুঝি ডাকিল আমায়, ফিরে চায়,
(ঐ যে) অবসাদে হায়, ধরণী লুটায়, বংশীধর দূরে ফেলিয়া বাঁশরী॥
নিদয়া হইয়া বিদায় দিলেন রাই, তবু ধ্বনি শ্যামমুখে ধনী রাই,
(বলেন) তোমা বিনে রাই, কেহ আমার নাই,
নিজ জনে দয়া কর গো কিশোরী॥

সপ্তম উচ্ছ্বাস

কলহান্তরিতা মধুর রসোচ্ছ্বাস।

কুঞ্জবনে শ্রীমতী।

(নেপথ্যে আবা, আবা, বাঁশী ও শিঙ্গাধ্বনি।)

বিশখা। (শ্রীমতির প্রতি) কমলিনি! তোমার প্রাণবল্লভ গোষ্ঠে যাচ্ছেন।

শ্রীমতি! সখি, ও নিঠুর কথা আমার ব'ল না। যদি বল, তবে এখনি গরল পান করে জীবনত্যাগ করব?

বিশখা। প্যারি! নারী মান্ ক'রবে, বিদ্যুৎ চকিতের ন্যায় মনের মান মনেই থাকবে, কেউ টেরও পাবে না। তোর মান্ যে গিরি হ'তেও ভারি? যে

রমণী মান করে, নাগরে সাধায়, কাঁদায়, আবার পায়ে ধরায়, ধিক্ তার মানে! ধিক্ তার প্রাণে! তুই মান সাগরে সাধের নীলকমল ভাসিয়ে দিয়ে, কোন্ প্রাণে গৃহে ব'সে আছিস্? যা ক'রেছিস্ সেই যথেষ্ঠ হয়েছে? এখন মানে ক্ষান্ত দে।

রাগিণী অহং, তাল একতালা।

ছি ছি! ধিক্ লো রাই, এমন মান দেখি নাই,
মানে তুই মানিক হারালি॥
বলি ও কিশোরী, সাধের কৃষ্ণধন হয় অমূল্য নিধি;
তারে তুচ্ছ মানের কারণ বিদায় দিলি॥
তোর, মনে প্রাণে ধিক্, ধিক্ মানে ধিক্, মানীর মান তুই না রাখিলি,
বলি ও কিশোরী, সাধের কৃষ্ণ ধন হয় অমূল্যনিধি;
তারে চরণতলে রেখে কাঁদাইলি॥
মাধব চরণে ধরিল, সেধে কেঁদে গেল,
নিদয় হয়ে ফিরে না চাহিলি;
বলি ও কিশোরী, মান লয়ে থাক, আমরা চল্লেম সবাই;
সবে যাই তথা যথা বনমালী॥

শ্রীমতী। (ক্রন্দন স্বরে) বিশখা! তোরা সবাই যাবি যা, কারে দোষ দিব, সকলি কর্ম্মের দোষ। বিশখা তুই ত চিত্রপটে ঐ কাল ভুজঙ্গের রূপ দেখিয়েছিলি, কাজেই তুই প্রেমের গুরু, নটের গুরু, মানের গুরু; আবার তুই অমন করিস্ কেন? আমার প্রাণ যে জ্বলে গেল, হিয়ে যে ফেটে গেল, আমি কার কাছে কাঁদ্‌ব, কার কাছে ব'ল্‌ব? আমার এমন ব্যথার ব্যথিত কে আছে? তোরা ত সকলেই পর হ'লি? (বৃন্দার প্রতি) বৃন্দে! তুমিও কি যাবে? তুমিও কি আমায় নিদয় হবে? তা হ'লে আর এ অভাগীর দাঁড়াবার স্থান কৈ? একে কাল ভুজঙ্গের বিষে আমার অঙ্গ জ্বলে গেল, তার পর যদি তোরা জ্বালার উপর জ্বালা দিস্, তবে আর কোথায় যাব? গরল খাব, না হয়, যমুনায় গিয়ে এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।

রাগিণী অহং, তাল একতালা।

দাও আর, কত বার, বারে বার গঞ্জনা।
ও তাই বলি গো দূতী, আমার কৃষ্ণ গেল, আবার তোরাও যাবি;
এই অভাগীর ভাগ্যেতে কেউ আপন হ'ল না॥

সখী, আমি যার লাগি, হ'লেম সর্ব্বত্যাগী,
দুখের ভাগী আমার সে হ'ল না ;
ও তাই বলি গো দূতী ; মরম বেদনায় আমি মলেম মলেম ;
দিয়া মন প্রাণ আমি, শ্যামের মন পেলেম না ॥
সখি, জটিলে বাঘিনী, কুটিলে নাগিনী, দিবারাত্রি দেয় গঞ্জনা ;
ও তাই বলি গো দূতী, ঘরে পরে সবাই বৈরী আমার ;
আমি গরল খাব সখি, এ প্রাণ আর রাখ্‌ব না ॥

বৃন্দা। (সখীগণের প্রতি) কে রাইকে এমন ক'রে কাঁদালে ? একে কাটা ঘা, তার পর আবার নুণের ছিটে। শ্রীমতীর দোষ কি ? সেই নিঠুর কালা, আশা দিয়ে বাঁশী বাজিয়ে, মন উদাস্ ক'র্‌ল, কুলের বৌ কুললজ্জা ত্যাগ ক'রে, গুরুজনকে বঞ্চনা ক'রে, ঘোর নিশিতে এসে বাসব সাজাল, সারানিশি জাগ্‌ল, কাঁদ্‌ল, তথাচ সে নিঠুর এল না ? বঞ্চনা ক'রে অন্যের কুঞ্জে নিশি বাস করল ? তা প্যারি মান ক'রেছে, বেশ ক'রেছে। যার এমন কর্ম্ম. কেন সে সাধ্‌বে না, সে কাঁদ্‌বে না, আবার সাধ্‌তে হবে, কাঁদ্‌তে হবে, এখনই হোয়েছে কি ? আবার পায় ধর্‌তে হবে ? (শ্রীমতীর প্রতি) ধনি ! তুই থাক্, ঘরে ব'সে থাক্, আবার এসে সাধ্‌বে। যাবে কোথা ? রাইত্যাগীর কি আর স্থান আছে ?

শ্রীমতী। সখি ! আর আমার মান নাই। আমি না বুঝে ভাল কাজ করি নাই ? প্রাণবল্লভকে বিদায় দিয়েছি, এখন প্রাণ যে কেমন করে। সেই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা নীরদ তনু না দেখে আমার হিয়া ফেটে গেল ; আর সহে না। সখি ! আমি যেন মান ক'রেছিলাম, তোরা কেন তাকে যেতে দিলি। (ক্রন্দন স্বরে) হা ! দূতি ! আমার যে হৃদয় বিদীর্ণ হ'ল, একবার তারে এনে দেখা। তো বিনে কে মরম জানে. আমার আর কে আছে, কারে বল্‌ব মা ?

রাগিণী বিভাস, তাল একতালা।

মম, প্রাণবল্লভ কোথায়, দূতী আমায় বল না।
সখি, প্রাণবল্লভ গেল মম, প্রাণ কেন গেল না।
সখি, হৃদয় কঠিন মম, সহে না যাতনা ॥

বৃন্দা। কাঁদিস্‌নে রাই ! তোর চোকের জল আর দেখা যায় না। যা বটে, বংশীবটে, গোঠে, মাঠে, যমুনাতটে, তোর প্রাণবল্লভ যেখানে থাকে, আমি এনে দিব ; এই চল্‌লেম ?

বৃন্দার প্রস্থান।

রাগিণী কাল্যাংড়া, তাল কয়ালি।

রস রঙ্গে, চলে রসরঙ্গিণী।
আনন্দে, গোবিন্দে আনিতে, বৃন্দে সহচরী চতুরিণী॥
যমুনার তটে মাঠে, যাবটে আর বংশীবটে,
নিকটে সুদূরে ভ্রমে ধনী ; না পায় রাধার হৃদয়মণি ;
পেলাম না বলিয়া দূতীর চক্ষে ধারা বয় অমনি॥
গিরি গোবর্দ্ধন বন, শ্যামকুণ্ড করি ভ্রমণ,
পরে দেখে কুঞ্জে যেতে ফিরে, রাধাবল্লভ রাধাকুণ্ড তীরে ;
রাধা ব'লে নয়ন নীরে ভাসিছে বদনখানি॥

রাধাকৃষ্ণের মিলন।

রাগিণী ভৈরব, তাল পঞ্চম সোয়ারি।

দাঁড়াইল শ্যামের বামে, রাই শ্যামসোহাগিনী।
নবীন নীরদে-যেন শোভা করে দামিনী॥
পলক পুলকে টলে যুগল তনুখানি ;
যুগল পুলকে নাচে সহচরী গোপিনী॥

সমাপ্ত।

ফিকিরচাঁদের

বাউল সঙ্গীত।

সত্যপথ।

ভাব মন দিবানিশি, অবিনাশি,
সত্যপথের সেই ভাবনা।
যে পথে চোর ডাকাতে, কোন মতে, ছোবে না রে সোনাদানা;
সেই পথে মন সাধে, চল রে পাগল, ছাড় ছাড় রে ছলনা।
সংসারের বাঁকা পথে, দিনে রেতে, চোর ডাকাতে দেয় যাতনা;
দেখ্ আবার ছয়টী চোরে, ঘুরে ফিরে, নেয় রে কেড়ে সব সাধনা।
কখন ঝড় বাতাসে, উড়ে এসে, জুড়ে বসে ঘোর ভাবনা;
পরাণে সয় এত কি, ঘোর পাতকী, সহে যেন যম যাতনা।
ফিকিরচাঁদ ফকীর কয় তাই, কি কর ভাই, মিছামিছি পর ভাবনা;
চল যাই সত্যপথে, কোন মতে, এ যাতনা আর রবে না।

ভাবি দিন কি ভয়ঙ্কর, ভেবে একবার
দেখ্ রে আমার মন পামরা।
আত্মীয় ডাক্তার বদ্দি, নিরবধি, ঔষধ আদি দেবে তারা;
যখন তোর হাত ধরিতে তর্জ্জনিতে, না করিবে নড়াচড়া।
যখন তোর সবশ অঙ্গ, অবশ হ'য়ে, প'ড়ে রবে ধ'রে ধরা;
যখন তোর আত্মলোকে, ডেকে ডুকে, না পাইবে কথার সাড়া।
যে গলার মধুর স্বরে, জগতে রে মাতাস্ ওরে 'ঘাটে পড়া;'
তখন তোর সেই স্বরেতে, রব করিবে, থেকে থেকে ঘড়াৎঘড়া।
তাই বলি যাই দেখি চল্, সত্যপথে নিত্য নগরেতে মোরা;
শুনেছি সেই ধামেতে, এই রূপেতে, মরে নারে মানুষ যারা।

দেখ্ দেখি ভেবে ভবে, কেবা রবে,
যে দিনে সে তলব দেবে।
কোথা তোর রবে বাড়ী, টাকা কড়ি, জুড়ি গাড়ি কে হাঁকাবে;
বল্ দেখি চেন্ ঝুলান, ঘড়ি তোমার, সেই দিনেতে কে পরিবে।
কোথা তোর রবে মালা, কোপ্নী ঝোলা, যে দিনে তোমায় বাঁধিবে;
তার কাছে ছাপাবার জো, নাই রে যাদু, ছাপা দিয়ে যে ছাপাবে।
ফিকিরচাঁদ ফকীর কয়, তা হবার নয়, ঘুস দিয়ে কাজ হাসিল হবে;
বিপদে তর্‌বি যদি, নিরবধি, সেবি'গে চল সত্যদেবে।

আত্ম-শিক্ষা।

ভোলা মন কি করিতে করিলি,
সুধা ব'লে গরল খেলি।
সংসারে সোণার খণি, পরশমণি, রতনমণি না চিনিলি;
কি বলে অবহেলে, সোণা ফেলে, আঁচলে কাঁচ বেঁধে নিলি।
আসিয়ে ভবের হাটে, বেড়াস ছুটে, লোভের মুটে তুই কেবলি;
না বুঝে তেতো মিঠে, ঘুঁটে ঘুঁটে, ভেবে মিঠে মিঠে নিলি।
না বুঝে ভাল মন্দ, এমনি ধন্দ, সাপের ফন্দ গলায় দিলি;
পাশরি পরমার্থ, পুরুষত্ব, তুচ্ছ প্রেমে মজে র'লি।
ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে, গেলি ভুলে, যা করিতে ভবে এলি;
এ জগৎ চিন্তামণি, আছেন তাঁয় না চিনে মাটী হলি।

আছে কি কোন ঠিক তার, কখন তোমার,
নথি উঠে পেস্ হইবে।
কিবা রাত কি সকালে, সাঁজ বিকালে, যে কালে সে মন করিবে;
তখনি নথি ধ'রে, অবোধ তোরে, জব দিতে রে তলব দেবে।
সে তলব-চিঠি লয়ে, হুকুম পেয়ে, যখন ধেয়ে দূত আসিবে;
তখন তোর আত্ম স্বজন, স্ত্রী পরিজন, ক'রে যতন কে ঠেকাবে।
যখন সেই আদালতে জজের হাতে, অবোধ রে তোর বিচার হবে;
তখন তোর স্বপক্ষেতে, সাক্ষী দিতে, ঝুট কথা কে বলিবে?

যাদের তুই ভেবে আপন, করিস যতন, তারা আপন না হইবে ;
দেখিস্ তোর বিপক্ষেতে, ছয় সাক্ষীতে, তাঁর সাক্ষাতে সাক্ষী দেবে।
যাদের তুই হেলা করিস, দেখ্‌তে নারিস্, দেখিস্ রে বিষ শত্রু ভেবে ;
হয় ত তার কেহ যেয়ে, তোমার হ'য়ে, ছুট কথা তাঁয় বলিবে।
ফিকিরচাঁদ বলে তোরে, তৈয়ার হ' রে, কি ব'লে জব তখন দেবে ;
হলে জব খেচা নেচা, সাক্ষী কাঁচা, পেয়ে সাজা ম্যাদে যাবে।

সেই দিনে তুই, কি করিবি রে,
ওরে ,মন, বল শুনি তাই আমারে।
যে দিন এসে শমনের চয়ে,
তোর, বসে শিরে, কেশে ধরে, টান্‌বে রে জোরে ; (ভোলা মন)
তখন বন্ধুগণে, দেখে শুনে থোবে এনে বাহিরে।
ওরে, বাতাসে প্রাণ বাতাস মিশিলে,
যাদের ভেবে আপন করিস্ যতন, তারাই সকলে ; (ভোলা মন)
দিয়ে কল্‌সী কাচা, বাঁশের মাচা, বিদায় দেবে তোরে রে।
ওরে মাটীর শরীর, হ'লে রে মাটী,
কোথায় পড়ে রবে তোমার, এ সব ঘরবাটী ;
এত কর্‌ছিস্ যতন, যে ধনে মন, সে ধন তোর না হবে রে।
ফকীর ফিকিরচাঁদ কয়, ভয় রে মন,
সদর হতে খাড়া তলব, আস্‌বে রে যখন ;
ভেবে দেখ্ রে তাই, কি ব'লে ভাই, তখন নিকাশ দিবি রে।

ওরে মন ! সদাই পরে, কি শিখাও রে,
নিজে কেন তা শিখ না ?
তুমি যে বড় গুণী, তাও তো জানি, আপরার ওজন বোঝ না ;
কেবল অবিদ্যা ঘোরে, বেড়াও ঘুরে, বিদ্যাধনে চিনিলে না।
বুঝাচ্ছ পরকে লয়ে, কত কয়ে, দেখাইয়ে গুণীপনা ;
কোন বুঝ নাই রে তোমার, কিসে আপনার, ভাল হবে তাও বুঝ না
ভাবিছ আপনার মত, জ্ঞানী এত, জগতে নাই কোন জনা ;
দেখা যায় জ্ঞানে যারে, হৃদ্ মাঝারে, তারতত্ত্ব কিছু জাননা ॥

অবিদ্যা অজ্ঞানে মন, ভুলে এখন, আপনার গুণ রটাও না;
ফিকিরচাঁদ কেঁদে বলে, দীন দয়ালে, প্রেম করিতে শিখে নেনা॥

কার হিসাব লিখ্‌ছিস্ বোসে, মনের খোষে,
আপ্‌নার কায মুলতুবি রেখে।
ওরে তোর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে,
পরের চোকে দেখ্‌ছিস চোখে;
তবু তুই, পরের বেঠিক, করছিস রে ঠিক,
আপনার বেঠিক ঠিক না দেখে।
লিখ্‌ছিস পরের বাকী জায়, আপনার দিন যায়,
তোর ঠিকানা নাই সে দিকে;
পাগলেও আপনার ভাল, বোঝে ভাল,
আপনার ভাল না বোঝে কে।
শুনেছি লোকে শিখে, লোকে দেখে,
হাবা লোকে ঠেকে শিখে;
নিকেশে ঠেক্‌বি যে দিন, বুঝ্‌বি সে দিন,
স'রবে না তোর বাক্য মুখে।
ফিকিরচাঁদ, ফকীর বলে খেদে, দিন থাকিতে,
আপনার হিসাব নে রে দেখে;
যদি রে থাকে বেঠিক, কর তা ঠিক;
তবেই নিকাশ দিবি সুখে।

কতকাল আর ঘুমাবে বল,
ওরে মন জেগে দেখ দিন গেল।
ওরে দিন ফুরাল, সন্ধ্যা হ'ল, অন্ধকারে ঢাকিল॥
দর দালানে কপাট দিয়েছ,
ওরে আপনার ঘর যে খোলা আছে, তা না দেখিছ; (ভোলা মন)
কত বদ্‌মাইসে, মনের খোষে, তোর ঘরে যে ঢুকিল।
দেখে তোর ঘুমের ঘোর ভারি,
কত চোর ডাকাতে ঘরে ঢুকে ক'চ্ছেরে চুরি; (ভোলা মন)

যত ছিল রতন, সোণার ভূষণ, মনের মতন হরিল।
ফিকিরচাঁদ ফকীর কয় তোমার,
ওরে জেগে জুগে ব'সে থাক, হ'য়ে হুঁসিয়ার ; (ভোলা মন)
কেবল জ্ঞান হাতিয়ার, সকল চোরার, দমন করার কৌশল।

বসিয়ে মন বিচারাসনে,
করিছ পরের বিচার খোস মনে।
কোন মতে পরের দোষ পেলে,
আইন ধ'রে, বিচার ক'রে, দিচ্ছ তায় জেলে ; (ভোলা মন)
নিজে কত দোষে, হ'চ্ছ দোষী, দেখ না তা নয়নে।
তোমার কাছে চোর ধ'রে দিলে,
তারে কত মতে দিচ্ছ সাজা আইনের বলে ; (ভোলা মন)
কিন্তু দেখ্‌ছ নারে, তোমার ঘরে, চুরি করে ছয় জনে।
ফিকিরচাঁদ কয়, পড়ে ফাঁপরে,
আমি আপন জ্বালায় জ্বলে মরি, দোষ দিব কারে ; (ভোলা মন)
এখন দীন-দয়ালের, দয়া বিনে, কোন উপায় দেখিনে।

ত্যজিয়ে আসল যে ধন, কেন রে মন
সুদের কারণ টানাটানি।
আসলে ত্যজ্য করে, সুদকে ধরে, বড় মূর্খ সেই ত জানি ;
সুদকে ত্যজ্য কর, আসল ধর, থাকিবে ঠিক মহাজনী।
জান না আসল হ'তে, এ জগতে, যত সুদের আমদানী ;
তবে কেন আসল ত্যজে সুদকে ভজে, বেড়াও করিয়ে পাগলামী।
গোপনে যতনে, আসল ধনে, রাখে যে সেই আসল ধনী ;
আসলে সুদের কড়ি, ডা'ল খিচড়ী, মিশালে হয়, বলে জ্ঞানী।
সাগ্‌রেত ফিকিরচাঁদ বলে, আসল পেলে, ভব জ্বালা ঘোচে জানি ;
আমি সেই আসল ধনে, নাহি চিনে, করিতে যাই মহাজনী।

ওরে মন কি বলিয়ে, ভবে এলে,
কি করিতে কি করিলে।
পেয়ে এই সংসার অর্থ, পরমতত্ত্ব, পরমার্থ পাসরিলে ;
এই সংসার সোহাগার সোহাগাতে, সোণা হ'য়ে গলে গেলে।
নানারূপ বিদ্যা শিখে, গেলে ব'কে, চোখে মায়াঠুলী দিলে ;
এখন বলদেব মত অবিরত, ঘুরে বেড়াও গাছ-জোঙ্গালে।
তুমি যে পুরুষ রতন, হ'য়ে রে মন, স্বাধীনতা ধন খোয়ালে ;
অবিদ্যা নেশার ঘোরে, ইচ্ছা ক'রে, মায়াবেড়ী পায়ে দিলে।
কাঙ্গাল কয়, মাটির দেহ মাটি হবে, মন তুমি তা না ভাবিলে ;
যদি রে মাটি হবে, আগে তবে, কেন না মন মাটি হ'লে।

তোর মত মন বেহায়া ত আর দেখিনে।
বুঝাইলেও তুই বুঝ মানিস্ নে।
নাচে সংসারের লোকে, বিদ্যার আলোকে, জ্ঞানের পুলকে ধনে জনে ;
তুই, অবিদ্যা আঁধারে, অজ্ঞানের ঘোরে, নেচে বেড়াস্ সদা বোঁচা কাণে।
তোর ঘরের মাথা নেড়া, ফুটো সকল বেড়া,
তবু মেজাজ টেরা তুই ছাড়িস্ নে ;
তোর বাহিরের দর্শন, কোঁচার পত্তন, ছুঁচো করে কীর্ত্তন নিশি দিনে।
ওরে কাঙ্গাল কয় এখন, মনের ভাব গোপন, যে করে সে চতুর এ ভুবনে
যে জন মনের কথা কয়, সে ত পাগল হয়, যা বলেছি এখন আর বলি নে।

ওরে মোর মন ভ্রমরা, শেষ কি করা,
আগে কেন না ভাবিলে।
তুমি, জ্ঞানপদ্ম ফেলে, উড়ে এলে, ব'সলে সংসার কেওয়া ফুলে !
লেগে বিষয়ের ধূলি অন্ধ হলি, কেটে মর করাত-জ্বালে।
এ সংসার কেয়ার করাত, শাঁকের করাত, আগে ডানা কেটে ফেলে ;
শেষে যেতেও কাটে, আস্‌তেও কাটে, দাঁত বাধিয়ে বক্ষঃস্থলে।
জ্ঞান কমল নয় যে সুধু, ভক্তি মধু, আছে রে তার দলে দলে ;
যদি তা করতে রে পান, জুড়াত প্রাণ, প্রাণ পেতে রে পরকালে।

কাঙ্গাল কয় ভ্রমর হ'য়ে, জ্ঞান হারায়ে, মা চিনিলাম নিত্য ফুলে।
তাইতে ফুলে ফুলে, ভ্রমণ করি, ভুলে মরি কর্ম্মফলে॥

মন রে প্রতিক্ষণে হচ্ছে আয়ুঃক্ষয়;
বুঝালে যে বুঝ মান না, তাইতে বড় দুঃখ হয়।
মাতৃগর্ভে হেট মুণ্ডে ছিলি, পরে শিশুকালে ধূলা খেলে কাল কাটাইলি;
লয়ে খেলার সাথী দিবারাতি রে; তুই কাটালি বাল্য সময়। (ও রে)
বিদ্যালয়ে যৌবন কাটালি, পরে ছেলের বাবা হ'য়ে হাবা, ঘরে বসিলি,
এখন "নাও মুড়ি দিয়ে লাঙ্গল বও না রে;"
এখন নাই রে আর তোর সে সময়॥
ফিকিরচাঁদ কয় মনরে তোমাকে,
তুমি পরের আলোক দিচ্ছ, নিজে আঁধারে থেকে;
তুমি নিজে যে প্রদীপের গাছা রে;
কিসে দেখ্‌বে নিত্য জ্যোতির্ম্ময়। (ও রে)

বল কে চিনিবে আর, মন রে তোমার,
মনের মাঝে রোগের হাঁড়ি।
চিনিবে কার সাধ্য, ডাক্তার বৈদ্য,
হদ্দ হ'ল টিপে নাড়ী।
তুমি যে সাধুর গান গাও, জগৎ মাতাও,
উপদেশ দেও নেড়ে দাড়ি;
তোমার, আপন বেলায় মহাপ্রসাদ, পরের বেলায় ভাতের কাঁড়ি।
তুমি এই রোগের জ্বালায়, জ্ব'লছ সদায়,
দেখে লোকের টাকা কড়ি;
তোমার এ জ্বরবিকারে, বৈদ্য ঘোরে,
ভেবে মরে কি দেবে বড়ি।
কাঙ্গাল কয়, হও রে দৃঢ়, ছাড় ছাড়,
কুপথ্য মিথ্যা ছলচাতুরী;
এ রোগের জ্বালা যাবে, প্রাণ জুড়াবে,
খাও রে হরিনামের বড়ি।

মন না হ'লে সোজা, ফকীর সাজা,
কেবল রে তার বিড়ম্বনা।
ফকীরের সজ্জা ধরে, নৃত্য ক'রে ;
করছ ধর্ম্মের আলোচনা ;
তুমি যে আপন কাজে, বেঠিক নিজে,
পরকে কি বোঝাও বল না।
তুমি যে কত গান গাও, পরকে বুঝাও,
নিজে কেন তা বুঝ না ;
নিজে না বুঝ্‌লে পরে, অন্য পরে,
বুঝ্‌বে কেন তা ভাব না।
কাঙ্গাল কয় যুক্তিধর, ভাল কর,
ভাল হও রে সর্ব্বজনা।
নিজে না হ'লে ভাল, পরকে ভাল,
কর্‌বে ভাল, তা হবে না।

কার চোখে দিচ্ছ ধূলি, চতুরালি,
ক'রে রে মন তাই বল না।
সে যে হয় জগৎকর্ত্তা, বিচারকর্ত্তা,
অন্তর্য্যামী তা জান না ;
সে যে তোর হৃদে জাগে, মনের আগে,
দেখে রে সে সব ঘটনা।
সে যে হয় মনেরই মন, যার যেমন মন,
সকলি তাঁর আছে জানা ;
ওরে যার মন নয় সোজা, আঁখি বোঁজা,
কেবল রে তার বিড়ম্বনা।
তুমি এই ভবে এসে, লোভের বশে,
যখন কর যে ছলনা ;
সে ত রে সব দেখেছে, তার কাছে রে,
ছাপালে ছাপা থাকে না।

আলোক আর আঁধারে স্থান, দেখে সমান,
সে ত নয় রে ড্যারাকানা;
তার চোখে ধূলা দিয়ে, ছাপাইয়ে,
যাবে সেরে তা হবে না।
কাঙ্গাল কয় যা ভেবেছি, যা ক'রেছি,
সব জেনেছে সেই একজনা;
ভেবে আর নাই রে উপায়, সব অনুপায়,
দয়াময়ের দয়া বিনা।

কার চোখে ধূলা দিবি, বল আমার কাছে।
যে জন জগৎহর্ত্তা, বিচারকর্ত্তা,
সে আছে তোর হৃদয় মাঝে।
আঁধারে আলোকে মন, তুমি যে কায ক'রেছ যখন;
সকল দেখেছে সে জন, তার কাছে কি ছাপা আছে।
মনে যা ক'রেছ রে মন, হৃদে ব'সে দেখে সে জন;
সে যে তোর মনের মন, মন রে তোর মন বোঝে।
কাঙ্গাল বলে মন যার বাঁকা, মিছে তার চোক বুঁজে থাকা,
ঝোলা মালা ছাপা মাথা, ঘি ঢালা হয় ভস্মের মাঝে।

ম'জে তুই হরিনামে, মাতি প্রেমে,
কেন না মন সং সাজিলি।
মন রে সংসারে এসে, হেসে হেসে,
আগে কেশে কালী দিলি;
ওরে মন বয়সদোষে, রসে রসে,
অবশেষে চুণ মাখিলি।
হরিনামে সাজ্‌লে রে সং, ফির্‌ত না ঢং,
থাকৃত এক রং চিরকালই;
এখন তোর কতক রাঙ্গা, কতক পাঙ্গা.
ঠিক যেন মাচরাঙ্গা হ'লি।

যাবি তুই লেংঠা হ'য়ে, লজ্জা খেয়ে,
লেংঠা হ'য়ে যেমন এলি ;
ওরে তোর কোপ্‌নী কোঁচা, জামা মোজা,
ঘোলে গোঁজা হয় সকলি।
কাঙ্গাল কয় প্রেমভরে, সং সাজ রে,
গান কর রে বাহু তুলি ;
যাদের নাই হরিভজন, সত্য কথন,
তারাই রে সং হয় কেবলি।

কারে তুই দেখে রে সং, বল্‌ দেখি মন,
হাসিস্‌ এমন হা হা কোরে।
সংসারের প্রথমেই সং, ভেবে দেখ মন,
সংসারে সং ছাড়া নাই রে ;
কেহ বা সংসার ত্যজে, সং সাজে রে,
সংসারে কেউ সং সাজে রে।
ভূমিষ্ঠ হ'লি যখন, তখনি সং
সাজিলি মন ভেবে দেখ্‌ রে ;
করিলি কত খেলা, শিশু বেলা,
মেখে ধূলা সব শরীরে।
*যৌবনে ঘোর সংসারি, মায়া বেড়ি,
পায়ে পরি বেড়াস্‌ ঘুরে ;
আবার তোর একি সাজা, পরের বোঝা,
বোস্‌ রে সদা লয়ে শিরে।
ভেবে দেখ অতি তুচ্ছ, পর কুচ্ছ,
মল আছে তোর মুখেতে রে,
কলঙ্ক কালী তোমার গালে আবার,
দেখ একবার আয়না ধ'রে।
শেষের দিন আসবে যখন, বাঁধবে শমন,
তখন আত্ম স্বজনে রে ;

মাচাতে বেঁধে লয়ে, কলসী দিয়ে,
সং সাজিয়ে দেবে তোরে।
ফিকিরচাঁদ ফকীর ভনে, জ্ঞান সাবানে,
মন তোর ময়লা ছাপাই কর রে;
তবে তুই বুঝবি রে সার, সর্ব্বত্র যার,
সমান দৃষ্টি মানুষ সে রে॥

দিন ত ফুরায়ে গেল, সে দিন এল,
উপায় কি রে হবে এখন।
সেই মাতৃগর্ভ হ'তে তোর পশ্চাতে, ফিরিতেছে যে কাল শমন;
সে ত রে কাল পাইয়ে, পাছ ছাড়িয়ে,
সম্মুখে দিল দরশন। (পরমায়ু শেষ দেখিয়ে)
ওরে জীব! তাই যে সুধাই, ওকার দোহাই, দিবি কার করিতে বারণ;
শমন তোর পদ পদার্থ, ধন অর্থ,
কোন কথা ক'রবে না শ্রবণ (জাতিকুল বিদ্যা যশের)
হরির চরণ নির্ম্মাল্য, নাই তার তুল্য, শমন করিতে দমন;
ফিকির কয় সেই অমূল্য, সুনির্ম্মাল্য
মাল্য কণ্ঠে কর ধারণ, (নইলে শমনভয় যাবেনা)
কাঙ্গাল কয় রে নির্ম্মাল্য, ছেড়ে মাল্য, অন্য মাল্য পরে যে জন;
সে মাল্য শ্মশানতলে, ছিঁড়ে ফেলে,
তাতে হয় না শমন দমন। (নির্ম্মাল্য মাল্য বিনে)

তোর মত মন এমন হাবা, আর দেখিনে;
ঘোলের ঘোলায় প'ড়ে ঘি খেলি নে।
ও তুই ভূতের বেগার খেটে, মলি রে ফেন চেটে, তেত মিঠে কিছু বুঝিলি নে;
ভাল আথের গুড় পেয়ে, রলি রে মাত খেয়ে, ভিয়ান ক'রে তার স্বাদ নিলি নে।
যে জন তোমায় ফাকি দিয়ে, রাখে ভুলাইয়ে, ভালবাস তায় সযতনে;
তুমি চিনিতে পার না, রূপা তামা সোণা, ভুলে গিয়ে পাগল হ'লি কেনে।
যে তোর এক দিনের তরে উপকার করে, তার গুণ গাস্ তুই বদনে;
যে তোর চিরকাল ভ'রে, রত উপকারে, একদিন তার গুণ গেলি নে।

যে তোরে ভালবাসে এত, পিতামাতার মত, স্নেহ করে সদা সর্ব্বক্ষণে ;
যে তোর মশানে ভবনে, রাখে সর্ব্বস্থানে, তারে কেনে তুই ভাল বাসিস্‌নে।
ফকীর ফিকিরচাঁদ বলে, খুঁজে ধরাতলে এমন বন্ধু তুই আর পাবি নে ;
দিয়ে মন প্রাণ তাঁরে, তোষ সমাদরে, সদা তাঁর গুণ গাও বদনে।

ব্যব্‌সা ক'রে ফেল্‌ হ'লি মন, ভেল চালায়ে।
কর্‌লি অযশ ঘোলে গোঁজা দিয়ে।
আগে ভাল চা'ল দেখালি, ক'রে চতুরালি, মিশালি তায় গুমো কাঁড়ি দিয়ে ;
এখন চলে না আর চাল্‌' ভেঙ্গে গেলে পা'ল্‌
ক্রমে এল রে বন্ধ হয়ে। (চা'লের কাঁটা)
এ ভবের বাজারে আসিয়ে ব্যাপারে, গেলি পুঁজি পাটা সব খোয়ায়ে ;
এবার ব্যাপার হ'লো ভাল, আসল টাকা গেল,
কুযশঃ রহিল দেশ জুড়িয়ে। (লাভে হ'তে)
কাঙ্গাল বলিছে এখন, এই কি কর্‌লি মন, এমন স্বাধীন ব্যবসা পেয়ে ;
তুই কপটতা কালী, বদনে মাখালি,
মুখ দেখাবি দেশে গিয়ে। (কেমন ক'রে)

দিনে দিন যাচ্ছে চলে, রে বিফলে,
মন তুমি চেতন হোলে না।
জন্মিয়ে মানবকুলে, কি করিলে, ভেবে একবার তা দেখ্‌লি না ;
জীবনের আছে যে দায়, ভুলে রে তায়, থাকুলে ত আর, সে ছাড়্‌বে না।
পশু আর পাখী যত, তারাও রে ত, আপন আপন কায ভোলে না ;
তুমি মন হয়ে মানুষ, হোলে বেহুঁস, বারেক সে হুঁস হোল না।
কুমারের চাকের মত, ঘুরিছে ত, সুখ আর দুঃখ তা দেখ না ;
সুখের পর দুঃখের ভার, মন রে তোমার, বইতে হবে তা জান না।
ভবে ঘুমায়ে এলে, ঘুমেই র'লে, দীন বলে আর ঘুমাও না ;
সুধু নয় এ পার, আছে ও পার, সে পারাবার পার পাবে না।

মন তোমার এ ভুল গেল না, হায়,
কত আঁধারে তেল দিবি পায়।
মোহের ধাঁধায় প'ড়ে আঁধার দেখিছ,
তাই দুপুর বেলায় বাতি জ্বেলে, সে পথ খুজিছ; (ভোলামন)
আছে সূর্য্যের আলো চিরকাল,' বাতি জ্বাল আবার তায়।
হাওয়া বচ্ছে সদাই আকাশে,
তাপিত প্রাণ জুড়াচ্ছে, আবার মলয় বাতাসে; (ভোলামন)
থাকতে এমন বাতাস, হোচ্ছ হতাশ, দিচ্ছ বাতাস তালপাখায়।
চলে বাতাসের প্রাণ বাতাসের ভরে,
বাতাস না থাকিলে, সে কি থাকিতে পারে; (ভোলামন)
না থাকলে ঘাৎ, হয় কুপকাত, অম্‌নি জগৎ প্রাণ হারায়।
কাঙ্গাল বলে, যে জন বাতাসের বাতাস,
তাঁরে হৃদে রেখে কেন হ'তেছ হতাশ; (ভোলামন)
তাঁরে না চিনিলি, না ডাকিলি, ভুলে র'লি রে মায়ায়।

হৃদে ক'রেছ গণন, ও পামর মন!
চিরদিন তোর এমনিই যাবে।
ভুলেছ শেষের কথা, আপন মাথা, আপনি তখন ভাঙ্গিবে;
আজকাল আজকাল বলে মন, গেল জনম, এর পরে পস্তাতে হবে॥
আপনার সূত্রজালে, আপনায় ফেলে, মাকড়সার ন্যায় প্রাণ হারাবে,
যার আছে প্রথমে সুখ, তার শেষে দুঃখ, দেখ নাই কি দিনেক ভেবে॥
পারত্রিক হিতের কথায়, মাথা ব্যথায়, সে মাথা কবে সারিবে;
চুরি কর যার তরে, সেই তোমারে, চোর ব'লে বাঁধিয়ে দেবে॥
ফিকিরের সাধ্য নাই আর, অকুল পাথার, ফিকিরে সাঁত্‌রায়ে যাবে;
তাই বলি ও দয়াময়! সেই অসময়, নামের গুণ কিছু জানাবে॥

দোকানি ভাই দোকান সার না, কত করবি আর বেচা কেনা।
লাভের আশায় দিন কেটে গেল,
দোকানের সব মাল মসলা, চোর ছ'জন নিল; (দোকানি)
তোর ঘরের মাঝে, সিঁদ কেটেছে, তাও কি একবার দেখ না।

পরের, ঠকাতে গে' নিজে ঠকিলি,
যা ছিল তোর আসল টাকা সকল খোয়ালি; (দোকানি)
তোর মহাজনের, কি করিবি, তাগাদার দিন বল না।
ফিকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা,
এখন, মহাজনের শরণ লয়ে জানাও গে' ব্যথা; (দোকানি)
তিনি বড় দয়াল, (তাঁর মত আর দয়াল নাইরে)
শুন্‌লে আওহাল, তোরে নিদয় হবেন না।

স্বদেশে যেতে হবে, এ বিদেশে, চিরদিন, কেউ রবে না।
ওরে সে স্বদেশ তোমার, নয় রে এ পার, ও পার আছে তা জান না;
কেমনে ওপার যাবে, পার হইবে, সে ভাবনা কেউ ভাব না।
ওরে ভাই, দিন ফুরালে, আঁধার হ'লে, চোখে দেখ্‌তে কেউ পাবে না;
বলি তাই দিনের বেলা, রেখে খেলা, ভবের ভেলা দেখে নে না।
কাঙ্গাল কয় দিন কি আছে, যে দিন গেছে, সে দিন ত আর ফিরিবে না;
যে দু'দিন বেঁচে থাক, দীননাথে ডাক, ভব ভয় রবে না।

করি পরের কারণ, সদাই রোদন, আপন কাঁদন ত কাঁদ না।
টোকাহীন হ'লে নাড়ী, যুক্তি করি, খুঁজ্‌বে ধাড়ি পাট বিছানা;
থাম্‌লে তোর ঘড়্‌ঘড়ি বোল, ব'লবে সকল, শীঘ্র ধ'রে বাইরে নে না।
মন রে তোর আত্মজনে, বাইরে এনে, দেখ্‌বে কিছু আছে কিনা;
অনুমান মাত্র টোকা, পেয়ে ধোকা, ব'ল্‌বে আছে, নাম ডাক না।
কিছুক্ষণ কান্না কেঁদে, গামছা কাঁধে, খুঁজ্‌বে কোথা জ্ঞাতিজনা;
আছে সব জাত-বেহারা, এসে তারা, দুদণ্ড তোমায় থোবে না।
ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে, এ দিন পেলে, ঘোচে তার ভব-ভাবনা;
অন্তিমে কলসী কাচা, বাঁশের মাচা, বুঝি এবার তাও মেলে না।

হায় আমি খেদে মরি, একি রে লাঞ্ছনা!
যারে আপন ভেবে, এলাম ভবে, সে আমার আপন হ'ল না।
আমি, সদা বলি আপন আপন, উপার্জ্জন করি যে ধন;
ভেবে তাই দেখি এখন, সে ধন সঙ্গে যাবে না।

ভাই বন্ধু কুটুম্ব জ্ঞাতি, যারে আপন বলি দিবারাতি,
নিবিলে জীবনের বাতি, কেউ আমার সাথী হবে না।
কাঙ্গাল বলে আমারি মন, আমার না হ'ল যখন;
কারে দোষ দিব তখন, সাধন ভজন হ'ল না।

কারে বল মন আপন আপন;
ভেবে দেখ নহে আপন আপনার জীবন।
যখন পূর্ণ হবে কাল, ধ'রবে এসে কাল;
তখন, রাখ্‌তে কে পারিবে, ধ'বে এ জীবন।
আত্ম বন্ধু পরিজন, ভেবে অতি প্রিয়জন,
যাদের সুখ খুঁজিছ সর্ব্বক্ষণ;
তারা ক'রবে কি যতন, গেলে এ জীবন.
তখন তুমি রবে কোথায় কোথায় পরিজন।
জীবন হ'তে যতন ক'রে, যে ধন রাখিছ ঘরে,
না করে ভায় দীনের দুখ মোচন;
সে ধন কোথা বা রবে, দেখ না ভেবে,
তোমার প্রাণ পাখী উড়ে ক'রলে পলায়ন।
ফিকিরচাঁদ কয় কেউ কার নয়,—এ সংসারে সব মায়াময়,
মায়াবশে দেখিছ স্বপন;
যদি আপনার ভাল চাও, সত্য পথে যাও,
সরল হ'য়ে ভজ নিত্য নিরঞ্জন।

চিরদিন এ ভাবে যাবে না রে যাবে না;
তুমি কি ছিলে, কি হ'লে, ভেবে দেখ না।
আগে ছিলে অসহায়, পরাধীন পঙ্গুপ্রায়,
পরে দেহ বল সম্বল, পিতা-মাতার সহায়;
স্বাধীন হ'য়ে জ্ঞান বলে, নেচে বেড়াও ধরাতলে,
ভাবিলে এ দেহ পতন, কখন আর হবে না, হবে না।
দেখিতে দেখিতে হ'ল, পরে তোমার সে আকার,
ওরে লোল চর্ম্ম দন্তহীন, শ্বেত কেশ কদাকার;

শক্তি নাই আর চলিবার, কফ কাশী অনিবার,
এ দেহের অহংকার, বৃথা আর ক'র না ক'র না।
মাটি হ'তে দেহ তব, মাটি হবে জান না,
মাটি হবার আগে তবে, কেন মাটি হও না;
কাঙ্গাল কাঁদে হ'লেম মাটি, তবু মন হ'ল না খাঁটী,
তাই ভাঙ্গা ঘরে দিয়ে টাটী, করিতেছি কল্পনা জল্পনা।

কত আর আয়না ধ'রে, বারে বারে, দেখ্‌বে রে মন মুখ বল না।
কাল কেশ সাদা হবে, ক্রমে সবে দন্ত যাবে, তা জান না;
বলিতে কথা শুধু, মুখে থুতু, পড়্‌বে দিনেক্ তা ভাব্‌লে না।
কদাকার লোলচর্ম্ম, বিষয় কর্ম্ম, কফ্ কাশী গুড়ুক্ ভজনা;
তখন তোর আত্মস্বজন, স্ত্রী পরিজন, মর বই আর বাঁচ কেউ ব'ল্‌বে না।
ফিকিরচাঁদ ফিকির ক'রে, দিনেব-তরে, মুখের পরিণাম ভাবল না;
এখনও আছে সময়, ডাক রে তাঁয়, দিন গেলে আর দিন পাবে না।

সংসার-কোষের কীট, কি শঙ্কট,
দেখ রে সম্মুখে এবার।
বিষয় তুঁতের পাতে, রসাস্বাদে, বাঁধিলে ঘর সোণার আকার;
ওরে সেই ঘরের সুতায়, বাধে তোমায়, কালের দূত ব্যবসাদার।
এখন্ রে বদ্ধ কোষে, আছ সুখে, না ভাবিছ কোষের ব্যাপাব;
যে দিন তন্দুরে রেখে, ভাপ দেবে, কি কষ্টে প্রাণ যাবে তোমার।
কাটিয়ে কোষেব সুতায়, বেরও ত্বরায়, যদি ভাল চাও আপনার;
নতুবা বিপদ্ ভারি, দেখ্ বিচারি, ঘরের সূত্র শত্রু তোমার।
কাঙ্গাল কয় নিজ দোষে কর্ম্ম বশে, পঞ্চ কোষে বদ্ধ এবার;
হরি হে, তোমার দয়া বিনা, মায়াকোষ কাটিতে সাধ্য নাই আর।

যার ফুল নকল ক'রে, গয়না গ'ড়ে,
দিচ্ছ রে মন! কত বাহার।
তিনি যে জগদ্‌গুরু, কল্পতরু, তাঁরে ভোল এ কি ব্যভার;
কখন হয়ে অন্ধ, বল মন্দ, গুরু মারা বিদ্যা তোমার।

ওরে যাঁর আকাশের রং দেখে রে রং, করতে শিখে জগৎ সংসার;
আবার তাঁয় সং বলিয়ে, ঢং করিয়ে, নাচাও তুমি কি অহংকার।
কাঙ্গাল কয় যাঁকে দেখে, লোকে শিখে, না করে যে নামটি তাঁহার;
ওবে তার পদে প্রণাম, নিমখ্‌হারাম, তার মত কে আছে রে আর।

আজব দুনিয়ার একি, দেখি আজব কারখানা।
ফল খেয়ে ঘোবে যে গাছ দেখে না॥
হচ্ছে কত গাছেব পাতা, পড়্‌ছে আবার খসিয়ে,
আগুনেতে পুড়্‌ছে ঘসি, গোবর উঠ্‌ছে হাসিয়ে;
মরছে লোকে সর্ব্বদাই, শ্মশানেতে হচ্ছে ছাই,
তবু লোকে করছে মনে, আমার মরণ হবে না হবে না॥
ইচ্ছা অনুসারে যখন কার্য্য হয় না সবাকার,
তখন ইচ্ছা পরে ইচ্ছা আছে, সন্দেহ আর নাহি তাব;
লোকে এমন অবোধ ভাই! হাতের ফল বলে নাই,
অহঙ্কার করি তাই, বলে ঈশ্বর মানি না মানি না॥
কেঁদে ব'লে অতি দীন বিদ্যাহীন কাঙ্গালে,
ঈশ্বরে কি জানা যায়, বিদ্যা বুদ্ধি কৌশলে;
আমি আছি কি'বে নাই, আগে ঠিক্ কর তাই,
পরে দেখ্‌বে আছেন তিনি, ভাব্‌তে কিছু হবে না হবে না॥

আমি কে, আমায় কেবা চিনেছে।
আমি ঐ খেদে যে কেঁদে মরি, আমায় সবায় ভুলেছে॥
আকাশ পাতাল সমুদায়, কোথা আমি ছাড়া নয়,
আমি ছাড়া হ'লে অমনি হ'য়ে যেত লয়;
আমি নাই রে যথায় এমন স্থান এই,
জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় আছে।
যারা চেনে না আমায়, তারা বলে সর্ব্বদায়,
কিছুদিন পরে আমি রব না হেথায়;
আমি হেথা ছেড়ে, যাব যথা,
আমি সেই থানেই ত রয়েছে।

কেমন ছলনা মায়ার, ভুলায়েছে সবাকার,
ফিকিরচাঁদ সেই ধাঁধায় পড়ে, দেখিছে আঁধার ;
ভুলে আত্মতত্ত্ব. সংসার লয়ে,
কেবল আমার আমার করিছে।

ওরে সরোবরে, রসভরে কমল ফুটেছে।
ঐ যে, মধু আশে, উড়ে এসে ভ্রমরা সকল জুটেছে। (রসিক মন)
রসে করে টলমল হায়, দেখে শুনে রসিকের মন রসে ভুলে যায় ;
রসের কূল কিনারা, পায় না তারা, যারা রসে মেতেছে। (রসিক মন)
এ কমল যেমন তেমন নয়, ফুটলে পরে দিনে রেতে এক ভাবেতে রয় ;
যে জন যত ঘাঁটে, ততই ফোটে, মধু উঠে তার কাছে। (রসিক মন)
ফিকিরচাঁদ রসের কথা কয়, এ রস পেয়ে না যায় ভুলে, এমন কেহই নয় ;
এ রস রসিক বিনে, ভেবে মনে, বোঝে এমন কে আছে। (রসিক মন)

আমি, করব এ রাখালী কত কাল।
পালের ছয়টা গোরু ছুটে, করছে আমায় হাল বেহাল ॥ ওরে,
আমি সোজা পথে যদি নিতে চাই,
তারা, ঘুরে ফিরে বাঁকা পথে চলিছে সদাই ;
আমি যদি যাই তাদের ফিরাতে,
তারা ছুটে দলায় ক্ষেতের আল ॥ ওরে,
তাদের, বাঁধিলে আর বাঁধা নাহি যায়,
এ যে, রাত চোরা গোরু ছ'টা রাখা হ'ল দায় ;
তারা খোয়ার ভেঙ্গে পালায় সদাই রে ;
খন্দ খেয়ে আমায় খাওয়ায় গা'ল ॥ ওরে,
আমি, গাদা করে নাদা পূরে রে,
কত, যত্ন ক'রে খো'ল বিচালি, খেতে দিই ঘরে ;
তারা ছ'টা যে গু-খেকো গোরুরে ;
তারা নরক খায় রে হামেহাল ॥ রে
কাঁঙ্গাল কাঁদে প্রভুর সাক্ষাতে,
তোমার, রাখালী লও, আর পারি না গোরু চরাতে ;

আমি আগে তোমার যা ছিলাম হে,
আমায় তাই কয় দীনদয়াল ॥ ওহে,

শূন্য ভরে একটী কমল আছে কি সুন্দর !
নাই তার জলে গোড়া, আকাশ-জোড়া, সমান ভাবে নিরন্তর ॥
কমলের সহস্রেক দল,
তাতে বিরাজ করে, সোনার মানিক, কিবা সে উজ্জল ;
তারে যে জেনেছে, যে পেয়েছে, সেই হয়েছে দিগম্বর ॥
কমলের ডাঁটাতে কাঁটা,
আবার ছয়টি সাপে, জড়িয়ে ধরে ক'রেছে লেঠা ;
কেবল পায় রে দেখা, যারা বোকা, সাপের ফণা ভয়ঙ্কর ॥
ফিকিরচাঁদ ফকীরে বলে,
সেই সাপ্‌কে ধরে, বশ করেছে, যে জন কৌশলে ;
কেবল সে পেয়েছে, নিজের কাছে, সোনার মাণিক মনোহর ॥
(হায়রে পাগল)

চিরদিন জলে ফেলে, রগ্‌ড়াইলে,
কয়লার ময়লা যায় না ধুলে।
যদি রে কর গুঁড়া, দিয়ে নোড়া, রেখে তারে পাথর শিলে ;
তবে সে হবে চূর্ণ, সে বিবর্ণ, যাবে না আর কোন কালে।
ওরে ভাই কয়লা ঘোসে, অবশেষে, ফেল যদি কোন স্থলে ;
তবে রে তথায় কয়লা, করে ময়লা, আপনার স্বভাব ফলে।
দীনহীন কাঙ্গাল বলে, ভাগ্য ফলে, যদি রে সদ্‌গুরু মেলে ;
তবে রে আগুন লাগায়, আঙ্গারের গায়, সকল ময়লা যায় রে জ্বলে।

এ রসের রত্নাকরে, ভাস্‌লে পরে, কখন রতন পাবে না।
সাগরে আছে রতন, মনের মতন, যতন বিনে তা মেলে না ;
ওরে মন ডুবে জলে, গিয়ে তলে, পরশ পাথর তুলে নে না।
ওরে মন ভাবাবেশে, বেড়াও ভেসে, প্রেমরসে ডুবে দেখ না ;
ওরে সে পরশ রতন, পরশে মন, অম্‌নি রে তুই হবি সোণা।

কাঁদিয়ে কাঙ্গাল আকুল, সোণার পুতুল, ডুবালেও এ মন ডোবে না;
ওরে সে আপন বশে, আপ্‌নি ভাসে, মন যেন ঠিক টোপা পানা।

আমারে ছুঁয়োনা রে!
ও ভাই! আমার জাত গিয়েছে।
আমার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নারী, তাবা কুলের বাহির হয়েছে॥
(ঝগ্‌ড়া ক'রে)
এক রমণী প্রসবেতে নহে বিরত, সন্তান জন্মিছে যত,
আর রমণীর সন্তান মরে তত,
জনম মরণ অশৌচ ঘটেছে। (আমার)
দশ জনে ক'রেছে আমার একঘরে ভাই!
আমার ঘর দরজা নাই, (মরি হায় রে!)
আবার ছয় জন পণ্ডিত যুক্তি করে,
আমায় মুচি করেছে॥ (তারা)
এ দুই নারী আমার্ ঘরে থাকিতে রে ভাই!
আমার উপায় আর ত নাই, (মরি হায় বে!)
দুসতীনের হিংসার আগুণ জ্বলে,
আমার সোণার সংসার পুড়িছে॥ (হায় রে)
শোন্ রে কাঙ্গাল দুসতীনে শীঘ্র বিদায় দাও,
যদি আপনার ভাল চাও, (মরি হায় রে!)
ডেকে বিবেক পুত্র সঙ্গেতে লও, নইলে যেতে নারবি মার কাছে॥

আশা কুটীল ভঙ্গী, কাল ভুজঙ্গী,
দংশিল আমার বুকে;
সুশীতল পরশ পেয়ে, ধেয়ে গিয়ে,
আমি যে ধরিলাম তাকে;
নিদারুণ বিষের জ্বালায়, জীবন যায়,
এ বিপদে কে আর রাখে॥
শুনেছি সাধুর বচন, মায়ের চরণ,
অমৃত হয় সকল রোগে;

ডাকি তাই অবিরত, পদামৃত,
দিয়ে বাঁচাও মা আমাকে ॥
কাঙ্গালের হৃদয়-কূপে, আশা সাপে,
বাসা ক'রে আছে সুখে ;
কত বিষ নিশ্বাসে তার, মলেম এবার
জ্বলে পুড়ে ঘোর বিপাকে ॥ (মা! মলেম)

খাটিয়ে সংসারে হদ্দ, রে।
নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লাম ইহার, কিছুতে নাই জুত বরাদ্দ ॥
খাটুনী খাটী যত, মজুরি না পাই তত,
চিনির বলদের মত বই শুধু।
কে খাটায়ে না বুঝ্‌তে পারি, কার খাটুনী খেটে মরি ;
এ কার বাজী বুঝ্‌তে নারি, ফেরের বেলায় মহামন্দ ॥
খাটিতে জনম গুয়ায়, কেবা রে খাটায় আমায়,
আমি না দেখলাম্ তাঁহায় দিন অন্ধ।
যে খাটায় সেই কর্ত্তাটীকে, দেখতে পেলে সুধাই তাকে ;
তুমি খাটাচ্ছ যাকে, তার সনে তোর কি সম্বন্ধ ?
খাটায় যে গুপ্ত সে জন্, খাটে সে বোকা এমন,
জানে না আপনি কেমন, কিসে বদ্ধ।
দিনে রেতে যে খাটায় এত, যদি সে আপনাকে দেখ্‌তে পেত ;
তবে কি আর খাটিত, না থাক্‌ত নিয়মের বাধ্য ॥
কাঙ্গাল কয় খাটায় যে জন, তাঁরে দেখেছে যে জন,
সেত থাকে না এমন আবদ্ধ।
কর্ত্তা পেয়ে দুঃখ জানায়, কর্ত্তার খাসমহলে খাটুনী পায় ;
তার, ভূতের বেগারটী যে যায়, ছয়টা খাটনদার যে অন্ধ ॥

এ মায়াপাশ কিসে ছিন্ন হয়।
আমি মায়াতে ভুলিয়ে, রয়েছি মাতিয়ে,
হতেছে সতত কত তাপোদয়। (মনে)

যা নহে আপন, ভাবি আপন,
আশা-পবন সদা বয়।
আমি, আলোতে থাকিয়ে, আলো না দেখিয়ে,
ভাবি এ সকল কেবল তমোময়।
আমি, ভবের মাঝে, দেখি খুজে,
আমার মত কেহই নয়?
আছে, আমার মত যারা, সদা ভাবি তারা,
আমা হ'তে পৃথক্ পৃথক্ যেন হয়॥ তারা,
মায়ায়, ভুলে থাকি, নাহি দেখি,
জগতে এক কিছুই নয়;
আমি, ভাবি এ জগতে, পৃথক্ আমা হ'তে,
তরু লতা কিম্বা প্রাণী সমুদায়॥
ফকীর, ফিকিরচাঁদে, মনের খেদে,
কেঁদে মনের কথা কয়।
বলে, করেছে যে জন, মায়া পাশ ছেদন,
কেবল সে জন দেখে জগৎ আত্মময়॥

আগে ভাই আপন থলে, দেখ খুলে,
পরে দেখ পরের থলে।
তুমি যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্ম, এত কাল যা উপার্জ্জিলে;
তা ত সব মজুত আছে, থলের মাঝে, দেখ্‌তে পাবে মন খুজিলে।
মানব যা করে যখন, তার ত কখন, ক্ষয় হয় না কোন কালে;
হবে যে মরণ যখন, যাবে তখন, কর্ম্মফল সব সঙ্গে চলে।
করেছ যে অত্যাচার, যে ব্যভিচার, ফল পাবে তার পরকালে;
[illegible]র নাই ওয়াশীল বাকী, ভেবেছ কি, সে পাপ যাবে ভোগ রাগ দিলে।
পরের থলেতে কয়লা, বড় ময়লা, তাই দেখিছ নয়ন মেলে;
[illegible]নার থলের যে ছাই, দেখ না ভাই, চোক বোজ দেখায়ে দিলে।
কাঙ্গাল কয় চিত্তশুদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত, কর অনুতাপানলে;
নইলে ভাই পাপ যাবে না, তাপ পাবে না, [illegible] পরকালে।

দেহ তত্ত্ব।

দেহদরিয়ায় উঠ্‌ছে তুফান। রে,
জোয়ার ভাটা নদী এ যে, উজান ভাটা দুই রে সমান॥
দরিয়ার ঢেউয়ের জলে, একবার উপরে তোলে,
আবার রে নীচে ফেলে ভাবনা;
আবার অমাবস্যা পূর্ণিমাতে, বান ডাকে রে কোটালে
নাও ডোবে আচম্বিতে, হ'লে একটু অসাবধান॥
জলেতে লোণা পোরা, ফেলে ভুঁই কাদা ভরা,
কার সাধ্য আছে তাতে গুণ টানা;
ঘেরা আবার ঘোর জঙ্গলে, উপরে বাঘ কুমীর জলে,
ঘোর বিপদ উভয় স্থলে, ভয়ে মরি কাঁপে রে প্রাণ॥
কাঙ্গাল কয় মনোদুঃখে, দরিয়ার তুফান দেখে,
সাবধান মন্‌মাঝি ভাই হাল ছেড়ো না;
ঠিক রেখে রে জ্ঞান মাস্তলে, ভক্তির পাল দেরে তুলে;
বাতাসে যাবে চ'লে, মুখে কর রে নাম গান।

এ যে বিষম নদী, দেখে করে ভয়।
বাচ খেলাতে এলাম এবার, বাচ খেলান হ'ল দায়॥ ওরে,
পাঁচ কাঠের জীর্ণ তরণী, তার, নবছিদ্রে উঠে বারি দিবা রজনী;
জলের ভারে তরি গড়ায় রে, বুঝি গড়্‌তে গড়্‌তে ডুবে যায়॥
দশ খানি দাঁড় পাতা আছে রে, ছয় দাঁড়িতে জোরে টেনে লয় ভাটিয়ে রে;
আবার, মাঝি বেটা এমন বোকা রে, হা'ল ধরিতে নাহি দিশে পায়॥ ওরে,
আঠার ডওরাতে ব'সে রে, আঠার জন আছে, তারা কেবল ঘুমায় রে,
তারা, জাগে না যে কোন মতে রে, আমায় ব'লে না দেয় সদুপায়॥ ওরে,
আকাশে মেঘ দেখা যে দিল, অম্‌নি দারুণ ঝড় বাতাসে তুফান উঠিল;
পাঁচ গুণারি টানে পাঁচ দিকে রে, পাকে প'ড়ে তরি মারা যায়॥ ওরে,
ফিকিরচাঁদ কয় মন্ রে বিনয়ে, কেন এত ভাবছিস ব'সে বিপদ সময়ে;
এখন, কূলে যেতে চা'স যদি রে, বাদাম টেনে দে ত্বরায়॥ ওরে,

এখন থাকি জবা ঘরে কি করি ;
ভয়ে মরি কখন বা এই ঘর পড়ে প্রাণে মরি। রে,
এ ঘরের সে ঘরামী ভাল,
থাকবে, অনেক দিন তাই, যতন ক'রে ঘর বেঁধেছিল ;
কিন্তু এমন আমার পোড়া কপাল রে, ক'বৃল রুয়ে খেয়ে সব ঝুরি ॥ রে,
ভাল বেতে বাঁধা ছিল চাল,
ঐ যে ছয় ইঁদুরে কটর কটর কাটে হামেহাল,
যেন ঘরের মালেক ইঁদুর কটা রে, তারা নাচিছে ঘুরি ফিরি ॥ রে,
খুঁটি কটার গোড়ায় নাই মাটী,
লোক দেখান হয় রে কেবল কাজে নয় খাঁটি ,
দোরে কপাট নাই রে, নয় দুয়ারে, হিঁয়াল এসে করে শীত ভারি ॥
এ সময়ের গতিক ভাল নয়,
আকাশে মেঘ দেখা দিলে, দারুণ বাতাস বয় ,
আনি মটকা হ'তে, খড় উড়ে রে, আবার বেড়া ক খান যায় পড়ি ॥ রে,
ফিকিরচাঁদের কথা রাখ্ রে মন !
ঘরামী রে ডেকে দেখা, ঘরের ভাব যেমন ;
সে জন বিনে এখন আর উপায় নাই রে ,
যতন ক'রে খুঁজে দেখ তারি ॥ রে—

কি আজব! দেখ এক যাত্রাতেই, সুমুখ রথ ফিরে রথ হ'ল।
এসে রথ ঠিক্না ছেড়ে, চ'ল্ল ফিরে, যেথান হ'তে এসেছিল—রে ॥
মিস্ত্রিরী বড় ভাল, পাঁচ কাঠে রথ গড়েছিল,
থাকবে সে বহুকাল, মনে ভেবেছিল ;
কিন্তু যতনেতে না রাখাতে, ঝুরি ক'রে রুয়ে খেল ॥ রে
রং করা চারিদিকে, আবার, চা'র যুগের সব দেবতা লিখে,
রেখেছে চারি থাকে করিয়ে কৌশল ;
কিবা কারুগিরি, আট কুটরী, মধ্যখানে শোভে ভাল—রে ॥
সারথী বড় বোকা, আবার দশটী ঘোড়া হয় একবোখা,
আছে যে ছয় খান চাকা, ভাঙ্গা তার আল ;
আবার পাঁচজন জোরে ঘোড়া ধরে, পাঁকের মাঝে টেনে নিল—রে ॥ রথ,

ফিকিরচাঁদ বলে রে মন! এ রথের মিস্ত্রিরী যে জন,
উপরের থাকে সে জন ব'সে করে আলো;
একবার, নেহার ক'রে, দেখ তারে, যাবে তোমার সব জঞ্জাল—রে॥ ঘুচে,

হায় রে! রথ দেখে লোকে, কিন্তু তার খবর না জানে।
এ রথের আছে থাকা, নাই রে চাকা,
ঘোড়ায় টানে রে॥ রথ,
কারিগর রথের গোড়া, পাঁচ কাঠে করেছে খাড়া,
পাঁচ কাঠের তক্তা জোড়া দিয়ে স্থানে স্থানে;
আবার একটী দড়া, রথে বেড়া,
কারখানা তার মধ্যখানে রে॥ কত,
এ রথের জোড়া জোড়া, আছে ভালমন্দ অনেক ঘোড়া,
ছয়টী তার লক্ষীছাড়া সারথি না মানে,
সে যে আপন বলে, টেনে ফেলে,
বিপদে প'ড়ে মরে প্রাণে রে॥ রথী,
এ রথের নয় দুয়ারে, নয়টী রসের নারী বিরাজ করে,
তারা সব সারথীরে ভুলায় প্রলোভনে;
প'ড়ে তাদের মায়ায়, দুষ্ট ঘোড়ায়,
জ্ঞানের চাবুক নাহি হানে রে॥
এ রথের নীচের থাকায়, কত কুৎসিত ছবি আছে রে হায়!
সে দিকে কেবল তাকায় নিরেট বোকা জনে;
রথের চূড়ার থাকায়, যে জন তাকায়,
সে যে দেখে দুনয়নে রে॥ রথের কারিগরে,
কাঙ্গাল কয় ওরে অজ্ঞান, উঁচ নীচ্ না ক'র্‌লে সমান,
কঠিন হয়, এ রথ চালান ভেবে দেখ মনে;
এ রথ সমান পথে, সোজা পথে,
ভাল চলে নিজ স্থানে রে॥ শেষ ঠিকানায়,

এ ঘরেতে বসত করা হ'ল রে দায় ;
তানে চালাইলে মন চলে বাঁয়।
এই নবদ্বারী ঘর, দেখিতে সুন্দর,
পূর্ণ ছিল বিস্তর মণি মুক্তায়।
ছ'জন বোম্বেটে জুটিয়ে, সে রতন বেচিয়ে,
গরল কিনিয়ে খাওয়ায় আমায়॥
(তারা ফাঁকি দিয়ে),
লোকে কথায় বলে, বাহিরের চোর হ'লে,
সাবধান কৌশলে তায় বাঁচা যায় ;
আমার, ঘরের মাঝে চোর, সদাই করে জোর,
মন প্রহরী যোগ দিয়েছে তায়॥
(আমার ঘর সন্ধানি)
কাঙ্গাল করিছে ক্রন্দন, ঘরের চোর ছ'জন,
স্বাধীনতা রতন সব লুটে খায়।
আমি ঘরের রাজা হয়ে, সকল খোয়াইয়ে,
নিযুক্ত হইলাম দাসের সেবায়॥
(আমি প্রভু হয়ে)

চল্‌তেছে আজব ঘড়ি, দিবা রাত নাই কামাই।
যার ঘড়ি এমন, কারিকর তার কেমন ভাই ?
এক স্প্রিংয়ের জোরে ঘড়ির ঘুরছে যে রে সকল কল,
সেই স্প্রিংয়ের জোর না থাকিলে, যত কল সবই বিকল ;
বুকের দু'পাশে দোলনা, টক্ টটক্ টক্ হয় বাজনা,
বেদম ভাবে চল্‌ছে কিন্তু, দম্ দিবার তার চাবি নাই॥ ওরে ভাই,
সূতার মত ছোট খাট; চাকার আকার কত চিহ্ন,
তার, উপর উপর দেখ্‌লে তাতে পায় না কেউ কোন উদ্দিশ ;
দুই কাঁটা চলে ধাইয়ে, একটা যায় ধীরে ধীরে,
একটা বাধায় পাকেতে গোল, ভাল মন্দ দুই এরাই॥ ওরে ভাই,
ফিকির তোরে ফিকির বলি, বলি মোর কথা রাখিস,
তবে প্রেমভবে দিনান্তরে, দয়াময় নাম টাইম দিস্ ;

যে কারিগর বানিয়েছে, নষ্টের কি কথা আছে ;
নিজের দোষে ভাঙ্গবে যখন, তখন রাখবার উপায় নাই ॥ ওরে ভাই,

এ দেহের গরব কিরে, বিচার করে,
দেখ একবার নিজের মনে।
ওরে যার সকল অসার, সৌন্দর্য্য তার,
বল্ শুনি রে কোন স্থানে ;
রক্ত আর মাংস পিণ্ড, মল ভাণ্ড,
জড়িয়ে আছে নাড়ীর সনে ॥
এ দেহ হাড়ে জোড়া, দড়ি দড়া,
ঢাকা চামড়া আবরণে ;
দেখ আবার তাতেও রে ভাই! বিশ্বাস নাই,
নষ্ট হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে ॥
ওরে ভাই, দেহের মত, দেখি না ত
নিমক্‌হারাম ত্রিভুবনে,
যতন যে করে এত, তবু সেত,
সঙ্গে যায় না মরণ দিনে ॥
কাঙ্গাল কয় দেহ অসার, হয় রে সুসার,
সার বস্তুর অন্বেষণে ;
তার না তত্ত্ব ক'রে, দেহ ধরে,
মলেম ব্যাধির তাড়নে ॥

বাসা বাড়ী পাকা করা কি ঝকমারি।
কর্ম্ম গেলে, দু'দিন রইতে নারি ॥
জীবের দেহ কাঁচা বাসা, ক্ষণ নাই ভরসা,
তবু পাকা করে আশা করি ;
কালের স্রোতে দিলে টান, কাঁচা পাকা সমান,
যখন উঠে মৃত্যু-তুফান ভারি ॥
(এই ভব সাগরে)

গাঁথি, ইট্ পাথরে পোক্ত, পাকা বন্দোবস্ত,
কর্‌লে যে সমস্ত কোটা বাড়ী;
কালের ভূমিকম্প এসে, সকল প'ল খ'সে,
এখন থাক্‌বি কিসে দেখ্ বিচারি॥
(দেহ গেল, আশ্রয় ক'রে)
জীবের বাড়ী ঘর আছে, ভেবে কি দেখিছে,
গোলোকমাঝে নিত্যানন্দপুরী;
যদি যাবি সেই বাড়ীতে, হবে রে ছাড়িতে,
বিষয়-বাসনা মায়া নারী॥
আমি কাঙ্গাল এমনি বোকা, কাঁচা করি পাকা,
এখন তাতে দেখি বিপদ ভারি;
কোথায় হরি দয়াময়, এই বিপদ সময়,
দয়া করি দাওহে চরণ তরি॥
(নইলে ডুবে মরি) কাঙ্গাল ডাকে হে!

দেখ ভাই! কি কারখানা, গুণিপণা, আজব গাছেতে।
ক'রে একের আশ্রয়, গাছ খাড়া রয়, ছুই মত ফল স্বাদেতে॥
(এক গাছের হয়)
তিনটী মূল গাছের গোড়ায়, চার রসেতে রসাল সে পঞ্চবিধ তায়,
আবার ছয়টী স্বভাব, এ'কেমন ভাব, সাত মত সাত ছালেতে॥
(গাছটি বেড়া)
আট শাখা প্রবল অতিশয়,
গাছের গায়ে থরে থরে নয়টী কোটর হয়;
দশটী পাতা গাছে, কেবল আছে, গাছটী পারে চলিতে॥
(পাতার জোরে,)
ফিকিরচাঁদ দেখে তামাসা,
এত বড় গাছে কেবল ছুই পাখীর বাসা;
থাকে একটী পাখী উপবাসী, চার তারে রস দেখিতে।
(সকল ছেড়ে)

ভূতের ঘরে বাস কর ভাই! হ'ল রে দায়।
জলে ম'লেম পাঁচ ভূতের জ্বালায়॥
আমি ভুলে ভূতের ঠাটে, ভূতের বেগার খেটে,
ভূতের হাটে ভ্রমি ভূতের ভোগায়;
ভূতের সকলই অদ্ভুত, ভূতে জন্মে ভূত,
ভূতে জড়ীভূত করলে আমায়॥
(ভূতের বেড়ী দিয়ে)
এ যে ভূতের সংসার, ভূতের ব্যাপার,
ভূতে ভূত খায় ভূতের জ্বালায়;
কিছু নাই ভূত ছাড়া, ভূতে ভূত খেড়া,
ভূতের সঙ্গে ভূত নেচে বেড়ায়॥
(ভুলে ভূতের মায়ায়)
কাঙ্গাল কেঁদে কয়, পঞ্চভূত ময়,
দেহে আবার ষড় ভূতে জ্বালায়;
এখন বল রাম নাম, মুখে অবিরাম,
হবে প্রাণ আরাম, নাম-মহিমায়॥
(ভূতের ভয় ঘুচিবে)

বচ্ছে ভবনদীর নিরবধি খরধার।
দেখ, ক্ষণকাল বিরাম নাম এই দরিয়ার॥
ডিঙ্গা ডেঙ্গি পিনাশ বজ্‌রা, মহাজনী নৌকায়,
পাপী তাপী সাধু ভক্ত, চরণদার তার সমুদায়।
ভাসিছে দরিয়ার জলে, ইচ্ছামত নৌকা চলে;
হাল ধ'রে তার সুকৌশলে, বসে আছে কর্ণধার॥ মন সবার,
কর্ণধারের ইচ্ছামত, কেহ চলে উজায়ে,
মনের সুখে জ্ঞান মাস্তলে, ভক্তিপাল উড়ায়ে।
কেহ আবার মনের দোষে, ভেটেনেতে যাচ্ছে ভেসে
পাকে ফেলে অবশেষে, ডুবায় তরি কর্ণধার। মন সবার,
কেহ আবার ক্রমাগত বলে বলে ভাটিয়ে,
অপার সাগরে পড়ে নদীর মুখ ছাড়িয়ে।

সাগরের তরঙ্গ ভারি, স্থির নাহি থাকে তরি ;
লোণা জলে জীর্ণ করি, ডুবায় তরি কর্ণধার ॥ মন সবার,
সাধু মহাজন যত, বাদাম তুলে দরিয়ায়,
সুবাতাসে চলে তারা, মুখে নামের সারি গায়।
ঠিক না থাক্‌লে হালি, অম্‌নি নৌকা করে গালি ;
গুপ্ত চড়ায় চোরা বালি, ডুবায় তরি কর্ণধার ॥ মন সবার,
কাঙ্গাল বলে কাঙ্গালের পুঁজি পাটা যা ছিল,
বারে বারে ডুবে ভবে, সকলি ত খোয়াল।
খাবি খেয়ে অনেক কাল, আবার তুলে দিলাম পাল ;
সাবধানে ধর হাল, বিনয় করি কর্ণধার ॥ মন আমার,

আমি বুঝতে নারি, ভেবে মরি, ঘটিল একি !
আমি ডিমে এলেম্‌, ডিমে র'লেম, হোতে নারিলাম পাখী।
(হায় রে এবার)
যুগে যুগে কত যুগ গেল,
তুমি ডিমে বসে তা' দিতেছ ডিম না ফুটিল ;
আমি তাইতে ডাকি, দেখ দেখি, কেঁজ হ'য়ে গেল কি।
(এবার এ ডিম)
শুনেছি সাধুর কথা,
সময় হ'লে ডিম ফুটায়ে দেন পক্ষীমাতা ;
বল আমার কবে, সে দিন হবে, যে দিন ফুটিবে আঁখি।
(এই মায়া ডিমে)
জ্ঞান ভক্তি, বিবেক পেয়ে, কাঙ্গাল মানুষ হ'য়ে, মায়া ডিমে রয় বদ্ধ হ'য়ে ;
একবার খুলে দে মা, জ্ঞান আঁখি, প্রাণ ভরে তোমায় দেখি ॥
(প্রাণের মাঝে)

এ সংসার ছেড়ে এখন কোথা যাই ;
জ্বলি দিনে রেতে, ঘোর জ্বালাতে, কোন মতে শান্তি নাই ॥
একে, দুই মাগীর জ্বালায়, আমি জ্বলি সর্ব্বদায়,
এখন তাদের ছেলে হয়ে, আমায় ঘটিল যে দায় ;

ছোট মাগীর ছেলে, সবে মিলে, জ্বালায় আমায় সর্ব্বদাই॥
বন্ধ্যা ছিল বড় জন, কত বল্‌ত কত জন,
শেষে দয়াময়ের দয়ায়, একটী হ'ল তার নন্দন;
সেই ছেলে দেখে, মরে দুঃখে, ছোট জন ভাবে বালাই॥ সদাই,
সেই শিশু ছেলে রে, আমি বাঁচাই কি করে,
আবার ছোটমাগীর ছেলে গুলো দেখিতে নারে,
সদা জোরে জোরে মারে তারে, বুঝি শিশুর রক্ষা নাই॥
বলে ফিকিরচাঁদ কেঁদে, প'ড়ে বিষম বিপদে,
আমায় দয়া ক'রে দীনবন্ধু রাখ শ্রীপদে;
আমায় দাওহে অভয়, দীন দয়াময়!
মাগ্‌ ছেলে আর নাহি চাই॥ এমন,

মরি! এক আজব জন্তু, এ দুনিয়াতে এসেছে।
তার, পশুর মত সকল দেখি, কিন্তু লেজটী নাহি আছে॥ (আজব জন্তুর)
সে, সকাল বেলা খেলা করে, চারি পায় চলে ফেরে,
দুপুর বেলা দুই পদে হাটিতেছে;
সন্ধ্যা বেলা তিন্‌টি পদে, চ'লে খেলা ভাঙ্গিতেছে॥ (ভবের)
মরি ইহার স্বভাব একি! ব'ধে বনের পশু পাখী,
মনের সুখে আপন উদর পূরিতেছে;
এমন, স্বার্থপর আত্মম্ভরী জন্তু কোথায় কে দেখেছে॥ (দনিয়ার মাঝে)
দিবানিশি ঘরে ঘরে, কত জন্তু আছে মরে,
এ জন্তু দেখে তা না দেখিতেছে;
যে ম'ল সে ম'ল, আমি মরিব না ভাবিতেছে॥ (এ জন্তু)
পশুর স্বভাব না থাকে তার, জ্ঞান বলে জন্তু আবার,
সাধন গুণে দেবতা যে হইতেছে;
আবার জ্ঞান সাধন বিনে, পশুর অধম হ'য়ে রহিতেছে॥
সাধন হীন কাঙ্গাল বলে, জন্মে এ জন্তুর কুলে,
মায়া জালে বেঁধে প্রাণ কাঁদিতেছে;
ওহে! কাঙ্গাল বন্ধু হরি আমায়, রাখ কাঙ্গাল ডাকিতেছে॥
(এ বিপদে)

দনিয়ার আজব গাছে, সদা বসে, আছে দুই পাখী ;
কেহ বাসা ছেড়ে, নাহি নড়ে, দু'জনে মাখামাখি। (ভালবাসায়)
এক পাখী কত ফল বিলায়, সেত খায় না সে ফল, আর এক পাখী বসে বসে খায়,
যে ফল বিলাচ্ছে, সে না খাচ্ছে, অন্যে হচ্ছে ফল ভোগী। (ইচ্ছামত)
পাখী নয় কাহার অধীন, যে ফল খায় সে ফল চিনিতে হয়েছে স্বাধীন ;
সে ফল দেখে শুনে, নাহি চেনে, ফল খেয়ে হারায় আঁখি। (নিজদোষে)
মনোদুখে কাঙ্গাল কাঁদিছে, আমি স্বাধীন হয়ে, না পারিলাম ফল নিতে বেছে ;
আমি খেলাম যে ফল, এখন সে ফল, কেবল গরলময় দেখি। (হায় হ'ল কি)

ডাকে করুণ স্বরে, পাখীর হ'ল কি ?
একে, ঘোর রাত্তি, মাঝে নদী, দু'পারে দু' পাখী॥ (আছে)
একটী পাখী ডেকে বলে, ভেসে যায় সে নয়ন জলে, (হায় রে)
আমি তোমা বিনে এ ঘোর রাতে, কেমনে প্রাণ রাখি॥ (বল)
আর এক পাখী বলে তারে, বিনাইয়ে উচ্চৈস্বরে, (হায় রে)
এখনও যে নিশি আছে, চেয়ে দেখ প্রাণ সখি !
তুমি যদি উড় এখন, আমায় পাবে না আর, যাবে জীবন, (হায় রে)
তাই বলি নিশি পোহাইলে, দুয়ে হবে দেখাদেখি॥
কাঙ্গাল কেঁদে বলে আবার, কবে নিশি প্রভাত, হবে আমার (হায় রে)
গিয়ে নদীর পারে মিলবে তবে, আত্মা-চকাচকী॥ (আমার)

কেমন করুণ স্বরে, ডাক্‌ছে ওরে, দুই ঘু ঘু পাখী।
বসি বিজনবনে, ও দুইজনে, করছে রে ডাকাডাকি॥ (পরস্পরে)
দেখা নাই দুয়ের সনে, এক বনের এক গাছে ব'সে আছে দুই জনে ;
দু'জনে সমান ব্যাকুল দেখার তরে, ঘটে না দেখা দেখি॥ (পাতার আড়ল)
ডেকে বলে ঐ যে ঘু ঘু সই, এস আমার কাছে, প্রাণ সখা, দুজনে এক হই,
কেন মিছে লুকায়ে থেকে, দিচ্ছ হে আমায় ফাঁকি॥ (প্রাণ সখা)
ঘু ঘু সখা দিচ্ছে রে সাড়া, ব'লছে পার যদি এস ভেঙ্গে এ পাতার বেড়া ;
নইলে এ জীবনে হইবে না, আমাদের দেখা দেখি॥ (প্রাণ সখী)
কেঁদে ফকীর ক্ষেপাচাঁদে কয়, এ দুই ঘু ঘু কথা শুনে আমার ফাটিছে হৃদয় ;
বুঝি বেড়ার দোষে, এবার আমার হ'ল না দেখা দেখি॥

ভেবে দাস্ত হারা হলেম ভাই,
এক দাস্ত হ'লে অমনি নাই॥
ওলাউঠা রোগের প্রধান,
ইহার কাছে হার মেনেছে বিলাতী বিজ্ঞান;
(হাকিমী ডাক্তারি বিজ্ঞান)
আবার নিদান হাতে, বৈদ্য ঘোরে নিদানে এর বিধান নাই॥
হুজুর মুজুর সকলেই সমান,
ওলাউঠা ধরিলে ভাই, অম্‌নি প্রাণ হারায়;
(বাদ্‌সা উজীর প্রাণ হারান)
এ রোগ, শালগ্রামের শোওয়া বসা, খেলেও যা না খেলেও তাই॥
যে জন, কোন কালে হরি না বলে,
রোগের ঠেলায় ঢুক্‌ল সে জন, কীর্ত্তনের দলে;
(হরি সংকীর্ত্তনের দলে)
রোগী পরম ভক্ত, শাস্ত্র উক্ত, ওলাউঠায় দেখায় তাই॥
কাঙ্গাল বলে দেখায়ে প্রমাণ,
বৈজ্ঞানিক ভাই ছাড় ছাড়, বিজ্ঞান অভিমান, (তোমার)
যে জন সৃজন করে, সে জন ভোরে, সংহারিলে ঔষধ নাই॥

মা! আমি তোমার পোষা পাখি!
আর কত কাল তোলা ছোলা, খাওয়াইয়ে দেবে ফাঁকি॥
পাঁচটী জিনিস মিশায়ে, আজব খাঁচা গড়াইয়ে,
রেখেছ খাঁচার মাঝে এক পাখী।
ওমা! বাটী পূরে ছোলা দিয়ে, তুমি পাখী পড়াও বুলাইয়ে;
পড়ে না না পড়ালে, মুদিত ক'রে থাকে আঁখি॥
না পড়্‌লে দাও না ছোলা, পেটের দায় হরি বলা,
নইলে হরি বলার ধার কি রাখি।
মাগো! তুমি সরে গেলে, আমি হরি বলা শিকায় তুলে;
স্বজাতির বোল শুনিলে, কঁ্যাচর ম্যাচর ক'রে ডাকি॥
খাঁচাতে পাখী থাকে, বাহিরে বিড়াল ডাকে;
ভয়ে তোলা ছোলায় নই সুখী।

আমার শত্রু কত আশে পাশে, তারা ধরবে বলে আছে বসে ;
পেলে আপন বশে, অমনি দফা সারে আর কি ?
কত দিন বদ্ধ রব, বিড়ালের ভয় করিব,
শ্রীচরণ-আকাশ ছেড়ে বল্ দেখি ।
দেখলাম্ এখন সব বুঝিয়ে, কয়েদ করেছ মা ! ফাকি দিয়ে ;
বল্ ছেলের মাথায় হাত দিয়ে, সে কয়েদের ক'দিন বাকী ॥
কাঙ্গাল আবদ্ধ আছে, সংসার খাঁচার মাঝে,
শত্রু তার হইয়াছে পাঁচ ছয়টি ।
ঐ যে, ডাকে শমন বিড়াল, ওমা ! ভয় পেয়ে ডাকিছে কাঙ্গাল ;
বিপদে রাখ ছাওয়াল, দিও না আর ফাকি জুকি ॥

মনস্তত্ত্ব ।

ওরে মন ! মনেরি মন, বোঝে না মন,
এমনি তার বুদ্ধি কাঁচা ।
মন আমার ভবের মুটে, মবে খেটে,
নাহি জোটে পানি গামছা ;
মন আমার শাল রুমালের চিন্তা ক'রে
মরছে ঘুরে হ'চ্ছে নাজা ॥
কাপড় যে হাতে খাট, বহর আঁট,
মন দিতে চায় লম্বা কোঁচা ;
ময়ূরের নৃত্য দেখে, মনের সুখে,
প্যাকম্ ধরতে চায় রে পেঁচা ।
মন আমার অহঙ্কারে, ম'র্ছে ঘুরে,
মাথায় ক'রে জ্ঞানের বোঝা ;
এই আকাশ যাঁরে, ধর্‌তে নারে,
তাঁর আকাশে দিচ্ছে খোঁচা ॥
কাঙ্গাল কয় যে জন যত, বোঝে তত,
বয়ে মরে ভূতের বোঝা ;
অত, বোঝা পড়ায় কায নাই রে মন !
সোজা বোঝ চল সোজা ॥

মনের কি বিষম আশা, কি তামাসা,
ভাব্‌তে গেলে মগজ নড়ে।
মন আবার আকাশ পাতাল, খায় রসাতল,
তবু রে পিপাসা বাড়ে;
সে যে নির্জ্জনে বসে, মনের খোষে,
মনে মনোরাজ্য গড়ে।
যদি রে মন-হাতীরে, জোরে ধরে,
জ্ঞানের অঙ্কুশ মারি ঘাড়ে;
সে যে রে মাত্‌লা হাতীর মত, নত—
হয় না আবার কাদায় পড়ে।
যে জন এই মন হাতীরে, যতন কোরে,
রেখেছেন এই দেহের গড়ে;
যদি রে তাঁরে ডাক্‌ব, মনে করি,
মন করি শুয়ে পড়ে।
কাঙ্গাল কয় দিলে প্রবোধ, মনযে অবোধ,
ছল করিয়ে সুপথ ছাড়ে;
ওরে সে গুপ্তিপাড়ার, মাটির মত,
শিব গড়াতে বানর গড়ে।

তুমি যেন মন ধোপার গাধা;
পরের বোঝা পিঠে করি বহিছ সদা।
যত তুলে দেয় বোঝা, যদিও হও কুঁজা,
তবু ব'য়ে বেড়াও সদা কাপড়ের গাদা।
ভারি বোঝা দিলে পরে, অনায়াসে বইতে পারে,
ভাতের কাটি দেখে শোয় গাধা;
তেম্‌নি তুমি হও দড়, বোঝ বও বড়,
কিন্তু তত্ত্বকাটি দেখে হয়ে যাও হ্যাদা।
ফিকির চাঁদ কয় শুনিয়ে ছড়া, "গাধা পিট্‌লে হয় না ঘোড়া"
নয় রে কোন কাজের সে কথা;

যদি আগুণ সঙ্গে রয়, আঙ্গরা ও আগুণ হয়,
তেম্নি মানুষের সঙ্গে ধ'রে মনুষ্য হ গাধা।

গুখোকো গোরু মন যে আমার অনিচ্ছায় খায়।
ঘাস জল উদর পুরে, দিলেও তারে,
সে যে ফিরে ফিরে চায়। (আড়ে আড়ে নরক পানে,)
খোল বিচালি নবীন দূর্ব্বা ঘাস,
গমের ভুসী জল মাখায়ে যোগাই বারমাস;
মন যে, স্বভাব দোষে, লোভের বশে,
গুতে হাবলা দিতে যায়। (পথে ঘাটে চল্‌তে ফির্‌তে)
বেঁধে যদি যোগাই ঘাস জল,
নূতন দড়ি ছিঁড়ে পালায়, এমনি গায়ের বল;
রাখ্‌লে, আগড় বেড়ায়, ভেঙ্গে পালায়,
গোরু রাখা হ'ল দায়। (ছ'দিক্‌ দিয়ে ছটা পালায়)
কুণ্ডলিনী বলে শোন্‌ কাঙ্গাল!
গোরক্ষ নাথ ডেকে কয়, ছয় গোরুর রাখাল,
তাঁরে সঁপে দিয়ে, থাক্‌ বসিয়ে,
বিবেক জ্ঞানের জ্যোৎস্নায়। (বিমল পথে গোরু যাবে)

আমি সোণা হ'য়ে মনের দোষে হলেম এবার মাটী,
তারে হাফরে পোড়ালাম কত তবু হয় না খাঁটী।
সে যে ধোপার গাধা, মন যে আমার;
সকল বইতে পারে, বৈতে নারে,
কেবল ভাতের কাঠি।
মন যে আবোল তাবোল, কতই বল্‌তে পারে;
তা'কে বল্‌তে বল্লে, বল্‌তে নারে,
কেবল তাঁর নামটি।
বলি মন পাখী রে, একবার বল হরি;
সে যে দাঁড়ে ব'সে, মনের খোসে,
করে কাটিকুটি।

কাঙ্গাল কয় আমার, নাই রে কপাট খুঁটী;
আমার মন পামরা ভাঙ্গা ঘরে,
সদাই দিচ্ছে টাটী।

কত আর বুঝাব আমি বল্ আমাকে,
কলুর বলদ অবোধ মন রে তোকে।
তুই বিষয় ভুষি খেয়ে, মনে খুসি হয়ে,
মায়াঠুসি দিলি রে চোখে;
ছুটে যাওয়া রে মুস্কিল, কাঁধে আঁটা খিল,
ঘুরে বেড়াস্ সদা পাকে পাকে। (ভবের গাছে)
ঘানি টেনে টেনে, কাতর হ'লে প্রাণে,
না টানিলে পাঁচনী হাঁকে;
ও তোর আত্মপরিবার, পিঠে দিয়ে ভার,
টানিছে নাকসী দিয়ে নাকে। (মন রে আমার)
ওরে কাঁদিয়ে কাঙ্গাল, করিছে হুওয়াল,
মন্ রে তোমার বেহাল দেখে;
আর কতকাল ঘুরিবি, খোসা ভুষি খাবি,
মায়াঠুসি দিয়ে থাক্‌বি চোখে। (মন রে আমার)

হয়েছ বনের শূকর, যেন পামর, মন রে আমার।
তুমি এক রোখে যাও, ফিরে না চাও, তোমার গোঁ ফিরান ভার ॥ বাঁয়ে চল,
রাখ্‌তে চাই সদা পরিস্কার, তুমি সূর্য্যের আলো সইতে নার, গা জ্বলে তোমার;
তাইতে কাদা দেখে সুখে সুখে, গায়ে মাখ অনিবার ॥ হায় রে পামর,
সকলে আলোয় থাকতে চায়, ওরে আলো দেখে তোমার কেন অঙ্গ জ্বলে যায়;
তুমি আলো দেখে উঠ ক্ষেপে, ভালবাস অন্ধকার ॥ হায় রে পামর,
ত্যজিয়ে আম কাঁটাল নিচু, তুমি স্বভাব দোষে মাটী খুঁড়ে খাও সদা কচু;
তুমি সকল ফেলে অবহেলে, বিষ্ঠা তুলে খাও আবার ॥
ফিকিরচাঁদ বুঝায় তোমাকে, ওরে কত আর আঁধারে রবে এস আলোকে;
ঐ দেখ ধরতে তোরে, ফাঁদ পেতেছে রে, রয়েছে কাল দুরাচার ॥ ব্যাধরূপে,

ভেবে ত দেখে না কেউ, কত যে ঢেউ, উঠছে সদা মেলদরিয়ায়।
কখন হ'য়ে রাজা, মারে মজা, মনেতে মন মনকলা খায়;
কখন পাদ্‌সা উজীর, কোটাল নাজীর, আবার ফকীর হ'য়ে বেড়ায়।
কখন ধনের জাঙ্গাল, কখন কাঙ্গাল, অট্টালিকা বৃক্ষ তলায়;
ওরে তোর মনের মাঝে, হাসিকান্না ঘরকন্না, এই সমুদায়।
ওরে মনের কথা, যেথা সেথা, ব'ল্লে আবার লোকে ক্ষেপায়;
এ পাগল কে নয় রে ভাই, মনে কথা ব'ল্লে সবাই, তা জানা যায়।
কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, পাগল করে, মনের কপাট ভেঙ্গে ফেলায়;
যদি সেই পাগল করা, পড়ে ধরা, তবে সকল পাগল হওয়ায়।

তবে কি বড়শী খেত, টোপ গিলিত, যদি মাছের মন থাকিত।
একবার সে টোপ গিলিয়ে, ছুটে গিয়ে, আবার এসে না গিলিত,
গলাতে বড়শী হানে, ছিপের টানে, ছটফটানি অবিরত।
একবার সে পেলে রে টের, কবে না ফের, এই ত জানি মনের রীত;
ওরে সে পড়ে দুঃখ, ঠেকে শিখে, হয় না লোভের অনুগত।
কাঙ্গাল কয় মানুষ হয়ে, মন হারায়ে হলেম আমি মাছের মত;
যাহাতে দিনরজনী, আত্মগ্লানি, তাই করি রে অবিরত।

আমার মন হ'ল না, সার কোন মতে।
কেবল অসার সংসার, ভাবিয়ে সুসার, সার অসার তাহা না পাবে জানিতে॥
হ'ত সুঁদর কি শাল, আম কি কাঁঠাল, মন যদি গাছের মাঝেতে;
তবে কিছুদিন পরে, সারে যেত সেরে, অমন করে যেত না অসারেতে॥
আমার মন দুরাশয়, বিষ্ঠা গোময়, হ'লেও পারতাম জানিতে;
একদিন লোকে করে আদর, সার হয়েছে গোবর
বলে তুলে দিত গাছের গোড়াতে॥
ফিকির বর্জন ক'রে, বুঝায় তোরে, সার আছে সংসারেতে;
তবে না হইলে সার, সারে চিনা ভার, অসারে কি সারে পারে চিনিতে॥

ভাবি তাই, আমি রাখ্‌ব্‌ কার মন, আমার দুদিকে দু'মাগী।
একজনের যোগালে মন, হয় যে আর জন, অভিমানে দেশত্যাগী॥ (হায়)
ছোটজন পুত্রবতী, সংসারে তার বড়ই মতি,
থাক্‌তে চায় দিবা রাতি, আমায় কাছে রাখি ;
সে সদা আমায়, প্রলোভ দেখায়, আঁখি ঘুরায় থাকি থাকি। (সে আবার)
বড় জন শান্তমতি, হয় নাই তার সন্তান সন্ততি,
তার ভারি আমার প্রতি ভালবাসা দেখি ;
তারে অনাদরে রাখি দূরে, ছাড়ে না তাও সে সুমুখী॥ (আমায়)
দু'মাগীর দু'মত মন, তাদের দিয়ে আমার এখন,
সংসারে থাকা বিষম বিপদ হ'ল দেখি ;
এখন বাঁচি প্রাণে, এই দুই জনে, ভালবাসায় মাখামাখি॥ (হায় হ'লে)
ফিকিরচাঁদ ভেবে মরে, এ বিষম ফাঁপড়ে প'ড়ে
রক্ষা পাই কেমন ক'রে, উপায় না দেখি ;
দিল যে জন মোরে, দু'মাগীরে, তার দয়া বই আর উপায় কি ? (এখন)

হায় রে ! আমায় ক'র্‌লে পাগল, কোথাকার এ দুটো মাগী।
দুদিকে টানাটানি, দিন রজনী, উপায় করি কি ?
বাঁয়ে যে মাগী টানে, সে নিষেধিলে নাহি মানে,
মন ভুলায় মধুর গানে, ঘুরায় আবার আঁখি ;
মাগী প্রাণ হরে অলঙ্কারে, জ্বলে যেন জোনাকী কি কি।
এ মাগীর কোটা বাড়ী, আরও আছে বহুত টাকা কড়ি,
ঘড়ি আর জুড়ি গাড়ী, সংখ্যা তার না দেখি ;
মাগী বিষয় জালে, পুরুষ ফেলে, বোঝা না যায় আসল নকল কি॥
যে মাগী দক্ষিণেতে, কোন অলঙ্কার নাই তার অঙ্গেতে,
কেবল তার স্বরূপেতে ভোলে দুটী আঁখি ;
মাগী সরলভাবে বলে সবে, আমার দিকে এসে হও সুখী॥
মাগীর নাই বিষয় আশয়, সুখ পাবে কয় কথায় কথায়,
আবার পরকাল দেখায়, আমায় বিধুমুখী ;
আমি বুঝতে নারি, ভেবে মরি, আছে কোথায় পরকাল বা কি॥
কাঙ্গাল কয় বিপদ ভারি, এ যে দুই পথে দুই রসের নারী,

যাই এখন কোন্ পথ ধরি, কার বা মন রাখি;
এই বিপদ ঘোরে, রাখ মোরে, দয়াময়! আজ কাতরে ডাকি॥

মানুষ বড় কিসে ভাবি তিন বেলা;
সে ত বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান পেয়ে, না বোঝে পরের জ্বালা।
গাছেতে ফল ধরে যত, নত হয়ে বিলায় সে ত, খায় না;
মানুষ ধন জ্ঞান বিদ্যা পেলে, লাগায় তালার উপর তোলা।
গাছের তলে ব'স্‌লে এসে, সে ত ছায়া দেয় রে, ভালবেসে দেখ না;
কাটতে গেলেও ছায়া দান করে রে, গাছ না হয় রে উতলা।
ঝড় বৃষ্টি শিলা সয়ে, আছে স্থির ভাবেতে দাঁড়াইয়ে, দেখ না;
যাচ্ছে এক উদ্দেশ্যে ঊর্দ্ধদেশে, তার শক্তি কি অচলা!
কাঙ্গাল বলে বড় যে জন, সে ত ফকীর হয় রে, পরের কারণ, দেখ্‌না;
ঘর ছেড়ে তাই যোগী ঋষি, সার করে গাছের তলা।

মরা মানুষের মরণের ভয়, কি চমৎকার, সকল আজব, এই আজব দুনিয়ার।
ভবে যে জন জন্মেছে, সে জন মরেছে, চিরকাল বেঁচে কে আছে আর;
তবু মরার কথা শুন্‌লে, চম্‌কে উঠে পীলে,
গায়ের রক্ত জল হয় সবাকার মরণ স্মরণ হলে,
স্বাধীন হইয়ে মানুষ, যখন নাই রে হুঁস, তখন মরা মানুষ বলে কারে;
যদি তাজা মানুষ হ'তো, আপনায় চিনিত,
তবে সে করিত হিত আপনার। (মরে থাকৃত না আর)
কাঙ্গাল বলিছে রে মন, পশুর আচরণ, মানুষ হয়ে যখন হ'ল তোমার;
এখন মরতে বাকী আর, কি আছে তোমার,
এ হ'তে কি মরণ আছে আবার। (মানুষ পশু হ'লে)

সবে হচ্ছে পার, যাচ্ছে এক খেওয়ায়।
একি চমৎকার কেহ কার, ছোঁয়া পানী নাহি খায়।
এক খেয়ারি তুলিয়ে নৌকায়, সকল জেতের পারে লয়ে যায়;
এক আকার, সবাকার, তবু জাত্‌ বিচার দেখায়।

এক নদীতে হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান আদি করিছে জলপান;
সেই জল তুলে, কেউ ছুলে অমনি ফেলে ফেলে দেয়।
এক বাতাসে সবে করছে বাস, সেই বাতাস আবার নিশ্বাস প্রশ্বাস;
তবু বিশ্বাস নাই, এক সবাই, অবিশ্বাস কথায় কথায়।
এক সূর্য্যের আলোক পায় সবায়, আঁধার নষ্ট এক চাঁদের জ্যোৎস্নায়;
তবু অসম্ভব, ভিন্ন ভাব, প্রেমভাব নাই দুনিয়ায়।
কাঙ্গাল বলিছে সকলেই সমান, সবে মুখে বলেন কাজে না দেখান;
বিনে তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, ভেদ জ্ঞান কভু না যায়।

ভবে একেরই খেলা, একেরই মেলা,
আহা মরি! কি কারখানা॥
একই আলোক আকাশে, দিন প্রকাশে, এক বাতাস বই প্রাণ বাঁচে না;
একই তাপেরই বলে, একই জলে, চলছে জগৎ তা দেখ না॥
যে বলে ধরা চলে, অস্তাচলে, সবাই চলে তা জান না;
সেই একই বলে, শূন্যে চলে, শশী তারা পথ ভোলে না॥
এইরূপে একে একে, দেখ চোকে, জগতের যত রচনা;
সে সকলই এক, ক'রেছেন এক, আজব পুরুষ তাঁয় চিন্‌লে না॥
সবেই ত দেখ রে এক, ভজ আর এক, কেন রে ভাই তাই বলনা;
দীন বলে, এস রে ভাই! মিলি সবাই, করি সেই একের ভজনা॥
(ভবপারের তরি রে ভাই, সেই এক জনা)

ভাব মন অধমতারণ সত্যশরণ, যার নামেতে পাষাণ গলে॥
যিনি এই গগণ তপন পাতাল ভুবন, শূন্য পবন স্থলে জলে;
কিবা আশ্চর্য্য কথন, নাই তাঁর চরণ, সমভাবে বেড়ান চলে॥
যিনি এই গাছ গাছড়ায়, দালান কোটায়, পত্র-কুটীর ঘরের চালে;
তিনি তোর দেলের মাঝে, ব'সে আছে, ভালমন্দ কথা বলে॥
যিনি সেই চীনতাতারে, রুম সহরে, বর্ম্মা কাশ্মীর খিল নেপালে;
তিনি তোর ভাতের প্রাণে, খাটের পাশে, নাচিয়ে বেড়ান মায়ে কোলে॥
যিনি তোর উপবীতে, চাপদাড়ীতে, বেদ পুরাণ কোরাণ বাইবেলে;
তিনি তোর, খোল খমকে, ঢোলে ঢাকে, আলখেল্লায় ঝুমঝুমি ঝোলে॥

যিনি সেই মস্‌জিদ গির্জ্জায়, ব্রাহ্মসভায়, শ্মশানে কি গাছের তলে ;
তিনি মোহন্ত আখ্‌ড়ায়, তুলসী তলায়, সর্ব্ব স্থানে ভূমণ্ডলে ॥
যিনি সেই ব্রহ্মপুত্রে, পেঁড় ক্ষেত্রে, ঘোষপাড়া কি বিন্ধ্যাচলে ;
তিনি শ্রীবৃন্দাবনে, কাশীধামে, মক্কা মদিনা চিত্থুলে ॥
যিনি সেই জাতি হিংসায়, বিবাদ ঘটায়, যুদ্ধ বাধায় সন্ধি স্থলে ;
তিনি যে অধীনতা, স্বাধীনতা, যা বল, তা সবার মূলে ॥
যিনি সেই গড়ের মাঠে, মনুমেণ্টে, রেলের রোডে ধুমকলে ;
তিনি যে নেড়া মাথায়, জুল্‌পী খোপায়, টাক্ পড়া কি আল্‌বার্ট চুলে ॥
যিনি তোর ভাত ব্যঞ্জনে, চুণে পানে, দধি দুগ্ধ শাক অম্বলে ;
তিনি তোর ধুতি চাদর, জামার ভিতর, কোট্ পেণ্টুলন শাল রুমালে ॥
যিনি সেই নাটক যাত্রায়, ঢপ্ অপেরায়, কবিকঙ্কন কবির দলে ;
তিনি পাঁচালীর ছড়ায়, হাফ্ আখড়ায়, ঝুমুর খেম্‌টা বাই মহলে ॥
যিনি সেই কথকতায়, রসিকতায়, বক্তৃতায় কি পণ্ডিত টোলে ;
তিনি তোর ছেঁড়া ছালায়, কৌপীন ঝোলায়, গোধুড়ি কিম্বা কম্বলে ॥
ফিকিরচাঁদ বলে তোরে, করে ধ'রে, মূল হারালি ভুলের মূলে ;
থুয়ে ধন চালের বাতায়, জল যে হাতড়ায়, তাকেই লোকে পাগল বলে ॥

ওরে ফিকির বেজে, আমায় বল্ দেখি রে সেই কথা।
যখন ছিলি মোর উদরে উধ ক'রে মাথা ;
ভাল, শুতি নেতি কেমন ক'রে, জমিন্ ত আধ হাতা ॥
বল, কেবা দিত চা'ল ডা'ল, বাজার ছিল সেথা ;
আর, কেবা তোমার যোগাড় দিত, আহার পেতিস্ কোথা ?
আমি ত তা বুঝ্‌ব না রে, ব'ল্‌লে নাতা পাতা ;
সেথা, দশ্ মাস দশ্ দিন গেছে, নয় দু' এক দিনের কথা ॥
ফিকিরচাঁদ কয় দি'ছল খেতে, অদ্ভুত এক মাতা ;
তিনি, আমার মাতা নয় শুধু, এই জগতের হন মাতা ॥

পাথর আর সীসে লোহা, দেখে যাহা, তাকেই লোকে কঠিন বলে।
এ সকল নয় রে কঠিন, গলে একদিন, সুকৌশলে উত্তাপ দিলে।
ওরে ভাই কঠিন হৃদয়, সেই ত রে কয়, পর-দুঃখে যে না গলে ॥

অকালের ক্ষুধার জ্বালায়, সিং দরজায়, অনাথ ভাসে চক্ষের জলে ;
সে কি ভাই কঠিন নয় রে, উদর পূরে, যে খায় অন্ন তারে ফেলে ॥
ধনী যায় টাকার জোরে, রাজদ্বারে, ছলে বলে ক্যারে ফেলে ;
সেই ত রে কঠিন পাথর, না হয় কাতর যার হৃদয়, তার বিপদ কালে ॥
কাঙ্গাল কয় পাষাণ সম, হৃদয় মম, হচ্ছে ক্রমে কর্ম্মফলে।
যিনি মোর পিতা মাতা, অন্নদাতা তাঁর নামেতে নাহি গলে ॥

ফকীরের সজ্জা ধ'রে, বিলাস ছেড়ে, নাচে কি মন ইচ্ছা ক'রে।
যিনি হন জগৎস্বামী, অন্তর্যামী, তিনি জানেন সব অন্তরে ;
তিনি যে নাচান্ সদাই, নাচি রে তাই, নইলে নাচ্‌তে পা কি সরে।
কাটিয়ে মনের ধাঁধা, সংসার বাধা, ফকীর হয় যে ফিকির ক'রে ;
সে জন জেনেছে রে, তার কাছে রে, ফকীর হয় লোক, কেমন ক'রে।
কাঙ্গাল কয় নাম মহিমায়, বোবা গান গায়, পাথর লোহা গ'লে যায় রে ;
ও তার দৃষ্টান্ত হেথা, দেখ যথা, আমার কথা স্মরণ ক'রে।

অনিত্যতা।

ভাই রে, কে তুমি এই শ্মশান-শয্যায় ;
সন্ন্যাসীর বেশে, হায় শেষে, কে তোমায় দিল বিদায়।
ভাই রে, যদি হও মুলুকের বাদসা, তবে কে করিল এ হেন দশা ;
তোমার সৈন্যবল, কল কৌশল, সে সকল এখন কোথায়।
ভাই রে, তোমার সেই অতুল ধন রাশি, এখন কারে দিয়ে, সাজ্‌লে সন্ন্যাসী ;
তোমার কৈ বাড়ী, সে গাড়ী, জুড়ি এখন কে হাঁকায়।
ভাই রে, যদি হও তুমি মান্যমান, কুল মর্য্যাদায় সব কুলীন প্রধান ;
তোমার সে মান্য, কৌলিন্য, প্রাধান্য এখন কোথায়।
ভাই রে, যদি হও দীনহীন কাঙ্গাল, তবে ধনীর দ্বারে যত খেয়ে গা'ল ;
ভিক্ষা ক'রেছ, কেঁদেছ, এখন সে জ্বালা নিভায়।
কাঙ্গাল বলিছে, কাঙ্গাল ধনবান, গেলে শ্মশানে হয় সকলেই সমান ;
জাতি কুল বিচার, অহঙ্কার, কোন বিচার নাই তথায়।

করিস্ তুই এত যতন, কেন রে মন, মাটির দেহ ছাপাই তরে।
শরীরে লাগ্‌লে ধুলা, ভাবিস্ জ্বালা, মুছাস্ কত যতন ক'রে;
সে শরীর কোথা রবে, কে ধোয়াবে, যাবি যে দিন নদীর চরে।
কোথা তোর রবে সাবান, তেল পোমেটম্, ধর্‌বে যে দিন শমন তোরে;
থাক্‌বে না আয়না চিরুণ, যার জোরে মন, বেড়াস্ এত টেরি ক'রে।
ওরে তুই ঘাটে গিয়ে, গামছা দিয়ে, মাজিস্ দেহ যতন ক'রে;
সে দেহ আগুণ দিয়ে, ছাই করিয়ে, দেবে তোরে ছারেখারে।
যে বদন বারে বারে, যতন কোরে, দেখ রে মন আয়না ধ'রে;
সে মুখে বিমুখ হ'য়ে, আগুণ দিয়ে, পোড়াইবে জ্ঞাতিতে রে।
ফিকিরচাঁদ বলে রে মন, এ কি মরণ! অসারকে সার ভাবিয়ে রে;
যেতে রস পারাবারে, পথ ভুলে রে, মলি মন তুই গো-ভাগাড়ে।

দেখ ভাই জলের বুদ্বুদ্, কিবা অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আজব খেলা।
আজি কেউ পাদ্‌সা হ'য়ে, দোস্ত লয়ে, রং মহলে ক'র্‌ছে খেলা;
কাল আবার সব হারায়ে, ফকীর হ'য়ে, সার ক'রেছে গাছের তলা।
আজি কেউ ধন গরিমায়, লোকের মাথায়, মার্‌ছে জুত এরিতলা;
কাল আবার কোপ্‌নী পরে, টুক্‌নী ধরে, কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা।
আজ রে যেখানে সহর, কত নহর, বসিয়াছে বাজার মেলা;
কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি, ক'র্‌ছে রে তরঙ্গ-খেলা।
কাঙ্গাল কয় পাদ্‌সা উজীর, কাঙ্গাল ফকীর, সকলি ভাই ভোজের খেলা;
মন তুমি যখন যা হও, ঠিক পথে রও, ধর্ম্মকে ক'র না হেলা।

দুনিয়ার সব কেবল ফাকি ভাই, ইহার কিছুতেই আর বিশ্বাস নাই।
পিতা-মাতা ভাই বেরাদার,
ছেলে মেয়ে কেবা রে ভাই আপ্ত পরিবার; (ভেবে দেখ)
ইহার কেউ কারু নয়, সব ফাকি হয়, মায়ায় ভুলে রয় সবাই।
বিষয় আশয় ধন কি পয়সা, যত দেখ সকলি ত ভোজবাজির পাশি; (ভেবে দেখ)
এরা এক আস্‌তেছে, এক যেতেছে, ঠিক থাকবার যো নাই;
আপন প্রাণের মত আপন কেহ নাই, যে পরাণে বিশ্বাস নাই ভাই,
এক তিলের তরে; (ওরে ভাই)

যখন চ'লে যাবে, কে ঠেকাবে, ঠেকাবার যো কা'র নাই,
ফকির ফিকিরচাঁদ কয় মনের খেদে রে, আমি মিছে মায়ায় ভুলে থেকে
পড়েছি ফেরে; (ওরে ভাই)
ও যে দুনিয়ার সার, চিন্‌লাম না তার, মুখে আমার পড়ুক ছাই।

রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।
এই যে আমার আমার, সব ফক্কিকার, কেবল তোমার নামটী রবে;
হবে সব লীলা সাঙ্গ, সোণার অঙ্গ, ধুলায় গড়াগড়ি যাবে।
সংসারের মিছে বাজী, ভোজের বাজী, সব কারসাজি ফুরাইবে;
তখন যে এক পলকে, তিন ঝলকে, সকল আশা ঘুচে যাবে।
তোমার এই আত্ম স্বজন, ভাই পরিজন, হায় হায় ক'রে কাঁদ্‌বে সবে;
তারা ত পেয়ে ব্যথা, ভাঙ্গবে মাথা, তুমি কথা না কহিবে।
তোমার সব টাকা কড়ি, ঘর বাড়ী, ঘড়ী গাড়ী পড়ে রবে;
আবার রে পা থাকিতে, হাত রহিতে, পরের কাঁধে যেতে হবে।
আগে যে ক'রে হেলা, গেল বেলা, সন্ধ্যাবেলা আর কি হবে;
জগতের কারণ যিনি, দয়ার খনি, তিনি 'মশার' ভরসা ভবে।

বর্ত্তমান মাসের শেষে, হাব দেশে, দারুণ একটা জুল্‌মত এবার।
থাক্‌বে না মানুষ গোরু, শিষ্য গুরু, মোট্টা সরু যত প্রকার;
বাদ্‌সা কি রাজা রুজরো, পাজি পুজরো, সকল কুঁজ্‌রো ঠিক্ করিবার।
থাক্‌বে না মুটে মজুর, কর্ত্তা হুজুর, বালক বাছুর এ দেশাচার;
থাক্‌বে না দারগগিরি, মাজেষ্টরি, গবর্ণরী মান্‌বে না আর।
উল্‌টাবে এ তিন সংসার, সব একাকার, থাকবে না রে আচার ব্যভার;
বামুন কি কায়েৎ কামার, মুচি চামার, থাক্‌বে না আর জেতের বিচার।
ফিকিরচাঁদ ফকীরে কয়, দালান কোটায়, বাঁচবার যো নাই ভাইরে এবার;
আছে এর এক সদুপায়, দীনদয়াময়, ডাক্‌লে পরে পাবি নিস্তার।

এ সংসারে সুখ আর কোথায়,
পদে পদে বিপদ এত, তবু ফের সুখের আশায়।
জমিদারী তেজারতি, সিন্ধুকে টাকার পুঁতি, অনুগত বন্ধু জ্ঞাতি দরজায়;

দু'দিন পরে সকল গেল, বসত বাড়ী অন্যের হ'ল,
ভিক্ষার ঝুলি সম্বল, ভিক্ষা নাহি মেলে কোথায়।
আজ হ'ল পায়া ভারি, মুলুকের সুবাদারি, হাতী আর ঘোড়া গাড়ী দরজায়;
ওরে কাল আবার গেল সে পদ, ঘটিল রে ঘোর বিপদ,
রাজার বিচারে গারদ, লোহার বেড়ী কোলে রে পায়।
আজ ঘরে রূপবতী, পরম নারী সতী, সুখী হও দিবারাত্রি যার সেবায়;
কাল আবার এসে শমন, সে রমণীধন কর্‌ল হরণ,
আঁধার দেখ ত্রিভুবন, বুক ভাসে রে চোখের ধারায়।
আজ আবার পুত্রধনে, কোলে ক'রে যতনে, সে মুখ চুম্বনে সুখী সর্ব্বদায়;
হায় রে আবার একি হোল, মৃত পুত্রের অঙ্গে চক্ষের জল,
সকল সুখ ফুরাইল, বজ্রাঘাত হ'ল মাথায়।
আকাশে আশার জাঙ্গাল, বাঁধিয়ে অবোধ কাঙ্গাল,
হতেছে হাল্‌কে বেহাল, সুখ আশায়;
যে সংসারে দেয় যন্ত্রণা, করি সেই সংসারের আরাধনা,
হায় রে কি বিড়ম্বনা, ঘুচাও হরি এ যন্ত্রণায়॥

এ দেহের দশা এই ত, তবে এত, গরব বল কিসে তোমার।
কাল যে দেহের শোভা, মনোলোভা, রূপে ফাটে জগৎ সংসার;
সে দেহ সামান্য রোগে, কিঞ্চিৎ ভোগে, জরা জীর্ণ কুৎসিত আবার।
যে দেহের রূপ বাড়াতে, দিনে রেতে, দিতে কত চন্দন সার;
এখন সে দেহ জরা, পূঁয়ে ভরা, কেহ কাছে বসে না আর।
যে দেহ সার ভেবেছ, সাজায়েছ, দিয়ে কত বস্ত্রালঙ্কার;
সেই দেহে ভন্‌ভনাচ্ছে, উড়ে আস্‌ছে, বসিয়াছে মাছির বাজার।
কাঙ্গাল কয় রক্ত মাংসের, শরীর যাদের, তাদের দশা একই প্রকার;
কখন কার কি ঘটিবে, কে কহিবে, ক'র না দেহের অহঙ্কার।

দুলিয়া বাঁশের দোলায়, যাচ্ছ কোথায়, বল রে ভাই তাই জিজ্ঞাসি।
বাঁশের চাটাই বিছায়ে, শোয়াইয়ে, বাধন দিয়ে তিন রশি;
হরিবোল বলি মুখে, মনোদুঃখে, বহিতেছে প্রতিবাসী।
স্বজাতি কুটুম্ব সকল)

তোমার যে অট্টালিকা, বালক বালিকা, প্রেয়সী নারী রূপসী ;
এ সকল পাশরিয়ে, কারে দিয়ে, নীরবে হও শ্মশানবাসী।
(কারে ভাই, কি দুঃখেতে)
যে ধন আমার বলে, বাক্সে তুলে, পাহারা দাও দিবা নিশি ;
এখন তোর সে ধন কোথায়, সঙ্গে না যায়, সাথের সাথী কাচা কলসী,
(ছেঁড়া লেপ কাঁথা বালিশ)
ফিকির কয় প্রাণাবধি সম্বন্ধবিধি, তার পরে চড়কে হাসি ;
অল্পক্ষণ কান্নাকাটি, কেউ দেয় মাটি, কেউ করিছে ভস্মরাশি।
(সকল সম্বন্ধের দেহ)

এ সংসারের এই ত দশা,
ভালবাসার আশা এতে, মরুভূমে জল পিপাসা।
শরীর খাটায়ে যখন, কররে ধন উপার্জ্জন, সকলেই জানায় ভালবাসা ;
শরীর অচল হয় রে যখন, পুত্র কন্যা স্ত্রীপরিজন,
বিষ নয়নে দেখে তখন, বন্ধু না করে জিজ্ঞাসা।
ক্ষমতা যখন থাকে, সম্ভ্রমে সবাই ডাকে, কর্ত্তা বলিয়ে করে প্রশংসা ;
ক্ষমতার হানি হ'লে, তখন বায়াত্তুরে বুড় বলে
কত নিন্দা করে ছলে, পড়সী বলে কটু ভাষা।
চিরকাল বাতাস খেয়ে, মাথার ঘাম ফেলে পায়ে, সংসারের কর্‌লে সেবা শুশ্রূষা ;
রোগে হ'লে জীর্ণ দেহ, বিশ্বাস না করে কেহ,
বকায়ার নিকাশ ধরে, বোকা বলে মাঠের চাষা।
জানিয়ে সংসারের রীত, সংসারে করে পীড়িত, কাঙ্গালের বিপরীত দুর্দ্দশা ;
বল্‌তে প্রাণের কথা ব্যথা, স্থান সে পায় কোথা,
বোকা কাঙ্গাল তবু বৃথা, না ভাঙ্গে সংসারের বাসা।

ওরে ভাই সকল ফাকি, শেষ দশা কি, মনে একবার ভেবে দেখলে।
মানুষে করে যখন, ধন উপার্জ্জন, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ;
তখন্ রে ধনের তরে মধুর স্বরে, সবাই ডাকে কর্ত্তা ব'লে।
যদি রে ধন উপার্জ্জন, না হয় কখন, নিন্দা করে কথার ছলে ;
গৃহিণীর মুখ হয় তোলো, ছেলে গুলো, নাহি ডাকে বাবা ব'লে

দিয়ে রে ছাই উদরে, সিন্ধুক পূরে, ধন দৌলত রেখেও ম'লে ;
শ্মশানে লবে যখন, বাধ্‌বে তখন, একখান ছেঁড়া চাটাই ফেলে।
তুমি যে গিন্নির ঠাটে, খেটে খেটে, সোণার শরীর মাটী ক'র্‌লে ;
শ্মশানে লবে যখন, হয় ত তখন, তিনি দেবেন গোবর গুলে।
কাঙ্গাল যে ভবের মুটে, খেটে, খেটে, জব্দ এখন এই শেষকালে ;
বুড় বলদের মত, কষ্ট কত, স্থান না পায় আর কোন স্থলে।

সংসারের ভালবাসা, সুখের আশা, জলের আশা মরীচিকায়।
যখন থাকে রে অর্থ, পদ পদার্থ, হাসে ঘ্যাসে কথায় কথায় ;
জ্ঞাতি কুটম্ব স্বজন, পুরুত বামন, সবাই ভালবাসা দেখায়।
যখন না থাকে অর্থ, পদ পদার্থ, সকল স্বার্থ ফুরায়ে যায় ;
তখন না কাছে আসে, কেউ জিজ্ঞাসে, চু'স লাগিলে মাথায় মাথায়।
সংসারের আত্মীয়তা বান্ধবতা, স্বার্থ মাখা সকলের গায় ;
বিনে রে স্বার্থ সাধন, আছে ক'জন, পরের দুঃখে কেঁদে বেড়ায়।
জ্ঞাত বন্ধু পিতা পুত্র, গুরু ছাত্র, কেবা ভালবাসে কাহয়া ;
ওরে ভাই ! স্বপদ গেলে, বিপদ প'লে, তখনই ত' তা জানা যায়।
কাঙ্গাল কয় আছে এক জন, ওবে সে জন, টাকাকড়ি কিছু না চায় ;
তারে না ভালবাসলেও ভালবাসে, ভালবাস্‌লে হৃদয় জুড়ায়॥

বাবুজীর শেষ হয়েছে, দেহ আছে, মাটীতে পড়ে অন্তর্জ্জলে।
গৃহিণীর কান্নাকাটি, ছুটাছুটি মরিতে যায় ডুবে জলে ;
পাঁচ জনে ধ'রে এনে, শব যেখানে বুঝায় প্রবোধ বচনে।
(ছি মা ! অমন করিতে নাই)
প্রতিবেশী রমণী এক, ডেকে কয় দেখ, ভাল বালিশ হাতে তুলে ;
এইটি কি কর্ত্তার সাতে, হবে দিতে, দেখে আমায় দাও বলে।
(কোন বালিশ বিছানা দিব)
গৃহিণী বালিশ দেখে, কান্না রেখে, উচ্চ সুরে ডেকে বলে ;
ছেঁড়া ছুটো মলা যা পাও, তাই ফেলে দাও, ও সব ভাল রাখ তুলে।
(অমন আর কে এনে

ফিকির কয় কেবল অসার, ওরে, সংসার, প্রণমি তোর চরণতলে ;
সহেনা কপট রোদন, মায়া বাধন কেটে দে, যাই আমি চলে।
(স্বার্থপর ভালবাসা)

কাঙ্গাল কয় পুরুষ অবোধ, কলুর বলদ, নারী খাটায় প্রেমের ছলে ;
দেখে তা বোঝে না মন, বোকা এমন নারীকে প্রেয়সী বলে।
(প্রিয়বস্তু ভুলে গিয়ে)

এই ত সম্বন্ধের কথা প্রাণের ব্যথা, সকল বৃথা ভাবতে গেলে।
যখন রে রোগে জরা, শয্যাধরা, অঙ্গ ভরা মূত্র মলে ;
কেহ না কাছে এসে ঘেসে বসে, হাতে রূপচাঁদ না থাকিলে।
থাক্‌লে রে হাতে রূপচাঁদ, নাই আর প্রমাদ, প্রসাদ ভিক্ষা চায় সকলে ;
জ্ঞাতি কুটুম্ব স্বজন, এসে তখন মলমূত্র টেনে ফেলে।
যার নাই রে টাকা কড়ি, কোটা বাড়ী, তার যে বিপদ মরণ কালে ;
ডাক্‌লে না কথা শোনে, বন্ধুগণে, পালিয়ে ফেরে কাজের ছলে।
কাঙ্গাল কয় অমঙ্গলের, ভয় সকলের, মর্‌তে দেয় না বাঁধনতলে ;
পরকাল ছলনাতে, প্রাণ থাকিতে, বাইরে এনে টেনে ফেলে।
এ কাঙ্গাল-ফিকির আবার বলে এবার, কি ঘটে রে মোর কপালে ;
দয়াময় নিজগুণে শ্রীচরণে, স্থান দিও অন্তিমকালে।

হায় রে, এ সংসারেতে সুখ আশা কেবল বিড়ম্বন।
লোকের সুখ-বাসনা, সাপের ফণা করে ধারণ। (রজ্জু ভ্রমে)
আজ কেউ মনোল্লাসে, রাজসিংহাসনে ব'সে হাসে,
কাল আবার শত্রু এসে, রোষে করে বন্ধন ;
তখন, কোথা পাত্র, কোথা মিত্র, দারাপুত্র রয় ধন রে। (তখন)
আজ কেউ ধনের তরে, বুক ফুলায়ে অহঙ্কারে,
কারে মারে কারে ধরে, কারে করে ভর্ৎসন ;
আবার সব হারায়ে, ফকির হ'য়ে, দেশে দেশে করে ভ্রমণ। (কাল আবার)
আজ কেউ পুত্র ধনে, হৃদে ধ'রে সযতনে,
স্নেহে সেই চাঁদ বদনে করে শত চুম্বন ;

আবার ধরাতলে তারে ফেলে, মৃতদেহে অশ্রুবর্ষণ রে। (পুত্রের)
কাঁদিয়ে কাঙ্গাল বলে, সুখ যদি চাও ভূমণ্ডলে,
অভিমান গরল ফেলে, সরল কর হৃদয় মন ;
ছাড় দ্বেষ হিংসা, পরনিন্দা, পরকুৎসা পরপীড়ন রে। (ছাড়)

হায় রে! এখন আমি কি করি উপায় ?
ঐ যে, রণ বেশে, শমন এসে, সম্মুখে দাঁড়ায় ॥
ভাব নাই আমার কারু সাথে, ছটি ভাই চলে ছয় পথে ;
কি সে ত্রাণ পাব রে, সমন সমরেতে,
যোগ দিলে মন তাদের মতে, বৈরী সমুদায় ॥
আপন ব'লে নিশি দিবা, করলাম যে দশ জনের সেবা ;
তারা আপন না হ'ল রে, কাল পেয়ে কালের অনুগত,
তারা আমায় রেখে একা, আগে যে পালায় ॥
কাঙ্গাল বলে বিনয় ক'রে, ভায়ে ভায়ে বিবাদ যে ঘরে ;
তাদের মঙ্গল নাই রে, রণে বনে কোন স্থানে,
বল সে জন সমরে, বিজয় হয় কোথায় ॥

ভবে আসা যাওয়া আজব কারখানা।
তুমি; পড়ে শুনে, চোখে দেখে, তবু হয়ে র'লে কাণা ॥
গ্রহ তিথি মাস স্ত, ঘোরে ফেরে অবিরত দেখ্না ;
আবার বছর গেলে, বছর আসে, কেবল দিন গেলে ক্ষণ হয় না ॥
যেমন, আবর্জ্জনা স্রোতে ভেসে, গিয়ে দোয়ানীতে ফিরে আসে দেখ্না ;
তেমন চন্দ্র সূর্য্য ঘুরছে ফিরছে, কিন্তু ছাড়্ছে না তার ঠিক্না ॥
গাছেতে ফল, ফলেতে গাছ, কেবল, পৃথক্ মাত্র দুদিন আগ্ পাছ্ দেখ্না ;
তেমনি সন্তান হ'তে, আত্মা ঘোরে, কেমন দুনিয়ার ঘটনা ॥
দেখ, প্রকৃতি দেয় প্রকৃতি খায়, আবার প্রকৃতিকে প্রকৃতি কয় দেখ্না ;
আজ, ফিকিরচাঁদ প্রকৃতি পাগল, দেখে ছিন্নমস্তার নাচ্না ॥
ফিকিরচাঁদ কয় দীন দরদি, ঘুরে সংসার-ঘানে নিরবধি সয় না ;
এবার, এই দয়া করিবে মোরে, যেন আবার ঘুরতে হয় না ॥

মরি রে কি কিতাবৎ, ঘুরছে জগৎ, বদ্ধ হয়ে এক দড়িতে।
এ দড়ি দেখা যায় না, ছেঁড়া যায় না, কাটা যায় না অস্ত্রাঘাতে;
জলে তে ডোবে না রে, পচেনারে, পোড়েনা রে আগুনেতে॥
যদি কেউ গায়ের জোরে, দড়ি ছিঁড়ে, যেতে চায় রে দেশান্তরে;
গোছরের গোরুর মত অবিরত, ঘুরে বেড়ায় চার দিকেতে॥
যদি কেউ না বুঝিয়ে, ফকির হয়ে দড়ি কাটে আচম্বিতে;
ওরে তার গলার দড়ি, হয়ে বেড়ী, জড়িয়ে ধরে দুই পায়েতে॥
ধর্ম্ম কি বুঝে যে জন, কাটে বাঁধন, জ্ঞান বিবেকের সুধারেতে;
তবে রে ফকীর হওয়া, গৃহে রওয়া, সকল সমান তার পক্ষেতে॥
দীন হীন কাঙ্গাল বলে, ছলে বলে পারে না কেউ দড়ী কাট্‌তে।
যদি দড়ি, চাও রে কাট্‌তে, জ্ঞান অস্ত্রেতে কাট, তবে পারবে কাট্‌তে॥

এ সব খেলা বা কার, ভেবে দেখ রে মন আমার।
হায় রে! মূল ছেড়ে ডালেতে পয়দা দুনিয়ার॥
অপ্ তেজ মরুৎ আদি পাঁচটী বস্তু মিলিয়ে;
পশু পক্ষী আদি বৃক্ষ সকলি দেয় সৃজিয়ে।
দেহ অন্তে যার যার অংশ, সকলি লয় হরিয়ে,
তারা, নিলে অংশ অস্থি মাংস রস গন্ধ রয় না তার॥ (মন আমার)
ওরে, তিন হতে উঠিয়ে এক চিজ, প্রথমেতে আস্‌মান ধায়,
পরে, বারি রূপে পড়ে ভূমে, জীব সবার জীবন দেয়;
সৃষ্টির মূলে সেই সহায়, এখনও তারই কৃপায়,
তার জিনিস যা থাক্‌তে তোতে' ছাড়বে না সে মন তোমার॥ (মন আমার)
জল বায়ু মৃত্তিকা কিরণ, ইতে যখন মিশিবে,
ফিকির তোমার ফিকির করা, জগতেতে না রবে;
শূন্যময় দেখিবে সবে, তুমি শূন্য না রবে,
তাই থাক্‌তে বেলা, ভাঙ্গ খেলা, ছাড় দম্ভ অহঙ্কার॥ (মন আমার,)

ও মন, দেখ্ রে চেয়ে আজব তামাসা, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল জুড়ে এক পাখীর বাসা।
সকলে রয়েছে সে বাসায়, বাসা দেখা যায় রে, ধরতে গেলে ধরা নাহি যায়;
বাসার মাঝে আছে কত ডিম আবার, ও তা গণতে পণ্ডিত হয় চাষা। রে,

এক এক ডিমে কত কারখানা,
ও তা গণা যায় না কেউ জানে না কত হয় ছানা ;
এক পাখীতে সবার আধার যোগায় রে, সবে সমান তার ভালবাসা। ওরে,
আধার যোগায় পাখী সর্ব্বক্ষণ,
কিন্তু কেউ কখন দেখে নাই রে পাখীটী কেমন ;
পাখী আছে সদা বাসা জুড়ে রে, কিন্তু সে ত কারু নয় পোষা। রে,
কাঙ্গাল বলে পাখীর ধরণ, সে ত আপ্‌নি এসে দেখা দেয়, ইচ্ছা হয় যখন ;
তারে দেখে, কিন্তু সে হয় কেমন রে, ও তা বল্‌বার মত নাই ভাষা। ওরে,

পুরুষপ্রকৃতি তত্ত্ব।

দেখ, আসমান্ জুড়ে আছে আজব পুরুষ এক জনা।
লোকে, যাহা হেরে, যাহা করে, সকলই তাঁর কারখানা॥
(ওরে ও ভাই !)
আকাশ তাঁরে বেড়ে নাহি পায়, তাই সে পুরুষ চিরকালই লেংঠা হয়ে রয় ;
সে ত সকল স্থলে, আস্‌মান জলে, নিজে কিন্তু চলে না।
(সকল চালায়)
সে পুরুষের সকলই আজব,
হাত বিনে সে গ্রহণ করে, কান নাই, শোনে সব,
সে ত বিনা চোখে সকল দেখে, কেউ ত তারে দেখে না॥
(ওরে ও ভাই !)
পুরুষ যেমন রমণী তেমন, তারা দু'জনে মিলিয়ে করে জগত সৃজন ;
আবার স্ত্রী পুরুষে যখন মিশে, তখন কিছুই থাকে না॥
(এব্রহ্মাণ্ডের।)
কাঙ্গাল কাঁদে চক্ষে পড়ে জল,
এদের স্ত্রী পুরুষের দেখ রে ভাই ! অনন্ত সকল ;
এদের খেলার মাঝে, যে রস আছে, কর রে তাই ভাবনা॥
(ওরে ও ভাই !)

মরি কার, এ বালিকা ধূলা খেলা খেলিতেছে।
এই যে অসীম জগতের মাঝে একাকিনী বসে আছে ॥
(অভয়া হয়ে)
আহা! গড়্‌ছে কত ধূলার ঘর, দেখিতে কি সুন্দর!
ঘর আপনি গ'ড়ে আপন রসে হাসিতেছে;
ঘর আপনি গ'ড়ে আপনি ধ'রে ভেঙ্গে চুরে ফেলিতেছে ॥ (গড়া ঘর)
আপনি পুরুষ আপনি মেয়ে, আপনি দেয় আপনার বিয়ে,
আপনার মত পুরুষ মেয়ে প্রসব করিছে;
ঐ যে, প্রসব ক'রে, বুকে ধ'রে স্তন দিয়ে প্রাণ বধিতেছে। (মা হ'য়ে)
খেলার ঘর নারী নরে, চারিদিকে আছে ঘিরে,
কুমারের চাকের মত ঘুরিতেছে,
কে বলতে পারে, অবিরত কত হয় কত যেতেছে ॥ (খেলার ঘরে)
এক, মায়ের কোলে সবাই আছে, পৃথক্ পৃথক্ ভাবিতেছে,
যে যেমন ভাবে, সে তেমন দেখিতেছে,
ঐ যে, ভাঙাভঙা জমাজয়া মারাকারা দেখিতেছে। (সকলে)
খেলাচুরো ভাঙ্গলাম ব'লে, মেয়ে যখন যাচ্ছে চলে,
ঘর নর মিশে তখন এক হতেছে;
এ দীন্ কাঙ্গাল বলে, জল বিম্ব জল হয়ে জলে মিশিতেছে ॥ (স্থলে জল)

এ মাগী কি ভাতার সোহাগী।
জগৎ জুড়ে বুড় একটা, তার উপরে এক মাগী ॥ রে,
সবার মত বুড় রয়েছে, তার উপরে, দিবানিশি মাগী নাচিছে;
মাগীর নাচা গোচা বুঝা যেত রে, যদি এ বুড় হ'ত রাগী ॥ রে—
বুড়র জোরে মাগী নাচিছে, নিতুই নূতন সাজে আপনার অঙ্গ সাজাচ্ছে;
মাগী সাজে আবার, জগৎ সাজায় রে, বুড় হ'য়েছে তাই বিরাগী ॥ রে—
জগৎ জুড়ে মাগীর ঘরকন্না, মাগীর খেলায় এ জগতের হাসি আর কান্না;
বুড় নিগুণে, তার মাগী স্বগুণে, জগৎ প্রকাশ তাই মাগীর লাগি ॥ রে—
কাঙ্গাল কাঁদে হইয়ে আকুল, বুড়র ভাবনা বুঝে, ভেবে ভেবে হ'লেন রে বাতুল,
বুড় মাগী সাজায়, নিজে সাজে না, সাজ্‌লে হ'ত সুখ দুঃখের ভাগী। রে—

সাধন তত্ত্ব।

কেন মন মর ভুগে, ভব রোগে, যোগে যাগে ঔষুধ কর।
আছে রে অনেক সুযোগ, অনেক প্রয়োগ, তাই বলি মনোযোগ কর;
সাধুজন সহবাসে, সুবাতাসে, শীতল হবে হৃদয় তোর।
এ ত রে নয় অন্য রোগ, হয় বায়ু রোগ, উনপঞ্চাশ সংখ্যা তার;
আছে এর মহৌষধি, পরম বিধি, চিন্তামণি সেবন কর।
কাঙ্গাল কয় পঞ্চযোগে, স্থিতি ক'রে, ষড়যোগে বচ্ছে জ্বর;
হায়, আমার যোগ তাই, হ'লো না ভাই, মিছামিছি আড়ম্বর।

মনে না বিবেক হ'লে, ভেক লইলে, কেবল রে তার বিড়ম্বনা।
মনে তোর টাকা কড়ি, কোঠা বাড়ী, কিসে হবে সেই ভাবনা;
বাহিরে তিলক ঝোলা, জপের মালা, দেখে ত ভাই সে ভুল্‌বে না।
বাহিরে মোড়া মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, মনের মধ্যে কুবাসনা;
তাই ত মাগীর তরে, ভিক্ষা ক'রে, বেড়াও, আসল ঠিক থাকে না।
কাঙ্গাল কয় কুবাসনা, মনের মধ্যে থাক্‌লে না হয় উপাসনা;
যদি বৈরাগী হ'তে, ইচ্ছা তরে, ছাই কর ভাই কুবাসনা।

যদি, বৈরাগী হবে, শুন তবে, তার উপায় রে মন!
গুরুপদারবিন্দে, যশঃ নিন্দে, কামাদি কর অর্পণ।
(তোমার সর্ব্বস্বধন)
তোমার, দেহ ভাণ্ডে যথা সর্ব্বস্ব, কাম ক্রোধ লোভ মোহ সুখ ঐশ্বর্য্য,
এ সব বিষয় গেল, আশয় ব'ল, শ্রীগুরু চরণ সাধন॥
(এই ত বৈরাগী লক্ষণ)
কাম ক্রোধ যার রাজা হয়েছে, বন্দী ক'রে কারাগারে ফাটক খাটাচ্ছে;
ও তার, রাগানুগা, কাম সোহাগা, গড়াছে কালের গড়ন।
(সং সাজাইতে)
জ্ঞান প্রেম শ্রীগুরুর চরণ, সর্ব্বরাগে সর্ব্বক্ষণ যে করে রমণ,
সেই ত, রাগ বিরাগে, অনুরাগে, বৈরাগ্য করে গ্রহণ॥
(সংসার রাগে বিবেকী হযে)

ফিকির কয় এই সোজা কথা ভাই !
কিছু মাত্র নিজের স্বার্থ যার মনেতে নাই ,
সে জন, উদাসীন আর, গৃহী হোক্ পূজা করি তাঁর চরণ
(তিনি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যা হউন)

আয় রে মন আমার সাথে, বৈদ্যনাথে, হবে রোগের প্রতিকার।
তিনি যে অনাথের নাথ, হন বৈদ্যনাথ, কাঙ্গালে তাঁর দয়া বড় ;
তার দ্বারে ধন্না দিলে, তাঁয় ডাকিলে, কোন রোগ না থাকে কার।
তিনি হন বড় দয়াল, ধনী কাঙ্গাল, সকলেই যে সমান তাঁর ;
তাঁরে ভাই সকাতরে, ডাক্‌লে পরে, দয়া করেন যার তার।
কাঙ্গাল কয় সে বৈদ্যনাথ, অনাথের নাথ, টাকা কড়ি লন না কার ;
কেবল রে ভক্তি ক'রে, ডাক্‌লে পরে, রোগ হ'তে করেন উদ্ধার।

শক্তিপূজা কথার কথা না ; (শ্যামা)
যদি, কথার কথা হ'ত, চিরদিন ভারত,
শক্তি পূজে শক্তিহীন হ'ত না।
কেবল, ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায়,
শক্তি পূজা হয় না,
এক মনো বিল্বদল, ভক্তি গঙ্গাজল,
শতদল দিলে হয় সাধনা। (হৃদয়)
দিলে আতপান্ন, কি মিষ্টান্ন,
মা সে তাতে ভোলেন না ;
কেবল জ্ঞানদীপ জেলে, একান্ত-ধূপ দিলে,
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা। (ভাই)
বনের মহিষ অজা, মায়ের বাছা,
মা সে বলি লন না ;
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ,
বলিদান কর বিলাসবাসনা। (ভাই)

কাঙ্গাল কয় কাতরে, জাত্ বিচারে,
শক্তি পূজা হয় না, "
সকল "বর্গ" এক হ'য়ে, ডাক মা বলিয়ে,
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না। (ও ভাই)

প্রেম ভরে সবাই কর নাম গান।
প্রাণ ভরে বল হরি, শীতল হবে প্রাণ ॥
নর নারী এক হৃদয়ে, ডাক তাঁরে সরল হ'য়ে,
(কেউ দূরে থেক না, সাধু পাপী তাপী,)
দীন দয়াল। ব'লে ডাক্‌লে, পাবে পরিত্রাণ ॥
তাঁরে ডাক্‌লে সকাতরে, ভক্তি ক'রে প্রেম ভরে,
(তিনি দয়া করেন রে, যারে তারে,)
দ্বিজে ফেলে চণ্ডালে রে, চরণে দেন স্থান ॥
তিনি পিতা মাতা আবার, পরম বন্ধু সবাকার,
(কেউ দূরে থেকনা, ডাক দীনবন্ধু বলে, ডাক অধমতারণ ব'লে,)
তাঁর কাছে নাই জাতের বিচার, সকলই সমান ॥
সকাতরে কয় কাঙ্গালে, পণ্ডিত যারে ত্যজ্য বলে,
(কেউ পরশ করে না, মহাপাপী বলে, যম যারে দণ্ড করে,)
এমন পাপী ডাক্‌লে তাঁরে, করেন কোল দান ॥

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়।
ভক্ত হ'তে যার, ইচ্ছা তার, আগে শাক্ত হ'তে হয়।
শাক্ত হইলে শক্তির প্রকাশ, সেই শক্তিতে হয় প্রবৃত্তি বিনাশ,
মান অপমান, বলিদান, দিয়ে কর রিপুজয়।
রিপু হ'লে জয় জ্ঞানের বৃদ্ধি, তখন অনায়াসে হবে ভূতশুদ্ধি;
সিদ্ধি না হ'লে, জ্ঞানবলে, অ আ ই ঈ করতে হয়।
সিদ্ধি হ'লে মন বৈষ্ণব লক্ষণ, তখন হিংসা আদি হবে রে বারণ;
বিবেকী যখন, হবে মন, তখন রে ভক্তির উদয়।
কাঙ্গাল বলিছে, ভক্ত হয় যখন, ওরে ভেদ জ্ঞান না থাকে তখন;
যায় প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, জগৎ দেখে ব্রহ্মময়।

কে যাবি মাছ ধরিতে ?
আয় রে ভাই, আমার সাথে।
পদ্মপুকুরের মাঝে, গোড় করিলে মাছ র'য়েছে রে ;
যদি পারিস্ ধরতে, সে মাছ যতন করে, কোন মতে,
সুখ পাবি রে ভোজনেতে॥
(মাছ ধরতে পারলে)
বিশ্বাসের ছিপ ক'রে হাতে, দেরে, একান্ত-সূতা তাতে রে ;
জ্ঞানের বড়সীতে, (উপরেতে বিবেকের কল,) যতনেতে,
নামের টোপ দে রে গেঁথে। (হরি হর)
মাছের ঠোকে কল নড়িলে, যেন আসন নাহি টলে রে ;
চোখ্ রেখে কলে, (বসে থেক রে ভাই !) কল ডুবিলে,
সূতা ছোড় যুতে যুতে॥ (হেঁক্‌চা টান্ দিও না)
খেলা করবে সে মাছ যখন, মাছের সাথে তুমি খেল তখন রে,
খেলা না ছাড়িলে, (সে মাছ আপনা হতে) ছিপ্ টানিলে,
ছাই পড়িবে সব্ আশাতে॥ (সূতা ছিঁড়লে পরে)
যদি রে মাছ ধরতে পার, তখন, ইচ্ছামত মাছ পাক ক'র রে ;
ভাতে ভাজা ঝোল, (নিজের ইচ্ছা যেমন,) কোরমা অম্বল,
যেমন ইচ্ছা হয় মনেতে॥ (তখন তোমার)
মাছ না ধ'রে নিজের হাতে, কাঙ্গাল, মাছ ভাজিছে কল্পনাতে রে !
কভু করছে অম্বল, (আপন মনে মনে,) কখন ঝোল,
গণ্ডগোল তাই জগতেতে॥ (পুকুরে মাছ নাই ব'লে)

সেই প্রেম রতন কি সহজে মিলয়।
যে প্রেম লাগি, বৈরাগী, সর্ব্বত্যাগী মৃত্যুঞ্জয়।
যে প্রেম লাগিয়ে নারদ সদাই, মুখে হরি বলে, সুখী শুক গোঁসাই ;
যে রতন পেয়ে, বিষ খেয়ে, বালক প্রহ্লাদ বেঁচে রয়।
ধ্রুব হ'য়ে যে প্রেম অভিলাষী, মায়ের কোল ছেড়ে হয় অরণ্যবাসী ;
যে প্রেম লাগিয়ে, ভাবিয়ে, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হয়।
যে প্রেমে হইয়ে উন্মাদ, রাজা রামকৃষ্ণের হয় রাজত্ব প্রমাদ ;
ছেড়ে অতুল ধন পরিজন, লালা বাবু ফকীর হয়।

শঙ্কর আচার্য্য নানক তুলসীদাস যে প্রেম মহিমা করেন প্রকাশ ;
যে প্রেম মহিমায়, রামমোহন রায়, এ বাঙ্গলায় হ'লেন উদয়।
দবির আর কবির দুটী ভাই ছিল, তারা সংসার ত্যজে বৈরাগী হ'ল ;
পাদ্‌সা এব্রাহিম, সেজে দীন, সে প্রেমেতে ফকীর হয়।
কাঙ্গাল বলিছে, এ প্রেম যার আছে, শুনে সীসা সোণা সমান তার কাছে ;
বিষয় অহঙ্কার, নাইরে তার, মান অপমান সমান হয়।

ভক্তি গুণে কিনা ঘটিছে।

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, পায় না যার অন্ত, হৃদয় মন্দিরে তাঁরে দেখিছে। (ভক্ত)
যাঁর মহিমা, হয় অসীমা, যোগে যোগী ভাবিছে ;
কেবল, ভক্ত ভক্তিগুণে, সদা সর্ব্বস্থানে, সর্ব্বভূতে তাঁর প্রকাশ দেখিছে। (ভক্ত)
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড রে, যে জনা রে, আশ্রয় ক'রে র'য়েছে ;
যাঁর সকলি অনন্ত, নাহি আদি অন্ত, দেখ ভক্তিগুণে তাঁরে হৃদে বাঁধিছে। (ভক্ত)
যে জন তারা, গ্রহ, উপগ্রহ, আদি শূন্যে ঘুরাচ্ছে ;
ভক্ত, ভক্তিভরে তাঁরে, ঝুলায়ে সাদরে, অপার আনন্দনীরে ভাসিছে। (ভক্ত)
ফকীর ফিকিরচাঁদে, বলে কেঁদে, যেজন হৃদে জাগিছে ;
হারা হ'যে ভক্তিধন, পাইলে তাঁর দর্শন, কুবাসনা মেঘে তাঁরে ঢেকেছে। (আমার)

যদি কল্পনা ক'রে, অরূপীর সেরূপ দেখা যে'ত।
তবে সাধন ভজন ছেড়ে লোকে কল্পনা করিত,
কত জল্পনা করিত ;
লোকে কল্পনার জল পান করি শীতল হইত।
মাতৃহীন শিশুর কাছে ছবি গ'ড়ে দিত,
যাদু তোর মা এই বলিত ;
শিশু আমার মা বলিয়ে ছবির কোলেতে উঠিত॥
যদি কল্পনাতে রূপ গ'ড়ে মা ব'লে কাঁদিত, তবে বুক কি জুড়াত ;
প্রাণের সাগর উথলিয়ে বক্ষঃস্থল ভাসিত॥
কাঙ্গাল বলে যদি লোকে সাধন করিত, মায়ের চরণ পূজিত ;
তবে চোখে নাকে কাণে জিভায় সে রূপ দেখিত।

বড় গোল নিরাকার নয়, সাকার সে জন,
গোলে গোলে দিন কেটে যায়।
যে ভাবে সে ভাবে ডাক, ডাক রে তাঁয়॥
(একান্তে, এক প্রাণে, এক হৃদে)
চক্ষু বুজ্‌লে অন্ধকার দেখায়, যে বলে সে জন্মান্ধ নিশ্চয় ;
আমি, চক্ষু মুদে, দেখি হৃদে, আনন্দময়॥ (সে রূপ কি)
দূরবীণ অনুবীক্ষণের কাজ নয়, যে সে রূপ কি রূপ দেখাইয়ে দেয়,
তবে, যোগের চোখে, দেখ্‌লে তাঁকে, দেখা যে যায়। (তবে তাঁর)
অরূপীর যে কিবা অপরূপ, কার সাধ্য তার প্রকাশে স্বরূপ ;
কেবল, সাধক জানে, ধ্যানে প্রাণে, রূপ কি হয়। (অরূপীর)
ফিকির কয়, ধরা না দেয় মোরে, লুকোচুরী খেলা যে করে ;
এবার, আছি ব'সে, ধরবার আশে, দেখিলেই হয়। (আর একবার)

দেশটা মাতালে রে, দুই মাতালে ?
মদের ঢালাঢালি, ঢলাঢলি ডুবিয়ে সকল ডুবালে॥ মদে,
এক মাতাল দেখ হায়, কেবল শুঁড়ির সেবায়,
তালুক মুলুক টাকা কড়ি সকলি খোয়ায় ;
আবার চেয়ে দেখ, মাতাল এক, জমিদারী যায় ফেলে॥ (মদে)
এক মাতালে মদ খায়, ও সে ভূমেতে গড়ায়,
মবার মত পড়ে থাকে আবার উঠে খায় ;
ও তার মুখে গন্ধ, ক্ষুধা মন্দ, চোখের তারা কপালে। (ওঠে)
আর এক মাতাল দেখ হায়! দশা তুল্য তুলনায়,
পৃথক কেবল নিজের ভাঁটি, খাঁটি মাল জন্মায় ;
খেজুর রসের মত, অবিরত, চুয়ায়ে পড়ে গালে। (সে মদ)
দেখ এই দুই মাতালে, পৃথক মরণ কালে,
শুঁড়ির মাতাল মরে যকৃৎ পীলায় ঘা হ'লে ;
মরে আর এক মাতাল, বলে কাঙ্গাল, ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিলে॥ (মদে)
ডেকে বলিছে কাঙ্গাল, দেখ আর দুটী মাতাল,
নিতাই গৌর গুণের ঠাকুর, পরম দয়াল ;
প্রেমে মাতোয়ারা, জ্ঞানহারা, নাচে আর হরি বলে॥ (প্রেমে)

বলি দাও বলে সবে, বলি কি তা বোঝে না।
বলি কারে বলে ভেবে দেখে না ॥
বৃক্ষ লতা বনস্পতি, যত দেখ জগতে,
বলিদানে জগৎ-মাতার পূজা করে তারতে ;
ফল শস্য করি দান, ওষধি হারায় প্রাণ,
বিনা আত্ম-বলিদান, পূজা সিদ্ধ হয় না হয় না ॥
রক্ত দানে শক্তি পূজা, করে যে সব বলবান্,
তারা, শাক্ত নাম ধরে, লোকে করে তাদের কীর্ত্তিগান ;
রাখিতে ধর্ম্মের মান, করে যারা প্রাণ দান,
করে তারা বলিদান, ছাড়ি সংসার বাসনা, কামনা ॥
কাঙ্গাল বলে বন পশু বলি দেয় রে যে জনা,
তারা, আপন ঘরের মাঝে, পশু আছে জানে না ,
মন তুমি দাও বলি, রাগ দ্বেষ মহিষ বলি,
লোভ নরবলি, কাম অজাবলি, কল্পনা, জল্পনা ॥

উদ্দীপন।

ব'সে চাতক পাখী ডাকে রে ডালে !
মেঘের জল বিনে পিপাসা যায় না, তাই ফটীক জল দে বলে।
ভাগ্য ফলেতে আকাশে, যদি মেঘে বারি বর্ষে, হায় রে !
তবে ত তার পিপাসা যায়, তুষ্ট না হয় অন্য জলে।
না হইলে মেঘের প্রকাশ, দেখ, চাতক ত তার ছাড়ে না আশ, হায় রে !
মেঘ এসে জল দেয় তারে, দেখ যথাসময় কালে।
চাতক পাখীর ভাবটি দেখে, কাঙ্গাল নীরব হয় না, তাঁরে ডাকে, হায় রে !
কাঙ্গাল জল পাবে ভরসা আছে, দয়াময়ের দয়া হলে ॥

মরি এ কার মেয়ে, ঘানিগাছে বসে রয়েছে।
ঐ যে, মোটা সরু, বলদ গোরু, ঘানি গাছে ঘুরিছে ॥ (কাঁধে জোঁয়াল)
ঘানিগাছে বাসনা মত, অবিরত ঝরিতেছে রস শত শত ;
যে যা যাচে, ঘানিগাছে, সেই মত রস পাইছে ॥ (কাম অকাম)

এক গাছে রস নানামত হয়, তিক্ত কষায়, অম্ল মধুর, যে যেমন যা চায়,
রসের এক বিন্দু, হচ্ছে সিন্ধু, নানা রসে ডুবিছে ॥ ইচ্ছামত,
কেউ করিয়ে কাম্য রস পান,
পরে, জীবন হারায়, গুড়ের হাঁড়ায়, মৌমাছির সমান :
কেহ, অনায়াসে, ভক্তি রসে, পান করিয়ে নাচিছে ॥ নামামৃত,
কাঙ্গাল ভবের গাছের বলদ,
গাছে কি রস চোঁয়ায়, টের নাহি পায়, এমনি অবোধ ;
ও সে, ঘানি টেনে, কাতর প্রাণে, রস নাহি পান করিছে ॥
(ঘানি টেনে মরে)

কোন্ কারিকর ঘুড়ি উড়াচ্ছে।
বাতাস ভরে, ঘুড়ি উড়ে, কত খেলা খেলিতেছে ॥
কখন গোপ্তা খেয়ে, কখন লপ্টাইয়ে, কোণ ঝুকিয়ে সোজা দাড়াচ্চে ;
ঘুড়ির ডুরি আছে ও যার হাতে, যে ঘুড়ি উড়ে তাহার মতে,
সে ত আকাশ ভেদ করে, মাথা খেয়ে উঠিতেছে ॥
না মানি কারিকরে, যে ঘুড়ি আপনার জোরে, আকাশে ঘুরে ফিরে উড়িছে ;
সে.ত লপটাহয়ে, গোপ্তা খেয়ে, উঠে না আর মাথা খেয়ে,
আখেরে নীচে গিয়ে, গড়াইয়ে পড়িতেছে ॥
যে ঘুড়ি কাটে ডুরি, তার তো বিপদ ভারি, পাঁচ বালক ধরে টেনে ছিঁড়িছে ;
কারিকর না ছাড়ে ঘুড়ি, আপন হাতে কারিগিরি,
সৌখীন সেই সখের ঘুড়ি, ফিরে আবার গড়িতেছে ॥
কাঙ্গাল কয় কারিকরে, উড়তেছি ডুরির জোরে, টেনে লও ডুরি ধরে নিকটে,
ওহে ! ডুরির টানে টান খেয়ে, আমি উপরে যাই মাথা খেয়ে,
রাখ প্রাণ দেখা দিয়ে, তোমায় কাঙ্গাল ডাকিতেছে ॥

নদীবল রে বল, আমায় বল, রে
কে তোরে ঢালিয়ে দিল এমন শীতল জল রে
পাষাণে জন্ম নিলে, ধরলে নাম হিমশিলে,
কার প্রেমে গলে আবার হইল তরল রে ;

ওরে যে নামেতে তুমি গল, সেই নাম একবার আমায় বল,
দেখি গলে কিনা আমার কঠিন হৃদিস্থল রে।
কার ভাবে ধীরে ধীরে, গান কর গভীর স্বরে,
প্রাণ মন হরে, কিবা শব্দ কল কল রে;
নদী রে তোর ভাবাবেশে, যখন যাস রে বক্ষঃস্থল ভেসে,
তখনি বর্ষা এসে, ভাসায় ধরাতল রে।
ভক্তজন পবন সঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে, প্রেম তরঙ্গে তুমি কর টলমল রে;
তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও, যারে নিকটে পাও তারে নাচাও,
উচ্চরবে কার নাম গাও, হইয়ে বিকল রে।
সর্ব্বত্র সমান স্বভাব, কোথা নাই গুণের অভাব,
মরিরে প্রভাব, তোমার শক্তি কি অটলরে;
তুমি ঘৃণা করে না দাও ফেলে, যত সবা মরা কর কোলে,
করলে পরশ তোমার জলে, অঙ্গ হয় শীতল রে।
যে স্তজন করে তোরে, তার স্বরূপ তোমার নীরে,
তাই নদী তোমার তীরে দেখি শ্মশান স্থলরে;
যোগী ঋষি আদর করে, তাই তোমার তটে সাধন করে,
হয়ে থাকে তোমায় হেরে, হৃদয় নিরমল রে।
মূঢ় মন যত নরে, কিছু না বিচার করে,
তব জলে ত্যাগ করে মূত্র আর মল রে;
তাতেও তোমার না যায় গৌরব, তুমি মায়ের মত সহর সব,
কাঙ্গালের ভব-বান্ধব শ্মশান গঙ্গাজল রে।

পাখী মোর সেই কথাটি বল না।
মনে বড় আশা, তাই জিজ্ঞাসা, করবো করতে পারি না।
অতি প্রভাত কালেতে, বসে গাছের ডালেতে,
তুই, উর্দ্ধমুখে ডাকিস্ কারে মনানন্দেতে,
তবে না ডাকিলে, প্রভাতকালে, সুধা পেলে গিলিস না।
শক্তি নাই বলে তোরে, খেতে দেয় অকাতরে,
তোর, এমন দরদি জন কোথা বল্ না আমারে,
যে জন এমন দাতা, বল সে কোথা, শুনবো তা আজ ছাড়ব না।

তোরে গর্ভ সঞ্চারে, গাছের ডালের উপরে,
এমনি করে কররে বাসা কে বলে তোরে ;
আবার ডিম্ব হ'লে, তায় তা দিলে, কে বলে হবে ছানা।
ফিকিরচাঁদ কয় কাঁদিয়ে,অশেষ পাপী বলিয়ে, বল্লে না সে কথা, পাখী গেল উড়িয়ে
তবে কোথায় যাব, কায় ডাকিব, কেউ যে কথা বলে না।

ওরে ভাই হিমগিরি, বিনয় করি, বল একবার আমার কাছে।
কেবা রে আদর করে, তোমার শিরে, সোহাগ ঝুটি বাঁধিয়াছে ;
আবার, সেই চূড়ায় চূড়ায়, কেবা তোমায়, হীরার টোপর পরায়েছে।
যখন রে প'ড়ে আলোক, মারে ঝলক, চুণিমণি টোপর মাঝে ;
ওরে, তোর মাথার উপর, এমন টোপর, কোন কারিগর গড়ায়েছে।
এত যে সোহাগ তোমার, তবু আবার, দুটি নয়ন ঝুরিতেছে ;
তাইতে রে ঝর ঝর, নিরন্তর, নিঝরের জল পড়িতেছে।
কাঙ্গাল কয়, ওরে আধা ও নয় কাঁদা, প্রেমে গিরি গলিতেছে ;
অথবা ভারতের দুখ্, দেখ রে বুক্, ফাটে পাষাণ গলিতেছে।

সংসার জ্বালায় জলে, সবাই মরতে চায় ;
ম'লে এমন রতন কি পায়, তাই মানুষে মরণ চায়। রে,
বল শুনি মন সেই কথা আমায়, মানুষ ম'লে শান্তি পায় রে,এমন স্থান কোথায় ;
জলে পুড়ে মানুষ তথায় গেলে রে, সকল জ্বালা অমনি নিবে যায়। রে,
ভাই বন্ধু সংসারের মাঝে, এ সব বন্ধু হতে বন্ধু আবার এমন কে আছে ;
সে কি এত ভালবাসে সবায় রে, ম'রে তার কাছে যেতে যায়। রে,
এত ভালবাসে রে যে জন, তারে প্রাণের সহিত, ভালবাসিস্ নে রে মন ;
তারে ভাল না বাসিলে মন রে, মানুষ ম'লেও শান্তি নাহি পায়। রে,
কাঙ্গাল কাঁদে চক্ষে পড়ে জল,ও মন মরতে যাও যে মরণের কাজ কি করিলি বল,
যে দু'দিন বেঁচে থাকিস্ মন রে, ডাক দীননাথে সর্ব্বদায়। রে,

দুনিয়ার ভোজের বাজী, মোল্লা কাজী, ভাব্লে পাগল, পণ্ডিত জ্ঞানী।
সন্তানের সম্ভাবনায়, কি বাজী হায়! স্তনের রক্ত দুধ অমনি ;
ওরে দুধ ছিল কোথায়, কেবা যোগায়, এমন দয়াল বল্ কে শুনি।

যত দিন দাঁত না উঠে, সেই দুধ চাটে, মায়ের কোলে যাদুমণি ;
আবার রে দাঁত উঠিলে, ভাত চিবালে, লুকায় দুধের প্রস্রবনী।
কাঙ্গাল কয় অমৃতেরে, গরল করে, গরল হয় অমৃত জানি ;
দেখ রে তার প্রমাণে, গরল পানে, বাঁচেন প্রহ্লাদ গুণমণি ॥

এবার এ জ্বরে আমার ভরসা নাই বাঁচিতে।
শতোপরে, ছয়ের ঘরে, জ্বর উঠেছে কল কাটিতে ॥ (এবার)
অহঙ্কার পারার ভাগে, ক্রমে উর্দ্ধ শত দাগে, ছয়ের দাগে, ষড় যোগে,
বিকার ঘটায় আচম্বিতে ; জ্বরে ব্রহ্মচক্র টেনে ফেলে এ সংসার মর্ত্ত্য লোকে,
এখনকার সদ্য জ্বরে, বৈদ্য নালি নাড়ী ধরে, জ্বরের নির্ণয় কাটির বিচারে ;
কাঁচ পারদে কাঠির গঠন, কাঠির হাতে মরণ বাচন, বৈদ্যনাথে কর স্মরণ জীব রে।
জীয়ন মরণ কলকাটিতে। (ডাক্‌রে বৈদ্যনাথে বৈদ্য ত হদ্দ হয়েছে)

কোথা থে এ সব আসে কোথা যায় ;
ও তা ভাবতে গেলে মাথা ঘোরে, ভাব্‌না শেষে ভাব্‌না পায় ॥
ভাইরে, বটগাছের বীচি, ও তা নিতান্ত কুচি,
তার ভিতরে খুঁজলে পরে জল একটু রতি ;
যদি মাটিতে পড়ে, দুদিন পরে, সেই রতি জল আস্‌মান ধায় ॥
ভাইরে ! রক্ত আর বীজ, ও তা দুজনের দুই চিজ, ও তা জানে শুনে লোকে
কিন্তু হয় না তার উদ্দিশ ; আবার চিত্রকরে চিৎ করেছে, রং করে শুঁয়পোকায় ॥
ফকির ফিকিরচাঁদে কয়, একি কথার কথা হয়,
ওরে বাবার বাজী বোঝা কারু বাবার সাধ্য নয় ;
একবার ডুব দে রে মন, ভাব সাগরে, সাঁতার দিবার কাজটী নয় ॥

ভাব্‌তে গেলে মানুষ পাগল হয়।
আহার বাতাস না পাইয়ে, বাসায় বদ্ধ হয়ে,
কেমন করে, গুটী পোকা বেঁচে রয় ॥ রে,
থেকে বাসার মাঝে, কত সাজে, সেজে সে যে বাহির হয় ;
ও তার বাসার মাঝে গিয়ে, কেবা দেয় সাজায়ে,
কোন কারিগরের এত কৌশল হয়। রে,

আগে কুৎসিত ছিল, শেষে হলো, কি উজ্জ্বল শোভাময়,
ও তার বিচিত্রতা কিবা, দেখি সে শোভা, কত মত হয় মনে ভাবোদয়॥ রে,
যে জন বুঝায় বসি, রবি শশী, অসাধ্য তার কিছুই নয়;
কেবল তার কৌশলেতে, থাকিয়ে বাসাতে,
গুটি পোকা শেষে প্রজাপতি হয়। রে,
দেখে এসব ভাবে, ভেবে ভেবে, কেঁদে ফিকিরচাঁদে কয়;
আমায় না হয় এক তা কর [illegible] লাব,
ইচ্ছাময় তোমার যাহ [illegible],

কার শোভাতে [illegible]।
ওলো আমায় বল [illegible],
রূপের প্রভায় বন [illegible],
কেবা এমন করে, থরে থরে, সাজায় [illegible] লো,
তোমার বিবিধ বরণে, ময়ূর পুচ্ছ [illegible],
কাহার সোহাগে এ সাজ সেজেছ [illegible],
কেমন তিনটি শিরে, মাথার পরে, সদা করে বিরাজ লো;
আবার মাঝে পাঁচটি কল, চমৎকার সে স্থল,
কাহার কৌশলে সে সকল বুঝিছে॥ লো বল,
ফিকিরচাঁদে বলে, ঝুমক ফুলে, এ সাজে কে সাজা লো;
তাঁর রচনা দেখিতে, মহিমা জানিতে, মূঢ় মন কেন না ধাইছ। বল আমার,

বসায়ে সখের মেলা, রসের খেলা, দিন্ দুই চার খেলে ভাল॥
মেলাত দেখ্‌'ল চোখে, মেলা লোকে, কেবা কি উপদেশ পেল;
বাজিল শেষের ঘড়ি তাড়াতাড়ি, যার বাড়ি সেই চলিল॥
(সখের মেলা ভেঙ্গে গেল)
যদি ভাই বুঝে থাক, ভেবে দেখ, ভব মেলার বেলা ডুবল;
এ সংসার রসের খেলা, রেখে পাগ্‌লা, ভবের ভেলা খুঁজিগে চল॥
(পারে যাব যাতেরে সেই)

এই কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদে, জীবের পদে ধরে বলে, ভাই হরি বল!
ঐ দেখ ডুব্‌ল বেলা, ভাঙ্গল খেলা, রেখে খেলা সেই বাড়ী চল।
(যে বাড়ীতে এলে মেলায়)

ওরে ময়ূর বল্‌রে মোরে, কেবা তোরে, এমন করে সাজায়েছে।
মরি কার এত সোহাগ, এ অনুরাগ, রঙ্গের পোষাক পরায়েছে;
তুমি রে কার সোহাগে, অনুরাগে, প্যাখম ধরে বেড়াও নেচে॥
একে অপূর্ব্ব পাখা, পালক ঢাকা, চাঁদের রেখা তায় শোভিছে;
যে তোরে এমন করে, চিত্র করে, সে চিত্রকর কোথায় আছে॥
ময়ূর তোর সর্ব্বরঞ্জন, ক'রে যে জন, দুটী পা কুৎসিত করেছে;
সে তোরে একাধারে রঞ্জনকারি-দর্পহারী গুণ দেখাচ্ছে॥
কাঙ্গাল কয়, এ যার ময়ূর, গুণের ঠাকুর, সে যে আমার জগৎ মাঝে;
ওরে তার গুণের অন্ত বেদ বেদান্ত না পেয়ে, নির্গুণ বলেছে॥

কে জানে সে কোথায় রয়েছে।
ও যার নিয়মে ভুবন, তারকা তপন, আপন আপন পথে চলিছে॥
একি চমৎকার, কেহ কার, নাহি পরশ করিছে;
ও যার, গগনে তপন, তপনে ভুবন, ভুবনে কতই চাঁদ ঘুরিছে॥ ওরে,
নাহি ধনী মানী, গুণী জ্ঞানী, পাপী তাপী তাঁর কাছে;
ও তাঁর জলদ পবন, অনল শমন, সম ভাবে সবায় সেবিছে॥ ওরে,
দুঃখে বলে কাঙ্গাল, জ্যোতির জাঙ্গাল, চিরকাল ত জ্বলিতেছে;
তাদের কেবা রে সৃজিল, কেবা জ্যোতিঃ দিল, সুধালে সকলে নাহি বলিছে। ওরে,

---

যদি দেখ্‌বি তাঁরে, তবে ভাই! আয় রে শান্তিপুরে।
আমার চৈতন্য নিত্যানন্দ, সদা বিরাজ করে, দেখ অদ্বৈতের ঘরে;
একে তিন, তিনে এক হয়, দেখ্‌রে বিচার করে॥
নিত্যানন্দ বিনে কে চৈতন্য দিতে পারে, ওরে এ মায়া ঘোরে;
আবার, দুইকে মিলায়ে দেয় অদ্বৈত দয়া করে॥
চৈতন্য পাবিরে অদ্বৈত চিন্তা করে, ওরে নিত্যানন্দে ধ'রে;
এক ধরিলে তিন যে মেলে, এক ছাড়া তিন নয় রে॥

কাঙ্গাল মরে অহঙ্কারে, মনে ফিকির করে, বিদ্যা বিজ্ঞানের ঘোরে ;
ও সে গোড়া কেটে আগায় জল দিচ্ছে বারে বারে ॥

ভুলনা রে ভুল না তাঁহায়
ও যার দয়ার তুলনা, জগতে মিলে না, জগৎ প্রকাশ যাঁর মহিমায়। ঐ
তুমি বিষয় আশয়, বন্ধু সহায়, পেয়েছ রে যাঁর কৃপায় ;
তিনি বিষয়ের বিষয়, সর্ব্ব মঙ্গলময়, সম্পদে বিপদে সকলের সহায়। যিনি
তুমি বিষয় পেয়ে, মোহিত হয়ে, ভুলে আছ তুমি যাঁয় ;
যদি তিনি ভোলেন তোমায়, কি দশা হয় হায়,
তুমি কোথায়, তোমার বিষয় রয় কোথায়। তবে,
দুখে কাঙ্গাল বলে, নয়ন জলে, বক্ষঃস্থল ভেসে যায় ;
আমি ভুলে আছি তাঁরে, না ভোলেন আমারে,
তিনি মধুর স্বরে ডাকিছেন আমায়। কতবার

(আরেও) অরূপীর যে স্বরূপ দেখেছে, এ সংসারে তার কি কুলের ভয় আছে।
সংসারের সং সাজে সে কি, সে যে, রং-মহলে বাবাম দিয়ে বসেছে।
সমাজ নাই সব সমান জ্ঞান, হরিপদরজ যে গায় মেখেছে।
লোক লাজে ভয় কি আছে, ত্রিলোকের যে আলোক মাঝে বসেছে।
জাতের বিচার রাখে কি, সে যে সকল ছেড়ে অজাতে দাঁড়ায়েছে।
ফিকিরের সে দিন কি হবে, কবে জাত হারায়ে অজাতে দাঁড়াবে সে।

ওরে ও চিড়ে মহোৎসবে মজ তবে মন আমার।
ওরে যথাবিধি, চিড়া দধি, চিনি কর একাকার ॥
মাল্সা মানস তোমার, নিতাই দয়াল অবতার,
ওরে সাধন কঠিন হয় রে, চিড়া যে তাঁহার,
গৌর দয়ার নিধি, নিরবধি, প্রেম দধি দেবেন আবার ॥
তত্ত্ব জ্ঞানের আধার, দেখ অদ্বৈত আমার, একমেবাদ্বিতীয়ম্ চিনি যে তাঁহার,
এ তিন মিশাইয়ে, কর গিয়ে, চিড়া দধির ফলার ॥

ভাসি নয়নের জলে, কাঙ্গাল ফিকিরে বলে,
চিড়া দধির ফলার না হয় আমার কপালে,
যদি যোটে কখন, ভক্তি লবণ বিনা আস্বাদ হয় না তার॥

ওরে মৃগ আমায় বল? স্বাধীন মনে; চর বনে, এত পুণ্য কিবা ছিল॥
খেয়ে লতা পাতা ঘাস, বনেতে করবে বাস, নাই বিলাস বারমাস স্বচ্ছল;
যোগী তোরা মৃগ সবাই, তোদের দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি নাই,
জাতীয় দল বেঁধেছে তাই, আছে পরস্পরে মিল॥
প্রয়োজন হ'লে পরে, নাহি যাও ধনীর দ্বারে, খাও প্রান্তরে চরে কেবল,
ধন্য তোদের স্বাধীনতা, সদয়া আছেন বিধাতা,
শুনে ধনীর বাঁকা কথা, চক্ষে নাহি পড়ে জল॥
ভূমির নাই খাজানা, স্বামীর নাই তাড়না, কাণ ধরে আন বলেনা প্রবল;
তাড়া দিলে ব্যাধগণে, বন ছেড়ে যাও অন্য বনে,
প্রাণ গেলেও কোন জনে ধর্ম্মাবতার নাহি বল॥
যদি মৃগ বল বনে, বাণ দিয়ে অকারণে, মৃগদল বধে প্রাণে চণ্ডাল;
কাঙ্গাল বলে কাতরেতে, প্রাণ গেলেও মৃগ ব্যাধের হাতে,
ধনীর বাক্যবান হতে, ব্যাধের বাণ বরং ভাল॥

কেমনে ভুলিব তোমায়, তুমি কি ভুলিবার ধন।
যখন যে দিকে ফিরাই আঁখি, কেবলই তোমারই মহিমা দেখি হে!
দেখে আশ মেটেনা, ওহে প্রাণ সখা! যতই দেখি, ততই হেরি,
নূতন নূতন॥ সেই মহিমা
পর্ব্বত উন্নত শিরে, ওহে সাগর গভীর স্বরে হে;
তোমার রবি শশী, ওহে দীন দয়াময়, চারুকরে মহিমা করে কীর্ত্তন॥ দিবানিশি
ডাকে তোমায় ঘন ঘন, ওহে গম্ভীর গরজে ঘন হে;
তোমার, প্রেম পিপাসু, ওহে প্রেম জলধর!
চাতক পাখী; উর্দ্ধ মুখে ধায় হে তখন। (প্রেম বারির আশে)
উঠে যখন তরুণ ভানু, দেখিলে তার লোহিত তনু হে;
তোমার সুশীতল, ওহে জ্যোতির্ম্ময় হে! লোহিত জ্যোতিঃ,
অমনি আমার হয়হে স্মরণ। (সেই শীতল জ্যোতিঃ)

ভাসি দুটী চোখের জলে কাঙ্গাল ক্ষেপাচাঁদ ফকীর বলে হে!
একবার দাঁড়াও এসে, হে কাঙ্গালের সখা! হৃদ কমলে, দেখি তোমার
অভয় চরণ ॥ (কাঙ্গালের ধন)

আয় রে! আয়, কে দেখ্‌বি সাধকের সংসার আনন্দময়।
সংসারের জ্বালা যাবে, শীতল হবে, তাপিত হৃদয় ॥ সংসার পোড়া,
মায়ের কোলে ছেলে হাসে, স্তন্য পানে সুখে ভাসে,
আবার স্নেহাভাবে মায়ের মুখ কি শোভা পায়।
সাধক স্ত্রীর কোলে দে'খে ছেলে,ভেসে যায় রে চোখের ধারায় ॥
(গণেশ জননী বলে)
ছেলে কোলে লয়ে আবার, মুখে তুলে দিচ্ছে আহার,
যখন হাত পেতে' দে দে' বল্‌ছে ছেলে যে তাঁর;
সাধক আর কি বে বয়, নাচিয়ে কয়,
খাও রে আমার আনন্দলাল। (প্রাণের গোপাল)
মেয়েটিকে বুকে লয়ে, সাজায়ে অলঙ্কার দিয়ে,
মেয়ে হেসে হেসে স্নেহরসে ভেসে বেড়ায়,
সাধক হৃদয় পরে; মেয়ের ধরে, চক্ষু মুদে অজ্ঞান হয়। (এই আমার উমা বলে)
ধরা চুড়া বেধে দিয়ে, ছেলেরে কৃষ্ণ সাজায়ে, মেয়েটীকে দাঁড় করে তাহার বাঁয়;
কভু শিব গৌরী সাজাইয়ে, যুগল রূপে পাগল হয় ॥ ভক্ত সাধক।

আয়রে, ফকিরের দলে, সবাই মিলে, নাচি একবার বাহু তুলে
একবার তাঁর সুমধুর নাম কর রে গান, জুড়াবে প্রাণ অবহেলে;
তখন রে ছেড়ে সংসার, নাম গাবে তাঁর, ছাড়বে না আর ছাড়তে বল্লে ॥
যদি কেউ শ্রবণ কীর্ত্তন ক'রে যতন, পাও সে রতন সাধন বলে;
তখন রে সোণার খণি, পরশ মণি, তুচ্ছ ব'লে দেবে ফেলে ॥
কাঙ্গালের ছেঁড়ে তেনা নাইরে সোণা, কর ঘৃণা কাঙ্গাল ব'লে;
কাঙ্গালের সর্ব্বস্ব ধন, অমূল্য ধন, ধনী হবে সে ধন পেলে ॥

যদি ভারত বাসী, হবে পরিত্রাণ।
তবে, সরল হোয়ে, এক হৃদয়ে, কর নাম গান ॥

যে নামে নাই শমনের ভয়, মহাদেব হলেন মৃত্যুঞ্জয়,
(সেই নাম কর্ রে, সবে এক হৃদয়ে)
প্রহ্লাদের মরণ না হয়, করিয়ে বিষ পান ॥
যে নামে নারদ যোগী, শুকদেব সুখ ত্যাগী,
(সেই নাম কর রে! সবে এক হৃদয়ে) যে নামে হলে বিবেকী, গলে রে পাষাণ ॥
এ নাম নয় রে নূতন কথা, যোগী ঋষির হৃদয় গাথা,
(সে নাম কর রে! সবে এক হৃদয়ে)
গাহিলে যায় হৃদয় ব্যথা, শীতল হয় রে প্রাণ ॥
কাঙ্গাল বলে নামে ভক্তি, হ'লে পাবে পরম শক্তি,
(সেই নাম কর রে, সবে এক হৃদয়ে,) সেই শক্তি জীবন-মুক্তি, বেদের বিধান ॥

তোরা আয় রে, মায়ের কাছে, ক্ষুধা যদি ভাই! হয়ে থাকে ॥
ওরে, জগৎমাতা ডাক্‌ছেন ও ভাই! চেয়ে দেখ চোখে;
ও ভাই! অন্নের থাল হাতে ক'রে, সবারে মা ডাকে।
ও ভাই! মা ভুলিয়ে কেন কাঁদিস্ মরিস্ কেন ক্ষুধাতে;
মা যে অন্ন দিবেন, ক্ষুধা যাবে, মা বলে ডাক মা কে।
ও ভাই! ধন জন জ্ঞান মদে, আছ মত্ত হয়ে;
ও ভাই, মাকে ভুলে আছি মোরা, মা ভোলেন নাই কাকে ॥
অপরাধী ব'লে মা তো দিবেন না ফিরায়ে;
ছেলে, অমান্য করিলে মাকে, মা তা কি মনে রাখে ॥
ও ভাই! সাধু পাপী জ্ঞানী অজ্ঞান সমান মায়ের কাছে;
মা যে, পুত্র কন্যা কোলে লয়ে, অন্ন দেবেন মুখে ॥
কাঙ্গাল বলে, মাগো, আমি তোমার কাঙ্গাল ছেলে;
ও মা, কিঞ্চিৎ প্রসাদ অন্ন দিয়ে ধন্য কর আমাকে ॥

আমন্ত্রণ।

ওরে ভাই, তাঁর নাম, অবিরাম, কর গান, দিন বয়ে যায়।
ওরে, ধনী মানী গুণী জ্ঞানী, পাপী তাপী আয় রে ত্বরায়;
সকলে সবল হয়ে, এক হৃদয়ে, প্রাণ ভরিয়ে ডাকি রে তাঁয় ॥

এ হেন সুযোগ পেয়ে, অলস হয়ে, কেউ থেকনা ভুলে মায়ায় ;
ঘুচিবে সকল কুদিন, পাবে সুদিন, দীনদয়ালের নাম মহিমায় ॥
ওরে ভাই, মরণ কালে, যাঁকে ডাক্‌লে, শমনের দূত কাছে না যায়
ওরে, সেই অভয় নামে, মর্ত্তধামে, ফকীর হয়ে, ভয় কর্‌িস্‌ কায় ॥
এই, কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদে, মনোসাধে, বাহুতুলে নেচে বেড়ায় ;
ওরে, তাঁর নামের ধ্বনি, শিঙ্গার ধ্বনি শুনিয়ে পাষাণ্ড পালায় ॥

ভব পারের তরি তোদের লেগেছে তীরে।
সকাতরে ডাক্‌লে তাঁরে নেবে রে পারে ॥
জায়গার কমি নাই নায়েতে, জেতের বিচার নাই বসিতে,
(তোরা কে যাবিরে, ভব পারের তরণীতে, এমন সুযোগ আর পাবিনে)
চলে নাও দ্রুতগতিতে, এক হা'লের জোরে ॥
যদি নেয়ে মনে করে, ব্রহ্মাণ্ড নায় নিতে পারে,
(সামান্য নয় রে, এ তরি তরির মত,
এই বিশ্ব সংসার নিতে পারে)
কিন্তু, প্রেমিক ভিন্ন নেবে না রে, আস্‌তে হয় ফিরে ॥
ফিকির এখন ফিকির করে, না পেয়ে নাও কেঁদে মরে,
(আমার কি হল রে, ভব পারে যাওয়া হ'ল না,
আগে তাঁরে প্রেম না ক'রে)
ওহে, দয়াময় পার কর মোরে, ডাকি কাতরে ॥

ওরে, ভয় কি আছে, আমার কাছে, একবার আয় পাখী।
আয় রে সবাই মিলে তাঁয় ডাকি ॥
আমি, মানুষের দলে ডাকিতে গেলাম,
ডেকে, না পেলাম, আর লাভে হ'তে পাগল হ'লাম,
তোদের, সবল জেনে বনে এলাম, পাখী, তোরাই একবার ডাক দেখি
যে জন তোদের সৃজন ক'রে,
ডেকে ডুকে পাখী যদি দেখা পাস তাঁরে ;
তবে, তোরা তাঁরে দেখাস্‌ মোরে, পাখী দিস্‌নে আমায় ফাঁকি ॥

মানুষ অতি স্বার্থপর হয়,
তাই ব'লে রে পাখী, যদি আমায় করিস্ ভয়,
তবে, গাছে থেকে ডাক্‌রে তাঁরে, আমি শুনি রে দূরে থাকি ॥
কাঙ্গাল বলে মানুষ হ'য়ে,
যে জন তাঁরে ভুলে আছে, পাখী ভাল তার চেয়ে,
পাখী আত্মারাম বলে ডাক্‌বে, পাখী আয় তোরে হৃদে রাখি ॥

প্রার্থনা।

ওগো মা! সদা তাই ডাকি মা, মা আমি তোমায় মা ব'লে।
মা আমার, দুঃখ দূরে যায়, শীতল হয় মা,
তোমায় ডাক্‌লে মা। (তাপিত হৃদয়)
রোগেতে শরীর জরা, ওমা, মল মূত্র অঙ্গ ভরা,
সহোদর সহোদরা কেউ না করে কোলে ;
মা যে, এমন ছেলে, করেন কোলে, ঘৃণা ক'রে না দেন ফেলে, মা
(মা যে কোলের ছেলে)
রোগেতে শয্যাগত, ওমা, অনিবার যাতনা কত,
রোগী যে অবিরত ডাকে মা, মা, বলে ;
ওমা, ডাক্‌লে তোমায়, ভয় থাকেনা, রণে বনে ভয় থাকে না,
মাগো, তোমায় মা ব'লে গো, মা। (বিপদ কালে ডাক্‌লে তোমায়)
কাঙ্গাল কয় ত্রিতাপ রোগে, ওমা, প'ড়েছি যে ঘোর নরকে,
মা আমার, রোগে শোক জীবন গেল জ্ব'লে ;
আমার আর সহেনা, এ যাতনা, তুমি একবার কর কোলে মা!
(সকল জ্বালা যাবে, স্থান দাও অভয় চরণ তলে।)

ওমা নই আমি সে ছেলে।
যার আছে সাধনের জোর, সে কি মা তোর ভয় করে, তুই ভয় দেখালে
ওমা, সত্যকালে সুরথ রাজা, রাজ্য হারিয়ে করে তোমার পূজা,
বৈরিকে বধে, প্রজা রাজ্যধন তাহায় দিলে ;

আবার বৈশ্যকে উদ্ধারের তরে, তুমি কল্লে কীর্ত্তি এ সংসারে,
ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে তারে (মাগো) ব্রহ্মজ্ঞান দিয়ে তারে মুক্তি দিলে।
যদিও অনেক দিন সেই গত ত্রেতা, তবু আছে মা পুরাণে গাঁথা,
রাবণ হরিল সীতা, যুদ্ধ হয় সাগর কূলে ;
সেই দেবদ্বেষী রাবণেরে, তুই কোলে নিলি রথোপরে,
কি গুণে কোলে নিলি (মাগো,) কি গুণে কোলে নিয়ে দিলি ফেলে
ওমা, কালকেতু এক ব্যাধের ছেলে,
তারে অভয় দিয়ে ক'রলি কোলে,
আমার দিক্ হীন ব'লে দোষ আছে কি চাহিলে ;
যদি চাইলে হয় দোষের কথা, তবে বল্ মা, আমি যাব কোথা,
কলঙ্ক হবে তোমার (মা গো) কলঙ্ক হবে আমায় ফেলে গেলে।
ওমা, যাঁর স্মৃতিতে বঙ্গ শাসন, সেই দ্বিজপুত্র রঘুনন্দন,
ক'রলি তাঁর দুঃখ মোচন কলঙ্কের আগুণ যোগালে ;
আবার সত্য মিথ্যা জান তুমি, ইহা লোকের মুখে শুনি আমি,
প্রসাদে বেড়ার বাঁধন (মাগো) রাম প্রসাদের বেড়ার বাঁধন ফিরিয়ে ছিলে।
আজ, ফিকিরচাঁদ বাজায় বগল, বলে যে ধরেছি চরণ যুগল,
ছাড়্ব না হোক্ গণ্ডগোল, তুই যদি না দিস্ ফেলে ;
যদি না রাখিস্ এই ছেলের কথা, তবে খাস্ মা, ও তোর ভক্তের মাথা,
দেখ্‌ব আজ কেমনে যাস্ (মাগো)
দেখ্‌ব আজ কেমনে যাস্ কথা ঠেলে।

ওগো মা, মাগো ব্রহ্মময়ী, কি করি দাও আমায় বলে।
আছে মোর সেই ভরসা, ফেলে না মায়,
দোষী হলেও ফেলে না মা, কোলের ছেলে। মা,
এই সংসার কয়েদখানায়, ওমা ছয় প্রহরী সদায় জ্বালায়,
একটা ফাকি দে ভুলায় কত কথা বলে ;
আমি দিন রজনী, ঘানি টানি, তবু একটার মন না মেলে। মা,
শুনে কাঁপিছে হিয়ে, এই কয়েদ হ'তে খালাস পেয়ে,
আবার দ্বীপান্তর গিয়ে যেতে হবে জেলে ;
সেথা বিষ্ঠা মেখে, ঝাঁটা মুখে, মারবে বলে বলে বলে। মা,

ফিকিরচাঁদ এই ভরসায়, ওমা যোড় করেতে ডাক্‌ছে তোমায়,
শুনি সেই শমন পালায় তোমার নাম শুনিলে ;
আমি ভয় করিনে, কাল শমনে, তুমি যদি কর কোলে। মা,

ওগো ওমা, গেলাম গেলাম, মলেম মলেম, তবু তোমার ডাক ছাড়ব না।
কি শরীর ছিল আমার, করিলি ছারখার, একেবারে চেনা যায় না ;
মনেতে সদায় ভাবি, মা আবাগী, থাক্‌লে এ দেখ্‌তে পাব্‌ত না ॥
জ্বরে জ্বরে জ্বরে গেলাম, প্রাণে মলেম, আর্ত্তনাদ একদিন শুন্‌লি না ;
সব জীবে সমান দয়া এ নাম দেওয়া, সাধক কবিদের কল্পনা ॥
তা নইলে দিন রাত ডাকি, তবু তোর কি, কাণে যায়না ছেলের কান্না,
যে মা আপনার ছেলে খায়, সেই মাকে কয়, ডাইন, তাকি তুমি জাননা ॥
যদি ফিকিরের জোরে, চেতন করে, করতে পারে দেখা শুনা ;
তবে মা খাবি খাবে, চৈরটা পাবে, কলির ছেলে মা মানেনা ॥

আছে, কাঙ্গালের আর কে এমন ধরায়।
তার, দর্শনে মিলনে, অমনি তাপিত প্রাণ জুড়ায় ॥
আছে যে জনার, অতুলিত ধন, তারে বন্ধু বান্ধব তোষে সর্ব্বক্ষণ ;
অর্থ না হলে, কোন্ কালে, আত্মীয়তা রয় কথায় ॥
যত আছে এই আত্মীয় বান্ধব, কেবল লাভের তরে ফেরে তারা সব ;
তারা লাভ বিনে, কি জন্যে, কাঙ্গালে তুষিবে হায় ॥
অর্থ না হলে আপন পরিবার, সদা কথায় কথায় করে তিরস্কার ;
কেবল আশা তার, অলঙ্কার, নৈলে তার মন পাওয়া দায় ॥
ফকির ফিকিরচাঁদে বলে মন তোমায়, কেবল একজন আছে কাঙ্গালের সহায়
সে জন চায় না ধন, কেবল মন, ভক্তিতে তাঁর পাওয়া যায় ॥

আমার প্রাণারাম আত্মারাম কোথায়।
যারে, সুধাই রে, কাতরে সেই ঘোরে প'ড়ে ঘোলায় ॥
বেদ পুরাণ আর বাইবেল কোরাণ, দল বাঁধিতে সকলেই সমান ;
আসল ঘরে তাই, মুরদ নাই, কেবল সদাই দল বাড়ায় ॥

কারে জিজ্ঞাসি, ব্যথিত কে এমন, কোথায় সে আছে যে করিল সৃজন,
উপদেশ দানে, প্রাণ ধনে, মিলায়ে দেবে আমায় ॥
কেহ বলিছে, হৃদয়ে আছে, বসে প্রাণধন তোর প্রাণের মাঝে,
যদি প্রাণময়, প্রাণে রয়, তবে সে কেন কাঁদায় ॥
কাঙ্গাল বলিছে আত্মার আত্মারাম, তাঁরে না সাধিলে হয় না প্রাণরাম ;
তাঁরে সাদরে সাধ রে, বিদায় দিয়ে বাসনায় ॥

এখন, আমার মনের মানুষ কোথা পাই।
যার তরে মনোখেদে প্রাণ কাঁদে সর্ব্বদাই ॥ রে
যার লাগি মন ভুলেছে কে আমায় বলিবে সে জন কোথায় বা আছে ;
তারে না দেখে রে, হিয়া ফাটে রে, সদা মনস্তাপে জ্বলে যাই ॥ রে,
তারে দেখা পাবার আশে রে, কত যত্ন করে খুজে বেড়াই দেশ বিদেশে রে ;
দেখি কত স্থানে, কত জনে রে, কিন্তু তারে নাহি দেখা পাই ॥ রে
যারে সুধাই তার কথা রে,
ঐ যে, ঘোলায় পড়ে সে জন ঘোরে, বলিতে নারে ;
তার কথা বলে, জুড়ায় প্রাণ আমার, এমন ব্যথার ব্যথিত কেহই নাই ॥ রে
ফিকিরচাঁদ কয় মন রে তোমারে,
ও তোর মনের মানুষ হৃদে আছে, খুজে নে তারে ;
কেন ঘুরে বেড়াস্ দেশ বিদেশে, এমন হাবা আর ত দেখি নাই ॥ রে,

আমার সে ধন কোথা গেল ?
একবার যে দেখা দিয়ে, ভুলাইয়ে, মন হরিয়ে পাগল কৈল ॥
কিবা রে তার রূপের কিরণ, ত্রিভুবনে নাই রে তেমন,
রূপেতে ভুবনমোহন করে আঁধার ভুবন আলো ;
যে, একবার সেরূপ দেখেছে, সে ত অমনি ভুলে গিয়েছে রে ;
ত্যজেছে তখনি সে রে হায় ! কুলশীল ॥
হারায়ে সে গুণনিধি, আমি খুজে বেড়াই নিরবধি,
কত দেশ নগরাদি হায়, নদনদী সকল,
এখন আমি কোথা যাই, কোথা গেলে তারে দেখা পাই রে,
দেখে তার করব তাপিত, রে হায়, প্রাণ শীতল ॥

খুঁজে কত দেশ বিদেশ, আমি না পেয়ে তার কোন উদ্দেশ,
বাড়িল জ্বালা অশেষ, কিছুই লাগেনা ভাল ;
অলি, যে জ্বালায় না পেয়ে তায়, আমি সে কথা আর কব কায় রে ;
মনের আবেগে হিয়া, রে হায়, ফেটে গেল ॥
অমূল্য ধন হাতে পেয়ে, হেলা করে সে ধন হারাইয়ে,
ফিকিরচাঁদ পাগল হয়ে ভাবছে বসে কেবল ;
এখন, যদি পাই আর সে ধন, রাথ্‌ব হৃদকমলে যযতনে রে ;
ছাড়ব না বাঁচি আর, রে হায, যত কাল ॥

আমারে পাগল ক'রে যে জন পালায়, কোথা গেলে পাব তায়।
তারে না হেরে প্রাণ কেমন করে, হিয়া আমার ফেটে যে যায় ॥
আমি যযতনে, যে রতনে রাখিলাম পূরে হিয়ায় ;
আমার ঘুমের ঘোরে, চুরী করে, সে রতন কে নিল রে হায়।
সে যে ছিল হৃদে, নয়ন মুদে, দেখিতে তাই আঁখি যে চায ;
সকল ঘর হাতড়ায়ে, নাহি পেয়ে, জলে যে অমনি ভেসে যায় ॥
আমার ব্যথার ব্যথিত, এমন সুহৃদ, বল কেবা আছে কোথায় ;
ও সেই হারাধনে, ধরে এনে, দেখাইয়ে হিয়া জুড়ায় ॥
সে ধন হয়ে হারা, পাগল পারা, প্রাণ পাখী মোর উড়ে বেড়ায় ;
ওরে, জলে স্থলে, আকাশ তলে, কোথাও দেখিতে না পায় ॥
আমি সব হারায়ে, যে ধন লয়ে, বাস করিতাম এ ঘর তলায় ;
যদি গেল সে ধন, তবে এখন, কবে কাঙ্গাল আর কি উপায় ॥

বলব কি স্বরূপ কিরূপ, হয় অপরূপ, সাধকের মনে।
যে রূপ অটল হ'য়ে, অটলেরে। (নিরজনে, দেখে সেই নিরঞ্জনে)
বিজলী মেঘের কোলে, যেরূপ ভাবেতে খেলে,
সেও কিছু স্থায়ী র'লে জ্ঞান হয় আমার মনে ;
আমি কি নাম ধ'রে, ডাকি তারে, ত্রিভুবনে। (পাইনে তার)
চক্ষু মুদিয়ে থাকি, তখন তার যে টুক দেখি,
যেমন মেলিনু আঁখি, আর তাও দেখতে পাইনে ;
পরে আসমান জমিন, খুজি যদি কোন খানে। (পাইনে তার)

আনিমনে আছি ব'সে, দেখা দেয় হৃদে এসে,
যেমন যাই দেখবার আশে, অমনি পালায় কোণে ;
যখন মনে করি, দেখব তারি, দেখা পাই নে। (পালায় সে)
ফিকিরচাঁদ কাঁদিয়ে কয়, হবে কেউ আপনার বোধ হয়,
নইলে দেখা দিয়ে কাঁদায় এমন কে ভুবনে ;
তুমি যে হও, আমায় দেখা দেও হে, এ অধীনে। (ওহে নাথ)

অরূপের রূপের ফাঁদে, পড়ে কাঁদে, প্রাণ আমার দিবানিশি।
কাঁদলে নির্জ্জনে ব'সে, আপনি এসে, দেখা দেয় সে রূপ রাশি ;
সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অনুরূপ, শত শত সূর্য্য শশী।
যদি রে চাই আকাশে, মেঘের পাশে, সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি ;
আবার রে তারায় তারায়, ঘুরে বেড়ায়, ঝলক্ লাগে হৃদে আসি।
হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি, বেঁধে রাখি, চিরদিন সেই রূপশশী ;
ওরে, তায় থেকে থেকে, ফেলে ঢেকে, কুবাসনা মেঘরাশি।
কাঙ্গাল কয় যে জন মোরে, দয়া করে দেখা দেয় রে ভালবাসি ;
আমি যে সংসার মায়ায়, ভুলিয়ে তাঁয়, প্রাণ ভরে কৈ ভালবাসি।

তুমি কি খেলা খেলিছ ব'সে আসির মাঝারে।
একি লুকোচুরি, খেলা মরি, ধরতে নারি তোমারে! (হায় রে আমি)
এই আমি ধর ব'লে হায়, তুমি কোথা লুকাও,
খুঁজে আমি নাহি পাই তোমায় ;
খুঁজে নিরাশ হ'লে, ক্ষান্ত দিলে, টুক্ দাও আমার অন্তরে। (মধুর স্বরে)
তুমি খেলা দিয়ে খেলা শিখাচ্ছ. কিন্তু স্পষ্ট ভাবে
ধরতে গেলে অমনি লুকাচ্ছ ;
তুমি আছ ধ'রে, চরাচরে,
তোমায় ধরতে না পারে। (হায় রে কেহ)
সাধন তত্ত্ব রাখিয়ে কাছে, তোমায় ধরবে ব'লে
যোগী ঋষি ধ্যান করে আছে ;
যারা সে পেয়েছে, হৃদয় মাঝে,
দয়া ক'রেছ যারে। (হায় রে তুমি)

সাধন ভজন শ্রীগুরু সহায়, কোনজ্ঞান নাই রে
কাঙ্গাল তবু ধর্‌তে চায় ;
তুমি নিজ গুণে, সাধন হীনে,
ধরা দাও দয়া ক'রে। (কাঙ্গালে রে)

আর কত দিন রবে, মা গো, আর্সির মাঝে ব'সে আর।
না দেখিয়ে, কেমন করে হিয়ে, ওমা, আমায় দেখা দাও একবার।
ও মা, না চাহিতে দিচ্ছ তুমি আপনা হ'তে,
আবার প্রয়োজন যাতে ; (মরি হায় রে)
লুকায়ে দাও, দেখিনে চক্ষেতে, ওমা এই বড় দুঃখ আমার।
যেমন অন্ধ বালক মায়ের কোলে স্তনের দুগ্ধ খায়,
মাকে দেখিতে না পায় ; (মরি হায় রে)
আমি সেইরূপ, দেখিনে তোমায়, সদাই দেখ্‌তে প্রাণ কাঁদে আমার।
ও মা, অবোধ বালক কভু যদি আর্সি হাতে পায়,
তাতে আপনার ধর্‌তে চায়, (মরি হায় রে)
ধর্‌তে আপনায়, না পায় কেঁদে গড়ায়, মা সেই দশা হ'য়েছে আমার।
কাঙ্গাল বলে ভেঙ্গে দে মা আর্সির আড়াল,
একবার কোলে নে ছাওয়াল ; (মরি হায় রে)
মায়ের স্বরূপ কেমন দেখুক কাঙ্গাল, ও সে জনমে দেখে নাই মার।

এত ভাল বাস থেকে আড়ালে।
আমি কেঁদে মরি, ধর্‌তে নারি, দুটী হাত বাড়া'লে ॥
ছিলাম যখন মার উদরে, ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে, হায় রে ;
তখন, আহার দিয়ে, বাতাস দিয়ে, তুমি আমারে বাঁচালে ॥
আবার, যখন ভূমিষ্ঠ হলেম,
মায়ের কোমল কোলে আশ্রয় পেলেম হায় রে ;
মায়ের স্তনের রক্ত, হে দয়াময়! তুমি ক্ষীর ক'রে যে দিলে ॥
দিলে বন্ধু বান্ধব দারা সুত,
ও নাথ! সে সব কৌশল তোমারি ত, হায় রে ;
ও নাথ! ধন ধান্য সহায় সম্পদ, পেলাম তোমার দয়া বলে ॥

ও নাথ! তোমার দয়ায় সকল পেলাম,
কিন্তু, তোমায় এক দিন না দেখিলাম, হায় রে;
তুমি কোথায় থাক, কেন এসে, আমি কাঁদলে কর কোলে॥
আমি কাঁদলে বসে হতাশ হয়ে,
তুমি চোখের জল দাও মুছাইয়ে, হায় রে;
আবার কথা ক'য়ে প্রাণের মাঝে, কত উপদেশ দাও ব'লে॥
ও নাথ! দেখা নাহি দেবে আমায়,
এই ইচ্ছা যদি আছে তোমার, হায় রে;
ও নাথ! তবে কেন, শাকের ক্ষেত, তুমি দেখালে কাঙ্গালে॥

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাক্‌তে।
তবে কি মা, এমন করে, তুমি লুকায়ে থাক্‌তে পার্‌তে।
আমি, নাম জানিনে, ডাক জানিনে,
আবার পারি না মা, কোন কথা বল্‌তে;
তোমায়, ডেকে দেখা পাইনে তাই তে, আমার জনম গেল কান্‌তে॥
দুঃখ পেলে মা, তোমায় ডাকি,
আবার, সুখ পেলে চুপ্‌ ক'রে থাকি ডাক্‌তে;
তুমি মনে বসে, মন দেখ মা, আমায় দেখা দাও না তাইতে॥
ডাকার মত ডাকা শিখাও,
না হয়, দয়া করে দেখা দাও আমাকে;
আমি, তোমার খাই মা, তোমার পরি, কেবল ভুলে যাই নাম কর্‌তে॥
কাঙ্গাল যদি ছেলের মত,
মা তোর, ছেলে হ'ত তবে পার্‌তে জান্‌তে;
কাঙ্গাল, জোর ক'রে কোল কেড়ে নিত, নাহি সর্‌ত বল্লে সর্‌তে॥

তা এখন বুঝ্‌লাম আমি, ও মা তুমি, ভব সাগর পারের নৌকা।
তুমি না করিলে পার, এবার আমার, সাধ্য নাই আর জীবন রাখা;
সুখের ঢেউ সিন্ধু জলে, উচ্চে তোলে, দুঃখের পাতাল যায় যে দেখা॥
ইচ্ছা না থাক্‌লে মনে, ধ'রে টানে, স্থানে স্থানে পাক কুণ্ডিকা;
আবার যে স্রোতে ভাসায়, তোলে ডুবায়, সোজা নয়, এ সাগর বাঁকা॥

ক্রোধ হিংসা জলজন্তু, অধিকন্তু, লোভের কুমীর জলের পোকা;
ইহাদের হাতে প'লে, ভূমণ্ডলে, আচ্ছা জ্ঞানীও হন্ রে বোকা॥
মাগো, তা জান তুমি, কাঙ্গাল আমি, পারের কড়ি নাই কণিকা;
কর পাব কোন ক্রমে, এ অধমে, কেউ নাই, আমি আছি একা॥

দীন দয়াময়ি মা, বল সে দিন কবে হবে গো?
যে দিন সংসার-বাসনা, বিলাস-কামনা, পুড়িয়ে ছাই হবে গো। (সকল)
নামসুধা পানে হৃদয়, মাতিয়ে উঠিবে গো;
সকল বাসনা পোড়ায়ে, ভস্ম মাখিয়ে, সন্ন্যাসী সাজিবে গো। (কাঙ্গাল)
নীচানীচ শৌচাশৌচ জ্ঞান না রহিবে গো;
তব দয়া সুধা, পানে যাবে ক্ষুধা, সকল দ্বিধা ঘুচিবে গো। (কাঙ্গালের)
নির্ব্বিকার হ য়ে মন, মা ব'লে ডাকিবে গো;
.ব, দিবস রজনী, ভাই আর ভগিনী, এক রূপ দেখিবে গো। (কাঙ্গাল)
সীসা সোণা হীরা কয়লা, এক হ'য়ে যাবে গো;
,থা মান অপমান, জ্ঞান আর অজ্ঞান, সকল সমান ভাবিবে গো। (কাঙ্গাল)

ধরে তোল আমায়, ও দরদি, দরদি! ভবে ডুবেছি আমি।
গড়ন ভাল পাঁচটী তক্তায় এ যে চৌদ্দ পোয়া নৌকা আমার;
এক মাঝি, তার দশ বাহনদার, চড়নদার ছিলাম আমি।
সংসারের মোহপাকে, মাঝি ঘুরাইছে পাকে পাকে,
আমি না পারি তাকে ডুবলাম আমি ধর তুমি।
যদি বল তুমি ম'লে, আমি ধরবো কি তোর পুণ্য বলে?
তাই ডাকি হে দয়াল বলে, নামের গুণে ধর তুমি।
ওহে, এমন ডোবা কত জনে, তুমি, ধরিয়াছ নিজ গুণে,
প্রমাণ তার বেদ পুরাণে, পাপহারি হরি তুমি। (নাম ধরেছ)
কাঙ্গাল বলে, ডুবুক ব্যাসাৎ, তাতে দুঃখ নাই হে জগতের নাথ,
ঘুচাও এ ব্যবসার উৎপাত, এক হ'য়ে যাই তুমি আমি।
(নিত্যলীলায়, নিত্যরসে)

—————

আমায় তুমি ভুল না হে, ও নাথ, আমার এখন এই কথা।
ও নাথ! তোমার অনেক, তুমি হও অনেকের পিতা মাতা;
কিন্তু, তুমি কেবল আমার একা, আমায়, বোঝ প্রাণের ব্যথা।
ও নাথ! আমি তোমায় ভুল্লে তোমার যায় না হে, মমতা;
কিন্তু, তুমি আমায় ভুল্লে, আমার সকল হয় যে বৃথা।
আমি, সুখে দুখে যে ভাবে রৈ, থাকি যেথা সেথা;
যেন, তোমার নামের মালা আমার প্রাণে থাকে গাঁথা।
আমি বুঝি না হে তন্ত্র মন্ত্র, শাস্ত্র তর্ক বৃথা;
কেবল, তুমি আমার, আমি তোমার, কাঙ্গালের বেদ গাথা।

তাই, থাক্‌তে সময়, দীন দয়াময়, আর্জি করে রাখি,
তখন হয় কি না হয়, মনে উদয়, পাছে পড়ি ফাকি।
হবে শীতল অঙ্গ, ভবের খেলা সাঙ্গ (আমার এই ধূলা খেলা সাঙ্গ হবে হে)
যে দিন পিঞ্জর ফেলে যাবে চলে, আমার পরাণ পাখী।
যে দিন, এই রসনা আমার বশ রবেনা; (তোমার মধুর নাম বলা ফুরাইবে)
সেই শেষের দিনে, মনে প্রাণে, যেন একবার ডাকি।
যে দিন শমন এসে, আমায় ধরবে কেশে;
(যে দিন দশেন্দ্রিয় অবশ হবে হে)
সেদিন তোমার চরণ, পায় দরশন, যেন অন্তর আঁখি।
ফকির কেঁদে ভেবে, সেদিন দিন ফুরাবে,
(বলি দীননাথ দীনের দিন মনে রেখ হে)
দিও চরণে স্থান, সজ্ঞান অজ্ঞান, যে ভাবেতে থাকি।

ওহে, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি, পারের কর্ত্তা, শুনে বার্ত্তা, ডাকছি হে, তোমারে॥
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে
ওহে, আমায় কি পার করবে নাহে, আমায় অধম বলে)
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে॥

যাদের পথ সম্বল, আছে সাধনার বল,
(তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে)
(আমি সাধনহীন তাই রইলেম পড়ে হে)
তারা নিজ বলে গেল চ'লে, অকুল পারাবারে॥
শুনি, কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার;
(আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে)
(দয়াময়! নামে ভরসা বেঁধে হে)
আমি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে॥
আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল;
(তাই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে)
(তাই অধমতারণ বলে ডাকি হে)
ফিকির কেঁদে আকুল, পড়ে অকুল সাঁতারে পাথারে॥

এ দীনের দীন ফুরাল, সে দিন এল, দীনবন্ধু, হের একবার।
সংসারের পরিজন, ধন জন, যা বলিলাম আমার আমার;
তাদের যে একে একে, সুধাই ডেকে, সাথের সাথী কেহ নহে তার।
(ধন জন পরিজন)
যারা বড় সুহৃদ ছিল, বন্ধু হোলো, পদ পদার্থ থাক্‌তে আমার;
তাদের সে সকল দেখি, কেবল ফাকি,
শেষের বেলা কেউ নহে কার।
হোলো রে যৌবন গর্ব্ব, ক্রমে খর্ব্ব, জরা দেহ ব্যাধির আগার;
ফুরাল রঙ্গ তামাসা, দেখার আশা,
দিন্ দুপুরে দেখি আঁধার। নয়ন থাক্‌তে
শেষে নাথ, দিল বিদায়, সবাই আমায়,
ফিকির যায় নাথ, কোথায় হে আর;
নিলাম নাথ, আজ হে শরণ, অনাথশরণ, রাখ পদে, বাঁধ এবার।
(সকলের মুখ বুঝে এলাম, চরণ ছাড়া করো না হে)
কাঙ্গাল কয়, ওরে ফিকির, দীন ফকির, ছিল প্রাণের সখা আমার;
যে পথে সে গেল, চল চল, সেই এক পথ হয় সবাকার। (ভবে আসা যাওয়ার)

এ ঘোর, আঁধার পথে, হায় কি মতে, পাইব নিস্তার।
আমি চল্‌তে নারি, কিবা করি, এখন লব শরণ কার। কেউ নাই আমার,
বাঁকা পথ উচু নীচু তায়, আগে না দেখিয়ে, খাদে পড়ে, উঠা হল দায়;
আবার অজগরে, গ্রাসে মোরে, কোন উপায় নাইরে আর॥ পরিত্রাণের
একে পথ নাহি যায় চেনা, তাতে চোর ডাকাতে, মাঝ পথেতে দিয়েছে থানা;
মাথায় বাড়ি দিয়ে, লয় লুটিয়ে, মণি মুক্তার অলঙ্কার। (ছিল যে হায়)
ফিকিরচাঁদ পড়ে ফাঁকরে, অতি কাতর হ'য়ে দীনদয়াল, ডাকে তোমারে;
আমার জুড়াক জীবন, জগজীবন, আবাসে স্থান দাও আমায়। (তোমার চরণ)

আমার আজ এই নিবেদন, লজ্জা বারণ, কর মা লজ্জারূপিণী।
মা, তোমার, যে নাম জপে, হৃদয় কূপে, নিরজনে যোগী মুনি;
সেই নাম আজ, জনসমাজে, ফকীর সাজে,
গাইতে এলাম ও জননি। এ পাপ মুখে,
মা, আমার হতেছে ভয়, কাঁপে হৃদয়, একবার, হৃদে এস বীণাপানি;
মা, তুমি বীণা বাজাও, আপনি গাও, আপনার নাম আমি শুনি।
মা, তুমি মা নাম দিয়ে, জাগাইয়ে, জাগালে কুলকুণ্ডলিনী,
এ হৃদয় বাঁধ ছুটিয়ে, ঢেউ উঠিয়ে, ভাবে নাচায় ভাবরূপিনী।
কাঙ্গালের গেছে সজ্জা, লোক-লজ্জা, তোমার নামে পাগল দিনরজনী;
নামে না হয় কলঙ্ক, সেই আতঙ্ক, দেখিস্ অনন্তরূপিনী। ওমা দেখিস্ দেখিস্,

বিবিধ।

এই কি সেই আর্য্য-স্থান, আর্য্য সন্তান;
ও যার, তপোবলে, যোগবলে, কাঁপিত দেবতার প্রাণ॥ সদা
ও যার হেরে বীর্য্যবল, স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল, সভয়ে কাঁপিত গিরি সাগরের জল;
দিক্‌দিগন্তরে শূন্য ভরে, উড়িত বিজয় নিশান॥ ও যার
যার, শিল্প আর বিজ্ঞান, যোগতত্ত্ব আত্মজ্ঞান, করেছিল পৃথিবীর একদিন চক্ষুদান;
ও যার, বিদ্যাবলে, আকাশতলে, চলে যেত পুষ্পযান॥
ও যার, যুদ্ধে যুদ্ধস্থল, রক্তস্রোতে টল মল, রক্তময় হ'ত যত নদ নদীর জল;
বসে বৃক্ষ পরে শূন্য ভরে, পাখী করত রক্ত পান॥

বিধির বিধান চমৎকার, এখন, সেই আর্য্যকুমার,
শৃগালের রব শুন্‌লে বাঁধে ঘরের দুয়ার;
দেখলে রক্ত জবা, শুকায় জিহ্বা, চমকে উঠে সবার প্রাণ ৷৷
কাঙ্গাল বলে বিদ্যাবল, দেহবল কল কৌশল,
ধর্ম্ম বল বিনে রে ভাই সকলি বিফল;
সেই ধর্ম্ম বিনে, দিনে দিনে, সকল হারায়ে শ্মশান ৷৷ ভারত

হায় রে, তোদের হাতে ধরি কাতরে করি রে মানা।
তোমরা কেউ সুধা বলে, হাতে তুলে, সুরাগরল (হাতে তুলে) পান কর না রে।
মদ্য হয় কাল ভুজঙ্গ, ওরে যে করে তাহার সঙ্গ,
হয় রে তার ধন সাঙ্গ, জীবন রহে না;
ঐ যে গরল পানে, মলো প্রাণে, আর ত উঠে বসিল না রে। সোণার হরিশ
ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্গ শশী, তারে খেলে ঐ রাক্ষসী,
এর মত সর্ব্বনাশি কোথায় আর দেখি না;
খেলে কত রতন, যতনের ধন, তবু উদর ভরিল না রে। এ রাক্ষসীর
কবিবর মধুসূদন, ছিল বঙ্গের অমূল্য ধন,
করিলে সাধন এখন সে ধন আর মেলে না;
সে যে গরল খেলো, চলে প'ল, মা বলে আর ডাকিল না রে। সাধের মধুসূদন।
আমার যে কপাল পোড়া, বেচে কাটনার সুতা কলার ছড়া,
শিখালাম লেখাপড়া, পেযে রে যাতনা;
এখন মত্ত মদে, রও আমাদে, মায়ের কথা কেউ শোন না রে। মদে মত্ত সদা।
কাঙ্গাল কয় মনের ব্যথা, কাঁদে বঙ্গ মাতা রাখ তার কথা,
ও রে ভাই আপন মাথা আপনি খেয়ো না;
ওরে কাঁদিতে তাঁর, জনম গেল,
মাকে আর ভাই কাঁদাও না। তোদের পায়ে ধরি,

দেশে চলিলে মহামতি রিপন, রামরাজ্য সম প্রজা করিয়ে পালন।
সুশাসনে এ ভারতে, ছিল প্রজা নিরাপদে,
(তব ন্যায়পরতায়, সাম্যনীতি) তোমার বিরহে কাঁদে নরনারীগণ।

আমরা কাঙ্গাল, কাঙ্গাল বেশে, এসেছি তব উদ্দেশে,
(হের কৃপা নয়নে, সাধারণ দেশের দশা)
দেশের দশা প্রকাশ বেশে, কর নিরীক্ষণ।
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, জানাতে নাহি ক্ষমতা,
(জ্ঞান অর্থহীন হে, আমরা পল্লীবাসী, ধরুচক্ষের জল হে, অন্য সম্বল নাই)
রাজভক্তি সরলতা, ভারতবাসীর ধন।
ভিক্টোরিয়া মাতা যখন, জিজ্ঞাসিবে বলো তখন ;
(কেবল নাম রয়েছে, সোণার ভারত, ভারত সকল হারায়েছে)
সোণার খণি নাই আর এখন, ভারত ভবন।
দুর্ভিক্ষ প্রতি বছরে, অন্নাবনে প্রাণে মরে,
(মায়ের কাছে ব'ল এই, ভিক্টোরিয়া)
ম্যালেরিয়া মহাজ্বরে নাশে প্রজাগণ।
সহায়হীনা গুকরমণি, পরম সতী রমণী,
(তার কি দশা হ'ল হায়, বল্‌তে হৃদয় ফাটে) হরিয়ে সতীত্ব মণি বধিল জীবন।
আর যত অত্যাচার, সকলি তব গোচর,
(কিবা নিবেদিব হে, তুমি সকল জান)
দেশে গিয়ে গুণাকর, করিও স্মরণ।
ভারতের কপাল মন্দ, অস্ত্রহীনে হস্ত বদ্ধ ;
(তাদের একি দশা হায়, মহারাণীর প্রজা হ'য়ে)
পশু হস্তে প্রজাবৃন্দ হারায় জীবন।
রাজরাজেশ্বরী হ'য়ে, থাকুন মাতা ভিক্টোরিয়ে,
(প্রার্থনা করি এই, বিভুপদে) এ অত্যাচার দয়া করে, করুন নিবারণ।
তিনি তোমায় করুন রক্ষে, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ;
(যিনি আত্মার আত্মাতে, এই চরাচরে)
কাঙ্গাল-ফিকিরের এই ভিক্ষে, কাতর নিবেদন।

হায় রে, আজ একি শুনি শ্রবণে ;
সেই যে দয়ার সিন্ধু, ভারতবন্ধু, ফসেট নাই আর ভুবনে।
আঠারশ চোরাশি, কি কুক্ষণেতে পশি, সাতই নবেম্বর শুক্রবার দহে ফুসফুসি ;
সেই নিমোনিয়া, এমনই আঃ ! বধিল তাঁর পরাণে। হায় রে,

কে আর ভারতের হিতে, পার্লিয়ামেণ্ট সভাতে,
কাঁপাইবে কাঁদাইবে বাক্য অশ্রুতে ;
থেকে সিন্ধু পারে, ভারতে রে, দেখবে স্নেহ নয়নে। কে আর,
হয়ে কৃষকের তনয়, র‍্যাঙ্গলার ফেলো পরীক্ষায়,
পার্লিয়ামেণ্টের হেক্‌নরী মেম্বর পদটী শেষে পায়,
একান্ন বৎসরে, শমন তাঁরে, শমন দিন স্বমনে। হায় রে,
কোন হৃদয় সহচর, চক্ষু হানিল রে তার,
তবু একটী দিনে অন্য কাণে, না দেন সে খবর ;
যদি চাও কোন জন, আদর্শ জীবন, এই ফসেটের জীবনে। আছে,
ফিকির কয় চক্ষের জলে, আয় আজ ডাকি সকলে,
সেই পতিতপাবন অনাথশরণ দয়াময় বলে ;
প্রভু দয়া করে, ফসেটেরে স্থান দিও চরণে। প্রভু,

ধন্য হে ফসেট, তুমি মহাত্মন।*
ওহে, তোমার জনমে ধন্য ইংলণ্ড ভুবন।
কোথায় ইংলণ্ড ভূমি, কোথায় ভারত কোথায় তুমি*;
(সুহৃদ হ'য়ে কাঁদিলে, ভারতের দুঃখে) স্মরিয়ে ভারত ভূমি করিলে ক্রন্দন।
প্রার্থনা করিলে যে জন, করে শুভ, বন্ধু সে জন,
(বিনা প্রার্থনায় হে, ভারতের ব্যথায় ব্যথিত)
তুমি হে সুহৃদ অকারণ, বন্ধু সুজন।
অনাথ ভারতের প্রতি, করি ভ্রাতৃ-স্নেহ, প্রীতি,
(ক'র্‌লে প্রিয়কার্য্য হে, সেই জগৎপিতার)
জগৎকে শিখালে নীতি, ভ্রাতৃভাবসাধন।
ক'রে পিতার প্রিয়কার্য্য, লভিবে হে স্বর্গ রাজ্য,
(ব'সগে পিতার কোলে, প্রিয় পুত্র হয়ে) তব কার্য্য অনিবার্য্য গাবে সর্ব্বজন।

* উপরোক্ত তিনটীগানের প্রথমটী ভারতহিতৈষী বড়লাট লর্ড রিপণের দেশে যাইবার সময় পোড়াদহ ষ্টেষনে তাঁহার সম্মুখে দল কর্তৃক গীত হন। শেষোক্ত দুইটী ভারতবন্ধু মহাত্মা ফসেটের মৃত্যুজনিত শোক-সভায় কুমারখালিতে গীত হয় এবং মিসেস্ ফসেটের নিকট প্রেরিত হয়।

কাঙ্গাল ফিকির সকাতরে, তব স্থানে ভিক্ষা করে,
(থেকে অন্তরীক্ষে হে, ভ্রাতৃভাব শিক্ষা দাও, সাম্যনীতি)
পুরাও আশা দয়া ক'রে, আমরা অভাজন।

দেশের দশা হায় রে কি হ'ল! মরি! জ্বরে জ্বরে প্রাণ গেল॥
একে অন্নচিন্তা পুরাতন জ্বরে, দেখ ঘরে ঘরে পড়ে আছে বিছানা ধরে, (লোকে)
আবার নব জ্বরে, লোকের ঘাড়ে ধরে, ট্যাক্স ক'রে সব নিল॥ (লোকের)
ওরে, বুড় বুড়ী জোয়ান কি ছেলে,
সকলেরই পেটটী জোড়া যকৃৎ আর পীলে; (রিপু)
তারা ঘরে বসে রক্ত চোসে সকলেই তায় দুর্ব্বল॥
কুইনাইন জ্বর ভাল করে, মরি তা বলে তা খাচ্ছে লোকে আদর করে। (কত)
দেশের কপাল গুণে কুইনাইনে, আট্‌কায়ে জ্বর রাখিল॥
কাঙ্গাল বলে, আর ত উপায় নাই,
ওরে চিন্তামণি মৃত্যুঞ্জয় জ্বরের ঔষধ ভাই (এ সব)
সবে এক হৃদয়ে, তাঁয় ডাকিয়ে, জ্বরের ঔষধ খাই চল॥ ভাই রে এখন,

আর ও এবার চ'ল্ল ফিকির বাজিয়ে শিঙ্গে আস্তানায়।
তার সাধন ভজন হ'ল না ভাই, আমার আমার এই মায়ায়।
মনে যে আশা ছিল, সব মনেতেই রহিল;
"নগেন" তুমি রহিলে বড় সব, চালিয়ে চ'ল,
[illegible]ড় ঘরে বড় বাতাস, লোকেতে বলে কথায়।
[illegible]ছি দিন রাতি, জগৎ দেখুক শিখুক মদে করে কি গতি;
[illegible]ফল, জেন সকল, নাম করতে কাঁপে হৃদয়।
[illegible]ফলাফল, আমি জানি তা সকল,
[illegible]ল, ছেলে গেল অমনি রসাতল;
[illegible]য়ে, অমনি সার করলেন অবিদ্যালয়।

[illegible]রচাঁদ ভনিতার অনেকগুলি গান রচনা করিয়াছিলেন, এই [illegible]ত। নগেন—কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

শেষ।

ও ভাই, বল রে বল, সবাই বল রে।
দলাদলি, গালাগালি, ধর্ম্মের কি ফল রে॥
স্ত্রী পুরুষে যার ঐক্য নাই, সহোদর যত ভাই ভাই,
সকল কাজেতে ঠাঁই ঠাঁই, সমাজ টলমল রে;
এখন সাকার আর নিরাকার তুলে, দিচ্ছ খ'ড়ো ঘরে আগুন জ্বেলে,
বাতাস দিয়ে অনলে, হাসে শক্রদল রে।
অসীম আকাশ মাথার প'রে, দেখ একবার বিচার ক'রে,
সূর্য্য তারা ঘোরে ফেরে, উদয় অস্তাচল রে;
ওরে তারার মাঝে, যারা আছে দেখ তিনিও আছেন তাদের কাছে,
কেউ নাই তাঁর আগে পিছে, সমান তাঁর সকল রে।
কি ভাবে কে ভাবে কোথায়, ঠিক নাহি হয় রে কথায়,
ভাবের ঠাকুর ভাবেতে পায় প্রকাশ যে কেবল রে;
ওরে, যে ভাবে যে হৃদয় গড়ে, তিনি সেই ভাবে তাঁর হৃদ্-মন্দিরে;
নিজ স্বরূপ প্রকাশ ক'রে, করেন যে শীতল রে।
শুন ভাই সাধুর বচন, তিনি যে সাধনের ধন,
সাধন বিনে ধর্ম্ম কথন, সকলই বিফল রে;
ওরে, যে ভাবে যে হৃদয় গড়, কিন্তু মনে প্রাণে সাধন কর,
বৃথা তর্ক বিচার ছাড়, বুদ্ধির কৌশল রে।
যে রূপ সে রূপ স্বরূপ ধ'রে, যদি সিদ্ধ হও ভাই সাধন
তখন বক্তৃতা ক'রে, খাবে না আর জল রে,
তখন, একটী কথার তেজোবলে, কত, পাষাণ
হবে এক সত্যবলে, পূর্ণ ধরাতল
কাঙ্গাল কয় সকাতরে, ভারতের পা রাজ্য,
সাধনহীন এ বিচারে, হবে গণ্ডগোল
ওরে সাধন ক'রে সযতনে, যিনি পেয়েছেন নিবার্য্য গাবে সর্ব্বজন।
তাঁর উপদেশ বিনে, সকলি গরল রে

প্রথমভাগ সম্পূর্ণ।

রিপণের দেশে যাইবার সময়
ী ভারতবন্ধু মহাত্মা ফসেটের
নিকট প্রেরিত হয়।